ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মোহাম্মদ কুতুব (মিশর)

ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মুহাম্মদ কুতুব (মিশর)

অনুবাদঃ
মওলানা সোলায়মান ফারুকী
মওলানা আবদুস ছাত্তার

সম্পাদনায়ঃ
মুহাম্মদ আব্দুস সালাম

সিন্দাবাদ প্রকাশনী

ভূমিকা

অবস্থা হল এই যে, আমি অনেকদিন পর্যন্ত কোরআন করীম চর্চায় লিপ্ত কিন্তু, প্রথম দিকে এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ জ্ঞান ছিল না যে, কোরআন করীমে "ইসলামের শিষ্টাচার নীতি" পূর্ণভাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য প্রথম থেকেই আমার এ প্রকার অনুভূতি অবশ্য ছিল যে, কোরআন শরীফে শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন হেদায়েতের বাণী আছে যা মানুষের মনে খুবই প্রভাব বিস্তার করে এবং যদি কোন মানুষ চিন্তা ভাবনা করে তাহলে তার সম্মুখে আমলের এক প্রাকশ্য নমুনা, চিন্তার উজ্জ্বল রাস্তা এবং অনুভূতির এক এমন সুনির্দিষ্ট রাস্তা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয় যা নেকী এবং সদাচরণের নিকটবর্তী হয় অতঃপর তার উপর আমল করতঃ পবিত্রতা এবং মানবতার দ্বারা পরিপূর্ণতা অর্জন করে থাকে।

কিন্তু একথা প্রকাশ্য যে, পরোক্ষ অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

আর এই সময় পর্যন্ত আমার সেই অনুভূতি লাভ হয় যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে মানুষের তারবিয়াত সম্পর্কিত আয়াত মোটেই নেই বরং পবিত্র কুরআন এমনি এক পরিপূর্ণ ও সম্পুরক জীবনব্যবস্থা দিয়ে থাকে যাহার মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় এবং বর্জনীয় কাজের ব্যাপারে ব্যাখা সহকারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটা অত্যাবশ্যক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি লাভ হবে যে, পবিত্র কুরআন এক পরিপূর্ণ শিষ্টাচার শিক্ষার বাহক।

কেননা, পবিত্র কুরআন তার পাঠকারীর মস্তিষ্কের মাঝে এমন এক অপ্রকাশ্য অনুভূতি উদ্ভাসিত করে দেয় যার মাধ্যমে তার আত্মা কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে, আর একথা প্রকাশ্য যে, পবিত্র কুরআনের অবতরণকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। আর সদা সর্বদা পবিত্র কুরআন মুমিনদের আত্মার গভীরে প্রবেশ করতঃ চির সৌভাগ্যের কেন্দ্রস্থলের দিকে পথ প্রদর্শন করছে।

কিন্তু পবিত্র কুরআনের সুশৃংখল শিষ্টাচার শিক্ষা-দীক্ষার অনুধাবনকৃত জ্ঞানের গুরত্বও রয়েছে। কেননা, অনুরূপ হেদায়েত মানব আত্মার হৃদয়ে দৃঢ়তা আনয়ন করে। এবং বিশেষণ কারী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আলোচনা ও বিশ্লেষণের সুবিন্যস্ত পন্থা সহজে অর্জন হয়ে থাকে, বিশেষ করে এ অবস্থায় যখন বর্তমানে পাশ্চাত্য থেকে আগত সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান সুবিন্যস্ত ও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত যার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত পরিবর্তনসমূহ দৃষ্টির মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, কেননা, তার গোপনীয় ত্রুটিসমূহ সাধারণ দৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় না।

অতএব যদি ইসলামে সুবিন্যস্ত শিক্ষা-দীক্ষা নতুন নিয়মে রূপায়ন করে দেয়া হয় তাহলে তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বক্রতা সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

আমি ইতিপূর্বে এর মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যে, মানবত্মার হেদায়েতের ব্যাপারে ইসলামের এক বিশেষ পন্থা কার্যকরী, যে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা পরস্পর বিরোধী। এ পুস্তক রচনা করা পর্যন্ত ইসলামী শিষ্টাচার নীতির কোন পুস্তক আমার হস্তগত হয়নি। সেহেতু আমি এই পুস্তকের মধ্যে ইসলামী শিষ্টাচার নীতির বহু আবশ্যকীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছিলাম ওর মধ্যেও ইসলামী শিষ্টাচারের একটি অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত ছিল কিন্তু এটা প্রকাশিত হয়নি।

কয়েক বছর পূর্বে আমার উপর এমন এক রাত অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারিনি। ঐ রাতে আমি আত্মার অস্থিরতায় বিচলিত ছিলাম। কোন দিন থেকে আলোর ঝলক আসছিল না। ঐ সময় আমি তিন অথবা চার বার কুরআনা অধ্যায়ন করে ফেলেছি। দিন রাত কুরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছি। সুতরাং প্রত্যেক চিন্তা ও গবষণার স্থলে ঘবীরভাবে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ স্বাভাবিকভাবে অন্তর ও মস্তিষ্ক আলোকিত হয়ে গেল, আমি অনুভব করলাম যে, আমার চিন্তা ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে এবং ইসলামী শিষ্টাচারের ব্যাপারে সুবিন্যস্ত ও বিস্তারিত নিয়ম আমার মস্তিষ্কে চিন্থুরিত হচ্ছে। আমি পেরেশান হয়ে পড়লাম যে, এত প্রকাশ্য ও সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমার মস্তিষ্কে আবরণকৃত ছিল।

মোট কথা, ঐ রাত থেকে আমার হৃদয়ে ইসলামী শিষ্টাচারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়ে গেল আমার দুনিয়াবী চিন্তাধারার মধ্যে উদাসীনতা দেখা দিল। আর আমি এমনি হয়ে গেলাম যে, ঐ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের আয়াত ও সুন্নতের মাধ্যমে ফযীলত প্রমাণ দিতে সক্ষম।

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে সুন্নতের মাধ্যমে–করা এজন্যই সহজবোধ্য হল, কেননা, নবী (সঃ) সুন্নত পবিত্র কুরআনেরই ব্যবহারিক ব্যাখ্যা মাত্র। একদা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিকট নবী (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তদুত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর চরিত্র পবিত্র কুরআন। অর্থাৎ নবী (সঃ) এর জীবন ইসলামী শিষ্টাচারের এক উত্তম পথ ও পরিপূর্ণ নমুনা। আর তার আমলী জীবন, চরিত্র, কর্ম, কথাবার্তা ও নিরবতা শিষ্টাচার শিক্ষার প্রকাশিত জীবন বিধান।

আমি ঐ রাতে এই প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম যে, ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা বিষয়ের উপর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করব। আর ওর মধ্যে আমি একথাই প্রমাণ করে দেখাব যে, ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দুনিয়ার অন্যান্য সকল নিয়ম-নীতি শিক্ষা হতে অনন্য ও পৃথক। এ শিষ্টাচার নীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটা এমন এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যার মধ্যে মানবাত্মার সকল চিন্তা-ভাবনা বেষ্টিত। আর এ নিয়ম-নীতি এমন গভীর প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের অধিকারী যে, বাস্তবজীবনে মানবাত্মার গভীরে সুদৃঢ়তার সাথে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ কারণেই এই শিষ্টাচার নীতির বদৌলতে আরব ভূমিতে এমন এক সম্প্রদায় জেগে উঠেছিল যাদের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল

এবং পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সর্বব্যাপী আলোড়ন ও ঐ জাতির ঐতিহাসিক সম্মান অর্জনের মূলে একটি মাত্র কারণ নিহিত ছিল, আর তা হলো তারা ইসলামের নীতির উপর আমল করতঃ দীনকে দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধরে ছিল। তাদের চিন্তাধারা কাজ কর্ম সব কিছু ইসলামী জীবন বিধানের ও শিষ্টাচার নীতির উপর প্রবাহমান ছিল।

যেহেতু যুগের বির্বতনে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনে এসেছে দীর্ঘ ১৪ শ' বছর আলো আস্তে আস্তে কালিমাযুক্ত হয়েছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশিত শিষ্টাচার নীতি হতে অপসারিত হয়ে তার কয়েকটি মাত্র নিয়মনীতি আকড়িয়ে ধরেছে। এজন্যই আমি এ পুস্তক প্রণণয়ন করছি যাতে করে আমার এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে জীবন চলার পদ্ধতি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হবে। ঈমান ও ইসলামের হাকীকতের উপর পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতঃ নতুন সংকল্প ও আত্মীক প্রচেষ্টার দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করবে।

পুস্তকের এ অংশ ইসলামী শিষ্টাচার নীতির রূপ ব্যাখার উপর অন্তর্ভূক্ত। যার মধ্যে আমি ঐ বিষয়বস্তুর উপর আত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অংশে শিষ্টাচার নীতির বাস্তব দিক তুলে ধরব। বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল সম্পর্কে মানব শিষ্টাচারের ব্যাপারে প্রাচীন চিন্তাবিদগণ যা কিছু লিখেছেন তাও তুলে ধরব।

হে আল্লাহ। তুমি আমাকে সেই কল্যাণ দ্বারা ভূষিত কর যা তার মধ্যে রয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী ও দোষ কবুলকারী।

মুহাম্মদ কুতুব
মিশর।

প্রকাশকের কথা

অবশেষে নানান চড়াই-উৎরাই পার হয়ে "ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি", বইটি প্রকাশিত হল। আমার প্রকাশনা জীবনে বহুদিন পূর্ব থেকেই শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও মুহাম্মদ কুতুবের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখকদের বই প্রকাশ করার একটা উদগ্র বাসনা জাগরুক ছিল। অত্র বইটি আমার পুরাতন বন্ধু ঈসা ভাই পাকিস্তান থেকে হুবহু অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য পাঠান। আমি আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বইটি অনুবাদ করতে দিই। কিন্তু দীর্ঘদিন পর তিনি মাত্র কয়েক ফর্মা অনুবাদ করে ফেরত দেন। তারপর যশোরের মাওলানা সোলায়মান ফারুকী সাহেব দ্বারা বইটির বাকী অংশ অনূদিত হলে তা ছাপার জন্য প্রেসে দিই। আশা ছিল বইটি ১৯৯২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশিত হবে। কিন্তু নানাবিধ কারণে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে, বইটি পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। বইটিতে ইসলামী সমাজ জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের তথা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের বাস্তব প্রশিক্ষণের ধরণ, নিয়ম ও নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করি, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে বইটি সহায়ক হবে।

আল্লাহ্ হাফেজ
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
প্রশিক্ষণের উপকরণ ও উদ্দেশ্য

প্রত্যেক যুগ ও সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চেতনার ভিতিত্তে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণ ও প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক উপকরণ দ্বারা কোন না কোন উদ্দেশ্য হাসিল করাই লক্ষ্য; বাস্তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া অন্য কথা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শারীরিক ব্যায়ামও একধরনের প্রশিক্ষণ, যদিও নিয়ম মাফিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নয়। এক সময় নাজী জার্মানীর যুব সমাজকে কঠোর শারীরিক ব্যায়াম করানো হতো যাতে করে তাদের শরীর মজবুত হয়ে উঠে, তাদের মধ্যে শৃংখলাবোধ ও আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়, নির্দেশ মেনে চলে, রাষ্ট্রের খেদমত আঞ্জাম দেয়, নিজেদেরকে মহাপরাক্রান্ত স্বৈরশাসকের নির্দেশের অনুগত হিসাবে গড়ে তুলে।

ইংল্যাণ্ড ও উত্তর ইউরোপে শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামষ্টিক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি। কিন্তু এটাও হতে পারে যে, শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা উল্লেখিত উদ্দেশ্য হাসিল হয় না বরং তা শুধুমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠায় (Self Exaltation) নিয়োজিত হয়। কতক খেলোয়াড় আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনীতে (Self Assertion) লেগে যায়। এমনকি ফুটবল খেলাও, যার উদ্দেশ্যই হলো খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সামষ্টিক প্রেরণা সৃষ্টি করা। খেলোয়াড়েরা ব্যক্তিগত প্রচার ও প্রদর্শনীর মোহে পড়ে যায় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যায়।

রোমেও শারীরিক ব্যায়াম এখন শরীর পূজা, শক্তি ও সামর্থের প্রদর্শনী এবং সৌন্দর্য পূজায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এ ধরনের শারীরিক ব্যায়ামের ফলে মোটা তাজা, পেশীবহুল শক্তসামর্থ এমনসব লোক গড়ে উঠবে যাদের মধ্যে সূচনা থেকেই এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণামাত্র থাকবে না, ফলে তাদের অবস্থা একটা মোটা তাজা পালিত জানোয়ারের চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

কিসসা-কাহিনীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। এর মাধ্যমে কখনো পাঠকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক (The Spirit of Art) অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়, কখনো পরম সৌন্দর্যের অনুভূতি (Aesthetic Sense) বিকশিত হয়।

এ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া আত্মা (Souls) এবং সৃষ্টি জগতের (Univers) মধ্যে চিন্তা ভাবনার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক পথে চলার উপলব্ধি ও বিচক্ষণতা জন্ম নেবে। অন্যদিকে এটাও হতে পারে যে, এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কেবলমাত্র সময়-ক্ষেপণ, লক্ষ্যহীন ও বেহুদা কাজের কারণ হয়ে পড়তে পারে।

মোট কথা, প্রশিক্ষণের এ ধরনের অসংখ্য উপায় ও পদ্ধতি মওজুদ থাকা সত্ত্বেও এগুলো কোন পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নয়। এগুলোত কেবলমাত্র মাধ্যম যার নিজস্ব গুরুত্ব অবশ্যই আছে ; কিন্তু তার নির্বাচন ও গ্রহণ পরিপূর্ণ মনোযোগ ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন যাতে এটা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

ইসলামের পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এ দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এতটা পরিপূর্ণ, ব্যাপক ও সর্বব্যাপী যে, মানুষের জীবনের কোন দিক, কোন বিভাগ এর আওতা-বহির্ভূত নয়। উল্লেখ্য যে, মানুষের ইতিহাসে ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ছাড়া আর কোন প্রশিক্ষণ এতটা ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দেখা যায়নি।

এত ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় না। কারণ এটা এমন কোন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত উপাদানের সমষ্টির নাম নয় যার প্রত্যোকটি উপাদান মানুষকে একেকটি নতুন দিকে ধাবিত করে মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বিচূর্ণ করে তাকে পঙ্গু করে দেবে, বরং ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মানুষের সামনে একটা সরল সোজা রাজপথের সন্ধান পেশ করে তার সামনে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরছে যাতে করে গণমানুষ তার সামগ্রিক যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ দিয়ে এ সরল সোজা পথে চলতে পারে এবং বিভিন্ন মত ও পথের টানা হেঁচড়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে। ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির এ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, প্রথম দৃষ্টিতেই তা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। পাশাপাশি মানব রচিত যাবতীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতির চেয়ে এটা যেন সব দিক দিয়ে উন্নত, কল্যাণকর ও অনন্যতা পরিষ্কার হয়ে যায়।

পার্থিব প্রশিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষ্য হলো 'আদর্শ নাগরিক'

মানুষের তৈরি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কতিপয় উপায়-উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হলেও এসব উপায় উপকরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটাই। আর তা হলো 'ভালো নাগরিক' গড়ে তোলা। আর 'ভালো নাগরিক' এ শব্দটা সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, সে জুলুম নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির মূলোউচ্ছেদকারী সূর্যসৈনিক। কিন্তু যখন নিজ দেশ ও জাতির লাভ লোকশানের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন জুলুম ও বেইনসাফীর সাথে একাত্ম হতেও সে বাঁধা মনে করবে না।

কোন কোন জাতির মধ্যে ভাল নাগরিক সম্পর্কে ধারণা হলো সে এমন সৎ ও যোগ্য লোক হবে যে, নিজে কারো উপর জুলুম করে না, না অন্য কাকেও নিজের উপর জুলুম করার অনুমতি দেয়।

হতে পারে কোন জাতির দৃষ্টিতে 'ভাল নাগরিক' বলতে এমন এক দুনিয়া বিমুখ হতাশ বৈরাগী যে জীবনের এদ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বৈচিত্র্যতায় কোন আনন্দ ও বেঁচে থাকার স্বার্থকতা খুঁজে পায় না। কোন কোন জাতির দৃষ্টিতে 'ভাল নাগরিক' বলতে এমন সব লোকও হতে পারে যারা খাঁটি স্বদেশ প্রেমিক, দেশ প্রেমের উদ্দাম আবেগে যাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর, এ দেশে জন্মগ্রহণের জন্য যারা গর্বিত এবং দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও যারা প্রস্তুত।

ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য "ভাল মানুষ"

ইসলাম কথিত সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে। ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র 'ভাল নাগরিক' তৈরি করাই নয় বরং 'আদর্শ মানুষ' সৃষ্টি করাই এর মূললক্ষ্য। যে হবে পরিপূর্ণ মানুষ। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণাবলী খুঁজে পাবে বিকশিত হবার সুযোগ। সে কেবলমাত্র ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমায়িত কোন একজন ভাল নাগরিকই হবে না বরং সে হবে গোটা বিশ্বজাহানের ভাল নাগরিক, উত্তম অধিবাসী এবং আদর্শ মানুষ।

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য দুনিয়ার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি উচুস্তরের ও সঠিক কল্যাণকর। এ মর্যাদাসম্পন্ন পদ্ধতির মোকাবিলায় সব কিছুই হেয়, নগণ্য ও অর্থহীন হয়ে পড়বে।

ইসলামী ইতিহাসের মাক্কীজীবনকে যদি সামনে আনি তা হলে দেখা যাবে কতিপয় অসহায় মানুষ, যাদের সংখ্যা নগণ্য, দুশমন বেশি, যাদের হাতে কোন শক্তি নেই, নেই ক্ষমতার দাপট, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই যাদের ভরসা ও অভিভাবক। মাক্কীজীবনের এমনি অসহায় প্রেক্ষাপটে ইসলামী দাওয়াতের সূচনালগ্নে 'আল-কুরআন সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ - (التكوير)

"এটা তো সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ।"

প্রাথমিক পর্যায়ে আল-কুরআন এ মহাসত্যকে তুলে ধরলো যে, এ বিপ্লবী দাওয়াতের উপলক্ষ কেবলমাত্র কুরায়েশ, মক্কাবাসী কিংবা গোটা আরবই নয় বরং এ বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের মূল উপলক্ষ হলো সারা দুনিয়ার মানবতা। আর ঐ সম্বোধনে বর্ণ, গোত্র, বংশ, ভাষা, ও ভৌগলিক অবস্থানের পার্থক্য করা হয়নি।

পার্থক্য যা করা হলো তা এই যে, কারা এ দাওয়াত স্বাগত জানায় এবং মুত্তাকীদের দলে শামিল হয়ে যায়।

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"এরপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যাতে করে পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সেই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ"(হুজরাত-১৩)

আল কুরআনের এ আহ্বান সর্বব্যাপী। ভৌগলিক সীমাবধ্যতা, ভাষার সীমারেখা, বর্ণ, গোত্র ও বংশের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমায়িত নয়। এ বিপ্লবী দাওয়াত মানবতাকে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও স্তরে বিভক্ত করে না। ভাগ করে দেয় না বিভিন্ন বর্ণ ও বংশগত মর্যাদার মাপকাঠিতে। বরং এ কুরআনী দাওয়াত মানুষের মনে সত্যপ্রীতি সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে লুকায়িত মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত ও উদ্দীপিত করার প্রয়াস পাচ্ছে মাত্র।

তাকওয়াসম্পন্ন ইবাদতকারী মানুষ

ইসলাম মানুষকে জীবনের এ সুদীর্ঘ ময়দানে অসহায় অবস্থায় হয়রান ও পেরেশানীর মধ্যে ছেড়ে দেয়নি। বরং তার সামনে জীবনের সব দিক, সব অলিগলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে এমন একটা উজ্জ্বল রাজপথের সন্ধান দিয়েছে যা তাকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষের উচ্চতম স্থানে নিয়ে যাবে।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাশীল যে বেশি খোদাভীরু।" (হুজরাত-১৩)

সৎকর্মশীল ও মোত্তাকী মানুষ তারাই যারা কেবলমাত্র রাব্বুল আলামীনের বন্দেগী করে এবং জীবনের সব ব্যাপারে শুধুমাত্র তাঁরই হেদায়েতের মুখাপেক্ষী হয়।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

"আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত ও বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"(যারিয়াত-৫৬)

ইবাদতের তাৎপর্য

কতিপয় ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করাই ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত নয়। 'ইবাদত' অত্যন্ত ব্যাপক ও অর্থবহ পরিভাষা। জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে, কর্ম ও

তৎপরতার প্রতিটি পর্যায়ে চিন্তা ও চেতনার প্রতিটি সন্ধিক্ষণে, বিশ্বাস ও উপলব্ধির প্রতি মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলার নামই ইবাদাত। মোট কথা গোটা জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পছন্দ মোতাবেক পরিচালনা করা, যে সব কাজ ও কর্মে তার রেজামন্দি নিহিত, তা করা; আর যে সব কাজ ও কর্ম তিনি পছন্দ করেন না তা থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। ইবাদতের এ ব্যাপক ও বিস্তৃত ধারণা অনুসারে মানুষ সমগ্র জীবন, তার চিন্তা ও চেতনা কাজ ও কর্মের যাবতীয় পথ ও পন্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আইন ও কানুনের অনুগত।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে যারা সে হেদায়েত ও বিধান অনুসারে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলবে তাদের জন্য ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবতের কোন কারণ থাকবে না। (বাকারা-৩৮)

আল্লাহর খেলাফত

এ সব মানুষই যারা পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً .

"সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন- আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করবো"(বাকারা-৩০)

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا. -(الاسراء:٧)

"এটা আমার মেহেরবানী যে বনী আদমকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছি, জলে-স্থলে পরিবহন সুবিধা দিয়েছি, পবিত্র রিজিকের ব্যবস্থা করেছি এবং অনেক সৃষ্টির উপর ঈর্ষণীয়, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দিয়েছি।" (বনী ঈসরাইল-৭০)

খেলাফতে ইলাহীর শর্ত হলো মানুষ তার প্রাপ্য মর্যাদার দাবি এবং মনুষ্যত্বের উচ্চতম মাপকাঠিতে উপযুক্ত বিবেচিত হবে। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নিজেদেরকে যোগ্যতম হিসেবে গড়ে তুলবে। এ সব শর্ত পূরণের উপরই খেলাফত নির্ভরশীল। মানুষ যদি খেলাফতের এ সব শর্ত পূরণ করে এবং নিজেদের দায়িত্ব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেয় তা হলে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা তাদেরকে খেলাফত, স্বীয় পবিত্র

রেজেক এবং সৃষ্টিজগতের যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সব নেয়ামতকে তাকওয়ার পরিসীমায় আল্লাহর বিধানানুযায়ী প্রয়োগ করার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে বিনিয়োগ করাই মানুষের পবিত্র দায়িত্ব।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুঃ স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন

এ উদ্দেশ্যকে যেখানেই সুস্পষ্ট বিস্তৃতভাবে সামনে রাখা হয়েছে সেখানেই মানুষ বিনা বাঁধা-বিপত্তিতে স্রষ্টার দিকে মোননিবেশ করতে পারছে।

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ.

"হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান খোদার ব্যাপারে ধোকায় নিমজ্জিত করেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুস্থ-সঠিক বানিয়েছেন, ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে প্রকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সংযোজিত করেছেন।" (ইনফিতার-৬ -৮)

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ.

"হে মানুষ ! তুমি তো ক্রমান্বয়ে এক তীব্র আকর্ষণে নিজের খোদার দিকেই ফিরে যাচ্ছ এবং তার সাথেই মিলিত হবে।"(ইনশিকাক-৬)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সৃষ্ট অস্অসা (কুচিন্তা) সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত আছি। আমি তার গলার শিরা হতেও অধিকতর নিকটবর্তী।" (ক্বাফ-১৬)

এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তনই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু এবং এটাই ইসলামী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উৎস। আর এ উৎস থেকেই যাবতীয় আইন-কানুন, নিয়ম নীতি এবং নির্দেশিকা উপস্থাপিত হয় যার উপর ভিত্তি করেই মানব জীবনের ভবিষ্যত কর্মধারা নির্ধারিত হয়।

ইসলাম মানুষের গতিধারা তার স্রষ্টার দিকে ফিরিয়ে দিতে চায় এবং মানুষের নিকট এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চায় যে, মহান আল্লাহ তায়ালাই কেবলমাত্র যাবতীয় শক্তি সামর্থের মালিক, এবং আসমান ও যমীনের প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃত মালিক তিনিই।

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ·

"তাঁরই হাতে যাবতীয় বস্তুর ক্ষমতা নিবদ্ধ।" (ইয়াসিন-৮৩)

মানুষ যখন এ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পায় তখন সে আল্লাহকে ছাড়া অন্য আর কারো সামনে মাথা নত করে না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করে না। তার মন ও মানসিকতা শেরকের আবীলতা মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার দিকেই নিবদ্ধ হয়ে যায়।

মানুষ যখন সমগ্র মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর দিকে রূজু হয় তখন সে তার পথনির্দেশিকা পায় এবং তার প্রদত্ত পথেই চলতে থাকে। তার নিকট দুনিয়ার প্রত্যেকটি শক্তি অত্যন্ত দুর্বল, সমগ্র দাপট ও ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী ও প্রভাবহীন প্রতিভাত হবে।

সে কেবলমাত্র আল্লাহর ক্ষমতাকেই প্রকৃত ক্ষমতা, তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শৌর্য-বীর্য্যকেই প্রকৃত শৌর্য-বীর্য্য বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকেই জীবনের সঠিক পথনির্দেশিকা বলে মেনে নেয়। এ উপলব্ধি, বিশ্বাস ও তার প্রত্যয়ের আলোকেই সে তার জীবনের সংশোধন ও পুনর্গঠন করে থাকে।

যেহেতু এ ধরনের মানুষের শক্তি ও সামর্থের উৎস হলো আল্লাহ তায়ালা, তাই এ সৃষ্ট জগতে সে নিজের পজিশন ও মর্যাদা উপলব্ধি করে এবং স্বীয় ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি দিয়ে দুনিয়ার উন্নতি পুনর্গঠন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে তৎপর হয়। আর এ বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে সে কোন পেরেশানী অপারগতা প্রকাশ করে না। কারণ আল্লাহর নির্দেশে দুনিয়ার যাবতীয় শক্তি তার অনুগত হয়ে যায় এবং তাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ·

"সেই মহান সত্তা আসমান-যমীনের যাবতীয় বস্তুকে তোমাদের জন্য অনুগত বানিয়ে দিয়েছে।" (আল জাছিয়া-১৩)

মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার দিকে কায়মনোবাক্যে অনুগত হয়ে যায় তখন সে এ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে যে, যা কিছু হয় তা খোদার পক্ষ থেকেই হয় এবং তারই দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তারই কুদরতে সব জিনিষ অস্তিত্বে আসে। এ জন্যই সে যাবতীয় ব্যাপারে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ·

"মানুষের উচিৎ এটা খেয়াল করা যে, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সবেগে ধাবিত এক ফোঁটা পারি (বীর্য) থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা পিঠ ও বুকের মাঝখান থেকে নিঃসৃত হয়। সেই মহান সত্তা তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। যে দিন গোপন বিষয়ের ফয়সালা হবে সেদিন না তার নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগবে, না কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে।" (সুরায়ে তারেক-১০-১৫)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ .

"নিশ্চই আমি জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালাকারী এবং আমার দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"(ক্বাফ-৪৩)

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ .

"শেষ পর্যায়ে আমিই জামিন ও তার যাবতীয় সামগ্রীর উত্তরাধিকারী হবো এবং আমার দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"(মরিয়ম-৪০)

মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজু হয় তখন গোটা মানব জাতির প্রতি সে ভালবাসা দরদ ও একাত্মতা অনুভব করে। সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, সবাইকে তিনি অত্যন্ত ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন - এ উপলব্ধি সদা তার মধ্যে জাগ্রত থাকে এবং একটা আন্তরিক সহমর্মিতা অনুভব করে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .

"হে মানুষ! স্বীয় রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" (নিসা-১)

এ উপলব্ধি ও বিশ্বাস থেকেই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মানবতা বোধ, ত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণা জন্মলাভ করে। মতপার্থক্য শত্রুতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা অবদমিত হয়।

মোট কথা 'সব কিছুর উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল মহান আল্লাহ তায়ালা' - এ বিশ্বাস এমন এক ভিত্তি যার উপর "ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি" গড়ে উঠেছে। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনায় এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম তার উপায়-উপকরণ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কতটা অনন্য, একক ও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী। তা সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে এখানে বলা প্রোয়েজন যে, দুনিয়ার সমগ্র জীবন বিধান দু' ভাবে বিভক্ত। (ক) জীবন ও জীবনের জাবতীয় দ্বন্দ্ব থেকে দূরে অবস্থান করে কেবলমাত্র খোদার খেয়ালে থাকা এবং বৈরাগ্য অবলম্বন

করা। (খ) খোদাকে ছেড়ে দিয়ে জীবনের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের চেষ্টায় নিজেকে ভীষণভাবে নিয়োজিত করা এবং এটাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা। একমাত্র ইসলামই একক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ইহকালীন ও পরকালীন জেন্দেগী সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। দৈহিক দিক দিয়ে দুনিয়ায় কর্মতৎপর হয় এবং রূহানী সম্পর্ক গড়ে তুলে মহান আল্লাহর সাথে। কোনটাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রয়োজন পড়ে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মানব প্রশিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি হলো—গোটা মানব জীবনকেই, কোন বিশেষ দিক বা বিভাগ নয়, ইসলাম তার আওতায় নিয়ে আসে। সুতরাং মানুষের জৈবিক, আধ্যাত্মিক জীবন, তার চিন্তা চেতনা ও কর্মতৎপরতা ইসলামের গণ্ডির ভিতর এসে যায়। জীবনের কোন অংশ আর বাইরে থাকার সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন সে অবস্থায় ইসলাম তাকে গ্রহণ করে। তার ফিতরতের কোন অংশ তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় না। সাথে সাথে ফিতরতের বিপরীত কোন জিনিসও তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় না।

ইসলাম খুবই সূক্ষ্মভাবে মানুষের ফিতরতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ফিতরতের প্রতিটি জজবা প্রত্যেক আবেগ অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতা সুবিন্যস্ত করা এবং তা প্রকাশ ও বিকাশের সঠিক রাস্তা দেখানোর দায়িত্ব পালন করে ইসলাম। ইসলাম মানুষের ফিতরতের সমগ্র দিকগুলো এভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দেয় যেমন কোন বাদক বাদ্যযন্ত্রের তারগুলোতে মৃদু আঘাত করে এক সুমধুর মনোমুগ্ধকর ঝংকার ছড়িয়ে দেয়।

ইসলাম দ্বীনে ফিতরাত

ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপায় উপকরণগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, এগুলো কিভাবে মানব জীবনকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং মানব ফিতরতের সবগুলো দিকের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে আছে। মানব জীবনের কোন অংশই তার হেদায়েতের বহির্ভূত নয়। এটা প্রকৃত পক্ষে ইসলামের সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতার নিদর্শন। অন্য দিকে এ সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এ বিধান বিশ্বস্রষ্টার পক্ষ থেকেই এসেছে।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ .

"দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির উপর, যার উপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারে না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন।" (রূম-৩০)

ইসলামই দ্বীনে ফিতরাত। দুনিয়ার অন্য কোন পদ্ধতি মানব প্রকৃতি বা ফিতরাতকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় না যে ভাবে ইসলাম দেয়। ইসলাম মানুষের

ফিতরাতকে ভদ্র-সংস্কৃত, সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে গড়ে তোলে। তার চিন্তা-ভাবনা, কাজে-কর্মে ও আত্মীক উন্নয়নে এমন সব খোরাক সরবরাহ করে যা তাকে এলক্ষ্যে কর্মতৎপর করে তুলে।

•

জাগতিক পদ্ধতির খণ্ডতা

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ইসলাম ছাড়া আর কোন প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে এতটা সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা ও সর্বজনীনতা নেই, বরং ইসলাম ছাড়া প্রত্যেক পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধতা ও খণ্ডতা বিদ্যমান। এ সব পদ্ধতি মানুষের কোন একটি দিককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তারই উন্নতির প্রয়াস চালায় এবং অন্য সবগুলোর দিক আর তেমন খেয়ালই করা হয় না। সুতরাং কিছু মতবাদ তো এমন আছে যা কেবলমাত্র মানব জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোই বিশ্বাস করে যা ধরা ছোয়ার মধ্যে আছে তাই বিদ্যমান, গুরুত্বের দাবীদার ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমোন্নতির ব্যাপারে তারা যত্নশীল, বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরিতে আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক মনোযোগ দিয়েছে। ফলে মানুষের দৈহিক ও বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় ব্যবস্থা সুন্দরভাবে রয়েছে। তার আরাম আয়েশ সবরকম সুব্যবস্থা বিদ্যমান। মানুষের খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থানের মনোন্নয়নের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং দৈহিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ সব ব্যবস্থা তো আছে কিন্তু মানুষের রুহানী দিকটা একেবারে বাদ দেয়া হয়েছে। মানুষের ধরা-ছোয়া ও অনুভূতির মধ্যে যে সব জিনিস আসে না তাকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। যার ফলে এ বস্তুবাদী পদ্ধতিতে বিশ্বাস ও ধর্মের কোনই গুরুত্ব নেই। নেই সচ্চরিত্রের কোন মূল্য। সর্বোপরি এ জীবনের কোন পর্যায়েই জীবন ও জগতের মালিকের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক নেই। বিপরীত দিকে এমন কিছু মতবাদ রয়েছে যা কেবল মানুষের রূহানী দিকটাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্য সব দিক অনর্থক ও গুরুত্বহীন ও ধোকাপূর্ণ। প্রত্যেক বস্তুগত জিনিসই ধোকা ও প্রতারণার সামগ্রী। এ সব মতবাদ বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেয়, ইবাদত ও যোগসাধনার প্রচার করে থাকে। মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে নফসের ঝোঁক প্রবণতা অবদমন ও দৈহিক কামনা বাসনাকে উৎখাত করেই সে রূহানী উন্নতি লাভ করতে পারবে। এ সব আত্মনিবর্তন ও যোগসাধনা ব্যতীত বস্তুগত বন্ধন থেকে 'রূহ' মুক্ত হতে পারে না। পারবে না পুতিগন্ধময় অবস্থা থেকে উত্তরণ করে পাক পবিত্র হয়ে ঊর্ধ্বজগতের সফরের উপযোগী হতে।

বৈরাগ্যবাদের এ সব শিক্ষার উপর আমল করে মানুষ চিন্তার এক বুলন্দ স্তরে এবং উপলব্ধির এক কাল্পনিক জগতে পদার্পণ করে। এর পরেও কখনো যদি

দেহের গোপন কামনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তাহলে মানুষ রূহানী এ অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে দৈহিক কামনার সুখানুভূতিতে নীল হয়ে যায়।

আর যদি রূহানী শক্তি মানুষের উপর বিজয় হয় তাহলে সে অথর্ব ও কর্ম-হীনতার শিকার হয়ে পার্থিব জীবনে বেকার ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। মিথ্যা ও বাতিলকে উৎখাত করার কোন শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না, না থাকে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করার হিম্মত ও বলিষ্ঠতা।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে জীবন যাপনের পদ্ধতি হিসাবে কেবলমাত্র বস্তুগত ও দৈহিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়া, কিংবা দৈহিক চাহিদা ও বস্তুগত কামনা বাসনাকে অবদমিত করে শুধুমাত্র "রূহানী" তরক্কী ' কে গুরুত্ব দেয়া, এ দুটো চরম পদ্ধতিই সঠিক জীবন বিধান থেকে বিচ্যুতি (Diversion) ছাড়া আর কিছুই নয়। সুন্দর, সঠিক ও সত্যপথ হলো সেই খেলাফতের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই মানব ফিতরাতের সাথে সুসামঞ্জস্যশীল।

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً .

"আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।" (আল- বাকারা-৩১)

ইসলাম উল্লেখিত বিচ্যুতি থেকে মুক্ত একটি সুদৃঢ় জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের অুভূতিকে গুরুত্ব দেয়, সাথে সাথে তার ধরা-ছোয়ার বাইরের জিনিসকেউ অস্বীকার করে না। ইসলাম মনে করে মানুষ একাধারে বস্তুগত এবং অলৌকিক সৃষ্টি।

إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ .

"আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছি।" (সা'দ -৭১)

ইসলাম মানুষের শারীরিক অনুভূতি ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের সুন্দর বিধান দিয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, নর-নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণসহ মানুষের জাবতীয় বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের একটা ভারসাম্যপূর্ণ বিধান ইসলাম দিয়েছে। এ ছাড়া মানুষের শক্তি সামর্থকে সুসংগঠিত করে দুনিয়ার জীবনকে পুনর্গঠন ও উন্নত করা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের জন্যেও কাজে লাগায়।

ইসলাম মানুষের আত্মীক শক্তিকে ও মর্যাদা দিতে শিখিয়েছে

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِى فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ .

"পরে আমি যখন আদম (আঃ) কে পুরা মাত্রায় তৈরি করবো এবং তাতে নিজের রূহ ফুঁকে দিবো তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।" (সা'দ-৭২)

মানুষের রূহানীশক্তি ও তার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েই ইসলাম মানুষের বিশ্বাসের দাবিকে পূরণ করে আসছে এবং তার সামনে উচ্চতর দৃষ্টান্ত ও উন্নতির সুউচ্চ স্তর (Sublimation)[১]

সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সাথে সাথে মানুষের ঘুমন্ত শক্তিকে উজ্জীবিত করে তার নিজের নফসের সংশোধন ও গোটা সমাজের সংশোধনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষের সামনে ইসলামের শাশ্বত জীবন বিধান অনুযায়ী আদল ও ইনসাফ কায়েমের এক পূঁতপবিত্র লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে।

মোট কথা, মানুষের স্বভাবের সাথে পরিপূর্ণ মিল হয়েছে ইসলামের। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বলতে শরীর, রূহ ও বুদ্ধি বুঝায়, যা কখনও আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত করা যায় না। মানুষ কেবলমাত্র এমন একটি দেহের নাম নয় যার সাথে 'রূহ 'ও 'আকলের ' কোন সম্পর্ক নেই, না এটা দেহ ও আকল এর মুখাপেক্ষীহীন কেবল একটা রূহমাত্র। অথবা দেহ ও রূহ থেকে সম্পর্কহীন শুধুমাত্র 'আকল' বরং মানুষ এমন একটা সমন্বিত সত্তা যার উপাদানগুলো পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

কতিপয় পার্থিব মতবাদ মানুষের বাহ্যিক অবস্থার আলোকে বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। যার ভিত্তিতে কারো দৃষ্টিতে দেহটাই সব, তাই তারা দেহের পূজায় ও সেবায় লেগে গেছে। কেউ বুদ্ধিবৃত্তিকেই দেবতা বানিয়ে নিয়েছে। অন্য দিকে কেউ 'রূহ' কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়া ত্যাগের শিক্ষায় দীক্ষিত হচ্ছে। মোট কথা দুনিয়ার কোন জীবন ব্যবস্থায় মানুষকে পূর্ণ ' মানবীয় সত্তার ' আলোকে গুরুত্ব দেয়নি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার এটা একটা বিরাট ক্রটি যে তারা মানুষের বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে তার উপর গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং ফলস্বরূপ মানুষকে শুধুমাত্র 'দেহ' কিংবা 'রূহ' কিংবা ' আকল' এ বিভক্ত করে দিয়েছে এবং এসব সম্মানিত গবেষকদের ধারণা হলো তারা যে অংশ নিয়ে গবেষণা করছে সেটাই গোটা মানুষ। যদিও বাস্তবতা তার বিপরীত। নিঃসন্দেহে মানুষের উপর কখনও এমন সময় আসে যা প্রকৃত দৈহিক সময়, অথবা

---

১. রফয়াত (Sublimation) এর তাৎপর্য হলো স্বভাবগত (ঝোঁক) প্রবণতা ঠিকঠাক করে সমাজের গ্রহণযোগ্য করে তোলা। যেমন দোষ-ক্রটি খোঁজার প্রবণতাকে পরিবর্তিত করে সত্যান্বেষণের পেছনে লাগিয়ে দেয়া। কিংবা আক্রমণাত্মক মানসিকতাকে পরিবর্তন করে বাধা-বিপত্তি, দুখঃকষ্ট, বিপদ-মুসিবত সহ্য করার মত মানসিক ধৈর্য সৃষ্টি করা। এমনি করে নর-নারীর আবেগকে গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী কাজে লাগানো যায়। রাফয়াত একটা অর্বাচীন কাজ হলেও এর একটা ক্রমধারা আছে। ফলে বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো একাজের কিছু ভাল দিকগুলোকে সামনে রেখে স্বভাবগত ক্রটি বিচ্যুতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মোট কথা এটা অবদমন (Suppression) কিংবা পুনরুত্থান একটা সম্পূর্ণ আলাদা পরিভাষা।

প্রকৃত আকলী বা প্রকৃত রূহানী, যা থেকে এটা মনে করা হয় যে, এ সীমা নির্ধারিত এবং মানুষ এ সীমার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র কোন একটা সীমা বহন করতে পারবে। যদিও মানুষের উপর আপতিত সময় বাহ্যতঃ কোন একটা দিলকেই প্রকাশ করে। কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য নয়।

মানব ইতিহাসের ভয়ঙ্কর অধ্যায়

রাসূলে পাক (সঃ) এর উপর 'ওহী' নাযিলের সময়টা ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃসময়। এ দুর্যোগপূর্ণ সময়ে 'ওহী'র আলোক-বন্যায় গোটা দেশ উদ্ভাসিত হতে শুরু হলো। আধ্যাত্মিক উন্নয়নের এসময়ে পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে সারেনি। এসময়ে হুজুর পাক (সঃ)-এর জবান মোবারক সক্রিয় ছিল, ওষ্ঠদ্বয় ছিল কম্পমান, মনে এ ধারণা ছিল যে, ওহীর কথাগুলো সংরক্ষণ করে নেবে। সঠিক আধ্যাত্মিক এসময়ে বুদ্ধি-বিবেক ও শরীর স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে।

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ .

"হে নবী ! এ ওহীকে মুখস্থ করার জন্য বেশি তাড়াহুড়া করো না। এটাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং মুখস্থ করিয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব।" (কিয়ামাহ-১৬-১৭)

মানুষের উপর যদি এমন কোন সময় আসে যখন সে স্বীয় শরীর ও রূহ সম্পর্কে গাফেল হয়ে যায়—এ ভুলে যাওয়া খুবই সাময়িক, যখনই দুঃখ কষ্ট শুরু হবে, ক্ষুত পিপাসার উপলব্ধি আসবে তখনই স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে ভুলে যাওয়া শরীর ও মনের চেতনা ফিরে আসবে।

মানুষের উপর জৈবিক চাহিদা প্রাধান্য লাভ করলে তার মানবীয় বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জৈবিক আনন্দ ফূর্তি ও মজা তার জ্ঞান বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এ ধরনের আরাম-আয়েশ, আনন্দ-স্ফূর্তি বাহ্যিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চিন্তা ও অনুভূতির জগতে যদি কোন প্রচণ্ড আঘাত হানা যায় তা গলে তাদের ঘুমন্ত বিবেক ও প্রত্যয়ী সত্তা জেগে উঠবে এবং তার চিন্তা ও চেতনা ও আমলী জিন্দেগিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে।

মোট কথা, মানব সমাজের উপর কোন এক সময়ে কোন এক অবস্থা প্রাধান্য লাভ করলে মানব চরিত্রের কোন একটা দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, কিন্তু এ দিকটা গোটা মানবসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস নয় এবং এটা চিরন্তনও নয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ দিক যেমন পরস্পর সম্পৃক্ত তেমনি তার বাইরের দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন কাজকর্মই অন্যান্য কর্মতৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত নয় যদিও কখনোবা

করুক না কেন সে নিজে এ অনুভূতি থেকে বে-খবর থাকে না, অন্তরের মধ্যে সে সজাগ-সচেতনভাবে এ মুহাব্বত অনুভব করে আর তার গোটা সত্তা এ মুহাব্বতের রং-এ এমনভাবে রঞ্জিত থাকে যে, এ অনুভূতিকে ভাষার আবরণে সে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না।

প্রকৃতপক্ষে এ মুহাব্বতই ইবাদাতের অলংকার ও চাকচিক্য আর এরই কারণে মুমিন মনের ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে যাবতীয় সংকট সমস্যার মুকাবিলায় আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে এবং যে সকল দুরূহ কাজে তার মধ্যে মানবতা বিকাশ লাভ করে সে কাজগুলো অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে করে চলে এবং এভাবে তার আত্মা উন্নতির বিভিন্ন স্তরগুলো পার হতে থাকে।

মুমিন যখন ইসলামের ছায়াতলে এবং কুরআনের পরিবেশে জীবনযাপন করে তখন সে তার অস্তিত্বকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয়। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মালিক, মুনিব, প্রভু-অন্নদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক ও ভালমন্দ করনেওয়ালা এবং বিশ্বের সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ও পরিচালক।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ «ط» وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (فاطر : ٢)

"আল্লাহপাক যখন তাঁর রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন তখন তা বন্ধ করনেওয়ালা আর কেউ নেই, আর তিনি যখন কারো জন্য তা বন্ধ করে দেন, তখন সে দরজা খুলে দেয়ার মতও আর কেউ নেই এবং তিনিই মহাশক্তিমান, অথচ বড়ই বুদ্ধিমান।" (ফাতের-২)

মুমিন জীবনের সকল ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকেই রুজু করে, আর এটাত অতি স্পষ্ট কথা যে, তার নজরে আল্লাহ ব্যতীত রুজু করার মত আর কোন যায়গা, ফায়দা বা গুরুত্ব নেই, বরং সে বুঝে যে, গায়রুল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো) কাছে রুজু করইে হীনতা, আপমান, ক্ষতি, সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া এবং দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া ছাড়া অন্য কোন ফায়দাই পাওয়া যাবে না।

أَ يَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ؟ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا - (النساء : ١٣٩)

"ওরা ঐ (কাফের) ব্যক্তিদের কাছে মান মর্যাদা পাওয়ার আশা করে না কি? তাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইজ্জত বলতে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ।" (নিসা-১৩৯)

আর যদি মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহকে আশ্রয়দাতা হিসেবে গ্রহণ করে, তবুও সে আল্লাহর ক্ষমতার গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা

মনে সর্বক্ষণ জাগরুক থাকে (তাহলেই প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন মন্দ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না)।"

এ আল্লাহভীতি এবং তাকওয়া (আল্লাহ্র ভয়ে বাছ-বিচার করে চলার মনোভাব) মানুষকে সঠিক পথে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করে ও মজবুতী দান করে, আর এর ফলে সমাজে সততা ও সত্যপ্রিয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে একটি সুন্দর ও কল্যাণপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে; পাশাপাশি, জুলুম-হিংসা-বিদ্বেষ, সামাজিক অনাচার অবিচার বিদূরিত হয়ে এর পরিবর্তে সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক কল্যাণ কামনা গড়ে ওঠে। কারণ এসকল সদ-গুণের মূল উৎসই হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের মনোভাব এবং মুহাব্বতপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার তীব্র অনুভূতি।

আল্লাহর মুহাব্বত

এ এক মজার ব্যাপার যে, যেখানে ইসলামের ছায়াতলে এবং কুরআনের পরিবেশে থাকার কারণে মুমিনদের আল্লাহ্ভীতি ও তাকওয়া-পরহেজগারী গড়ে ওঠে সেখানে তাদের মধ্যে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে এক পবিত্র মুহাব্বতও সৃষ্টি হয়ে যায়। ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে অবস্থান করে তাদের মধ্যে আল্লাহ্পাকের দীদার (সাক্ষাত) লাভ করার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়; কিন্তু এটা সত্য যে এ আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ করে উদিত হয় না বরং সদগুণাবলীর নিরন্তর অনুশীলনীর কারণে এবং আল্লাহ্ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা থাকার ফলে কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর প্রতি যে পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টি হয় তারই কারণে এ মুহাব্বত পয়দা হয়।

মুমিনের পুরো জীবনটাই আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যের অনুভূতির মধ্যে কাটে। সে তার চিন্তা-অনুভূতিতে এবং বাস্তব কথা ও কাজের মাধ্যমে সদা-সর্বদা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে। তার প্রতিটি চিন্তা-ভাবনা, তার অনুভূতি নিচয় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব কাজ ও নামাজসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদতবন্দেগী সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত হয়। এর সাথে সাথে দৃষ্টির অগোচরে কৃত তার ত্যাগ-কুরবানীতে তার নাজুক অনুভূতির প্রতি মুহূর্তে এবং সদাসর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার সংগে তার স্থায়ী মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়ে যায়। এ এমন এক মুহাব্বত যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বা যার ব্যাখ্যাও করা যায় না। এ মুহাব্বত মানুষের গোটা অস্তিত্বকে ঘিরে রাখে এবং আলোতে গোটা বিশ্বকে সে আলোকিত করে।

মুমিন এ আল্লাহ-প্রেমকে যতই অন্তরের গভীরে এবং গোপন কন্দরে পোষণ

করে তাহলে সে কি সওয়াব পাবে? তিনি বললেনঃ মোটেই নয়, এবং এরশাদ করলেনঃ "কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার অভিলাষে কোন কাজ করলেই তবে তার কাজ আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে।"

মুমিনদের অন্তর প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বকে সামনে অনুভব করে আর এই কারণেই সে কারো ক্ষতি করা দূরে থাকুক অকল্যাণ চিন্তাও করতে পারে না। কারণ সে জানে যে, তার মনে উদিত প্রতি চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা সম্যক অবগত; বরং এর পরিবর্তে মানুষের কল্যাণ চিন্তাতেই তার মনমগজ ভরপুর থাকে এবং কিসে মানুষের ভাল হবে এবং কিসে তার উপকার হবে সেটাই তার সর্বক্ষণ কাম্য হয়, এমনকিঁ তার স্বভাব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হয়ে যায় মানুষের কল্যাণ চিন্তা।

মুমিনের অন্তর নিজ-চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতেও আল্লাহ্র অস্তিত্বকে সামনে রাখে, কারণ সে বুঝে যে আল্লাহ্পাক তার প্রতিটি গোপন কথা, প্রতিটি গুপ্ত তথ্য যা মনের কোণে আনাগোনা করে এবং প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও ওয়াকেবহাল। যার হদিস অনেক সময়ে মানুষ নিজেও খুঁজে পায় না। আর এ কারণে একজন মুমিন পবিত্র অনুভূতিসমূহের ধারক ও বাহক হয় এবং তার মধ্যে কোন ভুল কোন অনুভূতি থাকলেও তার ঈমানী মজবুতী বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মধ্যে নিজের অগোচরেই সংশোধনী আসতে থাকে। কেউ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকুক এবং সে একাই ভাল জিনিষের অধিকারী হোক এ চিন্তাই আর সে করতে পারে না। সে মিথ্যা লোভ-লালসা এবং হারাম কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। সে সুবিধাবাদী হতে পারে না এবং এমন কাজ সে কখনও করে না যার দ্বারা লোকেরা তাকে এমন চরিত্রবান মনে করবে যা আসলে সে নয়, বরং তার দুর্বলতাগুলো লোকের সামনে প্রকাশ পাবে বলে সে শংকিত নয়, বরং এটা পুরাপুরিভাবে বুঝেই সে নিজ ক্রটিগুলো সংশোধনে ব্রতী হয়। এভাবেই তার আচরণে ঈমানি আল্লাহ-প্রীতি ও আল্লাহ-ভীতি প্রকাশ পায়। তার অন্তরের গভীর থেকে ঈমানের ঝলক ফুটে ফুটে বেরুতে থাকে। তার চিন্তা-ভাবনা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, সে যখন যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তার সাথে আছেন এ অনুভূতি তাকে নির্ভীক বানায়। জীবন তার পুণ্য কর্মময় হওয়ার কারণে তার মন হয় বলিষ্ঠ, যার ফলে সে কোন কারণেই আল্লাহর কাছে আত্মগোপন করতে চায় না। আত্মার এ পরিশুদ্ধ অবস্থাই হচ্ছে এহ্সান-এর স্তর, যা ঈমানী মজবুতীর বহিঃপ্রকাশ বাস্তব আনুগত্যময় জীবন-এর সুন্দরতম অবস্থা। এ সম্পর্কে নবী পাক (সঃ)-এর এরশাদ লক্ষণীয়ঃ "তুমি আল্লাহর সার্বক্ষণিক এবং পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য (ইবাদত) এমনভাবে কর যেন তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দেখছেন আর যদি এতখানি ভাবতে নাও পার তো আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এ চিন্তা যেন তোমার

ও বিভিন্ন ভাষা-বর্ণ ও নানা আকৃতির মানুষ এবং তাদের বিচিত্র ব্যবহার ও হ্রাস-বৃদ্ধি, কিশলয়ের মিষ্টি-মধুর মুচকি হাসি এবং এ সব কিছুর ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের অনুভূতি তার হৃদয়কন্দরে এমন এক তীব্র এবং সুকোমল অনুভূতি জাগায় যে, সে অবচেতন মনে মহান পরওয়ারদিগারের মধুর পরশে ধন্য ও বিনয়াবনত হয়ে পড়ে। কোন মুমিনের অন্তর আল্লাহ্পাকের ক্ষমতার এসব নিদর্শনগুলো যখন অনুভব করে এবং আসমান-জমীনের মধ্যে অবস্থিত সজীব ও নির্জীব পদার্থসমূহ সবই যে বিশ্বসম্রাটের অদৃশ্য ইশারায় গতিশীল রয়েছে, প্রকাশ্য ও গোপন কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়, কোন মানুষ ও তার কোন কার্যকলাপ তাঁর নজরের আড়ালে নেই, এমনকি তার চিন্তা, তার অনুভূতি, তার অন্তরের গোপন কন্দরে লুক্কায়িত প্রতিটি গোপন কথা এবং চোখের পর্দার সামনে ভেসে উঠা প্রতিটি প্রতিচ্ছবি, তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁর জানা বলে যখন সে গভীরভাবে অনুভব করে তখন সে ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়ে পড়ে এবং নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সামনে বিনীতভাবে ঝুঁকে পড়ে। যেহেতু তিনি তার প্রত্যেক ছোট-বড় এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল।

সে অনুভব করে যে, যখনই কোন কাজ সে করে আল্লাহ তায়ালা তার সে কাজ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, কোন ব্যাপারে যখন সে চিন্তা করতে থাকে তখনও আল্লাহপাক তা জানতে পারেন আর যখন কোন অনুভূতি ও চেতনার মধ্য দিয়ে সে অতিক্রম করে চলে, তখন আল্লাহ্পাক তা দেখতে থাকেন।

একজন মুমিন এই অনুভূতির ফলে যে কাজগুলো করে তা খালেস নিয়তেই করে থাকে। আর তার কাজগুলো সকল প্রকার খারাবী থেকে পাক থাকে, তার কোন কাজই চিন্তা-ভাবনাহীনভাবে এবং পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনতার সাথে সংঘটিত হয় না; বরং তার প্রত্যেক কাজের লক্ষ্য হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। কারণ আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা তার কাজের প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দিক অনুসারে তাকে ধর-পাকড় করেন না, বরং প্রত্যেক কাজ সে কোন নিয়তে করছে এবং কতটা নিষ্ঠা নিয়ে করছে তাও দেখেন। এ ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর বাণী

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مَا نَوَى .

"সকল কাজকে নিয়তের উপর বিচার করা হবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তারই বিনিময় দেয়া হবে যে নিয়ত সে করেছে।"

আল্লাহ্ সুব্হানুহু ওয়া তায়ালা শুধুমাত্র সেই কাজগুলোকে কবুল করেন যা একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

"এক ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদান বা বেতন পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা সুনাম অর্জনের জন্য জিহাদ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ .

"আল্লাহ্ তায়ালা সর্বোত্তম কথা (কালাম) নাজিল করেছেন, তা এমন এক কিতাব যার অংশগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, যার মধ্যে বিষয়বস্তুগুলো বারবার পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে (আল্লাহকে) ভয় করে, বলে তাদের শরীরের চামড়া ও লোমগুলো তার ভয়ে কেঁপে উঠে তারপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর ভয়ে গলে যায় এবং তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। ঐটিই আল্লাহর পথপ্রদর্শনের কিতাব (হেদায়েত) যার দ্বারা তিনি যাকে চান, তাকে হেদায়েত দান করেন।" (যুমার-২৩)

وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ . (الحج: ٢٤-٢٥)

· "হে নবী, তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যাদের নিকট আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁদে উঠে।"

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا. (مريم : ٥٨)

"তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদেরকে মহাদয়াময় (রহমান)-এর আঘাত শুনানো হলে কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদাতে পড়ে যেতো।" (মরিয়ম-৫৮)

وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا. (الاسرا : ١٠٩)

"আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় এবং একে অপরের কান্না শুনে তাদের কান্নাকাটি আরও বেড়ে যায়।" (আলে-ইমরান-১০৯)

আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও তাঁর ভয় জাগ্রত হওয়া

মানুষের অন্তরের নিকট কুরআনে করীম সৃষ্টিজগত ও প্রাণিকুলের নিদর্শনসমূহ পেশ করে এবং আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও প্রচণ্ড শক্তির চিরন্তন হাকীকাতকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ব্যাপক ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা স্পষ্ট করে জানায়। আরও জানায় যে, তাঁর সাম্রাজ্য কত বিশাল ও ব্যাপক। একজন মুমিন যখন গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে তখন তার ছত্রে ছত্রে আল্লাহ্ তায়ালার শক্তি-ক্ষমতার দিগন্তব্যাপী নিদর্শনগুলো পর্যায়ক্রমে ভেসে উঠতে থাকে; ছোট-বড়, বৃক্ষ-তরু-লতা, পাহাড়-পর্বত, কীটপতঙ্গ, গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সুরুজ, জীব-জানোয়ার

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - (المجادلة : ٦)

"তুমি কি চিন্তা করে দেখনা যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন। যখনই গোপনে তোমরা তিনজনে কিছু পরামর্শ কর তখন চতুর্থ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা জানতে পারেন। আর পাঁচ ব্যক্তি করলে ষষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা তা জানবেন, আর এই সংখ্যার কম বেশি যেই সংখ্যা হোক না কেন তিনি তাদের সংগেই থাকবেন। যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তাদেরকে কেয়ামতের দিন যা তারা করেছে তা'সব জানিয়ে দেবেন। নিশ্চই আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেবহাল।" (মুজাদেলা-৬)

আল্লাহ্র দিকে মনোযোগ

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো অন্তরকে যখন পবিত্র আল্লাহ্র পরিপূর্ণ ক্ষমতার কথা জানায় এবং তার চেতনার গভীরে দোলা দিতে থাকে আর এর ফলে তার অন্তর সর্বক্ষণ এবং সদা-সর্বদা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর দিকে মনোযোগি হয়ে যায় তখন অন্তর ও আল্লাহ্র মধ্যে এক অভংগুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর এই সম্পর্ক কাজ ও চিন্তাক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজ করতে থাকে, এমন কোন মুহূর্ত যায় না যখন এই আল্লাহ্-স্মরণী দূর হয়ে যায়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা জনসমাজে বা একাকী যেখানেই হোক না কেন বিভিন্নভাবে এর নমুনা প্রকাশ পেতে থাকে। এসম্পর্ক কখনো আল্লাহ্ভীতি ও পরহেজগারীর রূপ ধরে আসে, কখনো প্রকাশ পায় জীবনের সকল লেন-দেনের ক্ষেত্রে। কখনো বিচার-বিচেনায়, কখনো মানুষের প্রতি দয়া-মায়া ক্ষমতায় আর কখনো সমস্যার মুকাবিলা বা কোন কঠিন অবস্থার মধ্যে মানসিক প্রশান্তিতে ও ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে।

আসলে প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, কুরআন যার দিলে বাসা বেঁধেছে আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী সেই মুমিনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায় এবং সে কুরআনের হেদায়েতের আলোকেই আলোকিত হতে থাকে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ. (المؤمنون : ٢٧١)

"অবশ্যই সেই মুমিনগণ নিশ্চিতভাবে সাফল্যের মধ্যে আছে যারা তাদের নামাযের মধ্যে বিনয়াবনত ও ভীত-সন্ত্রস্ত।"(মুমেনুন-২৭১)

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ . (سبا : ٢)

"পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু প্রকাশ করে আর যা বের হয়ে আসে, আর আসমান থেকে যা নাজিল হয় এবং যা আকাশে উঠে যায় সবই তিনি জানেন। আর তিনিই দয়াবান মাফ করনেওয়ালা।" (সাবা-২)

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِى الْكِتَابِ . اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ .

"কোন মহিলা পেটে যে বাচ্চা ধারণ করে তারপর যা প্রসব করে সবই তার জ্ঞাতসারে হয়। কারো বয়স বৃদ্ধি হোক বা কমে যাক সবই পূর্ব নিদ্ধারিত এবং কিতাবে লিখিত আছে। এ কাজ আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ।" (ফাতের-১১)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرِ .

"চোখের গোপন দৃষ্টি আর বুকের মধ্যে যা গোপন রাখা হয় তা সব তিনি জানেন।" (গাফের-১৯)

ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ . يَا بُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوَاتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ «ط» اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ . (لقمان : ١٥-١٦)

"তারপর আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে এবং তখন তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দেব ঐ সব বিষয় যা কিছু তোমরা (পৃথিবীর বুকে) করেছিলে। হে বৎস আমার, (লুকমান বললেন) রাইয়ের দানার সমান কোন ক্ষুদ্র জিনিষও যদি পাহাড়ের উপর অথবা আকাশমণ্ডলীর মধ্যে অথবা জমীনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে সেখান থেকেই তা আল্লাহ তায়ালা নিয়ে আসবেন।" (লুকমান -১৫-১৬)

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى . (طه : ٧)

"চুপিসারে বলা কথা, বরং তার থেকে আরও গোপন কথাও তিনি জানেন।" (ত্বহা -৭)

দিকে রূজু করার সাথে সাথে কুরআনে করীম আমাদেরকে তার সকল জিনিষ সম্পর্কে ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের চেতনা দান করেছেন। মানুষের অন্তরের গোপন কন্দরে কি কথা আনাগোনা করে তাও তিনি জানেন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

"আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি যে গায়েব বা অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না। একমাত্র তিনিই জানেন জলভাগ ও স্থলভাগের কোথায় কি আছে। আর গাছের একটি পাতাও যদি পড়ে তাও তিনি জানতে পারেন। পৃথিবীর অন্ধকার কোন স্থানে কোন শস্যভাণ্ডার যদি লুকিয়ে থাকে তা যেমন তিনি জানেন তেমনি জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ অথবা জড় কোন পদার্থও যা যেখানে আছে সবই তার নখদর্পণে এবং তার তালিকা একটি স্পষ্ট কিতাবে লিখিত রয়েছে। তিনিই তো রাতের বেলায় তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন আর দিনের বেলায় যা কিছু কাজকর্ম তোমরা কর তার কোনটাই তার অজানা নয়। তারপর তিনি তোমাদেরকে ঘুম থেকে তোলেন যাতে করে তোমাদের দেয়া জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়। এরপর তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তখন তিনি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা (দুনিয়ার বুকে) করে এসেছ।"(আনয়াম-৫৯-৬০)

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (ج) الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (ط) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ - (الرعد : ١٠)

"প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকেবহাল, তিনি সব কিছু থেকে বড়, চুপে চুপে কেউ কথা বলুক আর উচ্চ স্বরেই বলুক সবই তার কাছে সমান, আবার রাতের আঁধারে কেউ লুকিয়ে থাকুক বা কেউ [illegible] প্রকাশ্যে লোকেরা করুক তাঁর কাছে সমান।" (রা'দ -১০)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا – (الرعد: ١٥)

একমাত্র আল্লাহকেই তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সিজদা করে চলেছে।" (রা'দ-১৫)

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ – (النحل : ٥٣)

"যা কিছু নেয়ামত তোমরা পেয়েছ সবই তো আল্লাহপাক থেকে এসেছে।" (নাহল-৫৩)

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ – (البروج : ١٦)

"তিনি যা চান, তা তিনি করেই ছাড়েন।" (আহযাব-৬২)

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً – (الاحزاب : ٦٢)

"আর তুমি আল্লাহর নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন পাবে না।" (আহযাব-৬২)

মহান আল্লাহ্পাকের কর্তৃত্ব ও মালিকানা

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে প্রকৃতির মধ্যে লুকানো রহস্য এবং সৃষ্টি - নৈপুণ্যের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ তায়ালার কুদরতের যে বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে তাতে যে কোন অনুভূতিশীল হৃদয় বুঝতে পারবে যে, সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা। তারই কর্তৃত্বাধীন রয়েছে সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় ও প্রাণিকুল। তার নিকট বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি দুর্বল ও অসহায়। তার সামনে তাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা গুরুত্ব নেই এবং সবাই এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। সৃষ্টির মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার মর্জি ছাড়া নিজ ইচ্ছামত নিজের বা অপর কারো জন্য কিছু করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ভাল-মন্দের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারো উপকার করতে পারে না বা কেউ কারো ক্ষতিও করতে পারে না।

মানুষের রুজি-রোজগার, জীবন মৃত্যু সবই তার হাতে। মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করে তার হিসাব নেয়া ও পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া তারই ইখতিয়ারাধীন।

بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – (الملك : ١)

"বাদশাহী তাঁরই হাতে এবং তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।"(মূলক-১)

মানুষের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা এই বিস্ময়কর এবং সর্বব্যাপী শক্তি ক্ষমতার

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (البقرة : ٢١٢)

"আর আল্লাহ্ তায়ালা যাকে খুশী তাকে বিনা হিসাবে রিজিক (জীবন সামগ্রী) দান করেন।"(বাকারা -২১৬)

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. (البقرة : ٢٥٢)

"কমানো বাড়ানো সব আল্লাহ্ই করেন। আর তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"(বাকারা -২৫৩)

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. (البقرة: ٢٥٣)

"আল্লাহ্র মর্জি না হলে ওরা কোন লড়াই-ই করত না। বরং আল্লহ্পাক যা চান তাইতো করেন।" (বাকারা-২৫৩)

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ «ط» وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

(آل عمران – ٧٣)

"বল, (হে নবী) সম্মান ও মর্যাদা অবশ্যই আল্লাহর ইখতিয়ারে রয়েছে, যাকে খুশী তিনি তা দেন, এবং আল্লাহ তায়ালা প্রশস্ত দৃষ্টি রাখনেওয়ালা, সবকিছু জানেন।" (আলে-ইমরান-৭৩)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. (آل عمران : ١٥٩)

"তুমি যে তাদের প্রতি বড় নরম দিল হতে পেরেছ এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই রহমত।" (আলে-ইমরান-১৫৯)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى – (الانعام : ١٧)

"(হে নবী), নিক্ষেপ যখন করেছিলে, তখন আসলে তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (আনয়াম-১৭)

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ . (يونس : ٦٤.)

"আল্লাহ্ তায়ালার কথা কেউ বদলাতে পারে না।" (ইউনুস-৬৪)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ – (هود : ١٢٣)

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যা লুকিয়ে আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ তায়ালা। (আর যে যাই করার চেষ্টা করুক না কেন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।" (হুদ-১২৩)

فَيَكُوْنُ «ط» فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

(يس: ٨١-٨٣)-

"যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ জিনিষ আরও সৃষ্টি করতে পারে না ? অবশ্যই পারেন, তিনি জ্ঞানবান মহাস্রষ্টা। তাঁর কাজের ধারা তো হচ্ছে, কোন কিছু করতে চাইলে তিনি শুধু বলেন, হয়ে যা, (সঙ্গে সঙ্গে) হয়ে যায়। অতএব সেই পাক জাত মহাপবিত্র মাওলাপাক যার হাতে সব কিছুর পরিপূর্ণ ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে। আর তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (ইয়াছিন -৮১-৮৩)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ . (الانعام - ١٨)

"তিনি নিজ বান্দাহ্দের উপর জবরদস্ত শক্তিমান (যা খুশি করতে পারেন)।"
(আনআম -১৮)

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ . (الدهر : ٣٠)

"তোমরা যা চাও তা কিছুই হবার নয়, তাই হবে যা তিনি চাইবেন।"
(দাহার-৩০)

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. (التوبة : ٥١)

"বল (হে রাসূল) আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের ভাগ্যে দুঃখকষ্ট যা লিখে রেখেছেন তাই শুধু আমাদেরকে স্পর্শ করবে। সেগুলো ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের ছুঁতে পারবে না। তিনিই আমাদের দরদী অভিভাবক, আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।" (তওবা-৫১)

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ (البقرة : ٥)

"আর আল্লাহ্ তায়ালা রহমত দান করার জন্য যাকে ইচ্ছা তাকে বেছে নেন।" (বাকারা-১০৫)

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا «ط» اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (البقرة : ١٤٨)

"যেখানেই তোমরা থাক না কেন সেখানে থেকেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে আসবেন। নিশ্চই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।" (বাকারা -১৪৮)

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ اَنْ تَزُوْلاَ وَ لَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ «ط» اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا. -(الفاطر : ٤١)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই ধরে রেখেছেন যাতে করে এগুলো নিজ স্থান থেকে টলে না যায়। আর টলে যেতে চাইলে আল্লাহ্ ছাড়া এগুলোতে ধরে রাখার মতও আর কেউ নেই, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল মাফ করনেওয়ালা।" (ফাতের-৪১)

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ «ط» وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (فاطر : ٢)

"মানুষের জন্য আল্লাহপাক রহমতের কোন দরজা যদি খুলে দেন তো সেটা কেউ বন্ধ করতে পারে না, আর তিনি কোনটিকে ঠেকাতে চাইলে তার উপর এমন কেউ নেই যে, সে তার রহমত ডেকে আনতে পারে।" (ফাতের-২)

ءَ اَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ يُنْقِذُوْنَ. (يس : ٢٣)

"তাকে বাদ দিয়ে আমি আর কাউকে আমার উপাস্য ও ক্ষমতাধর মেনে নেবো? পরম করুণাময় (আল্লাহ) কোন ক্ষতি করতে চাইলে ঐ সব উপাস্যগণের সুপারিশ কোন কাজ হবে না এবং তারা আমার নিকট থেকে কাউকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।" (ইয়াছিন -২৩)

قُلْ اَفَرَئَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهٖ (الزمر: ٣٨)

"ওদের জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, আল্লাহ তায়ালা কোন ক্ষতি করতে চাইলে তোমাদের ঐ দেবীগণ সে ক্ষতি দূর করতে পারে কি, অথবা তিনি কোন রহমত দান করতে চাইলে ওরা কি সত্যই তা ঠেকাতে পারে?" (যুমার-৩৮)

اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ «ط» بَلٰى وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ. اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ «ط» اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . (آل عمران : ٢٦)

"বল, হে আমার মাওলা ! সমস্ত দেশ ও সাম্রাজ্যের মালিক একমাত্র আপনিই, আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে বাদশাহী দেন, আর যার কাছ থেকে খুশী, বাদশাহী কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা তাকে ইজ্জত দেন এবং যাকে খুশী তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন, আপনার হাতেই সকল কল্যাণ আর আপনি সবকিছুই করতে পারেন।" (আলে ইমরান -৩৫)

سُبْحَانَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ. (مريم : ٣٥)

"মহাপবিত্র সেই সত্তা, তিনি কোন কিছু করার ফয়সালা করলে শুধু বলেন হয়ে যা, তা অমনি হয়ে যায়।" (মরিয়ম -৩৫)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ «ط» وَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ «ج» وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ. (الرعد: ١١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন না করে। আর আল্লাহপাক কোন জনপদকে কোন ক্ষতি করতে চাইলে তা রদ করনে-ওয়ালাও কেউ নেই এবং এমন জাতির জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু বা সাহায্যকারীও হতে পারে না।" (রা'দ-১১)

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا.
(الكهف : ١٧)-

"আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়েত করেন সেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে আল্লাহ তায়ালা গুমরাহ্ করেন তার জন্য সঠিক পথ দেখানেওয়ালা কোন অভিভাবক পাবে না।" (কাহাফ-১৭)

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ. (آل عمران : ١٦٠)

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করতে চাইলে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ হতে পারবে না, আর তিনি যদি তোমাদের লাঞ্ছিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে, তোমাদের সাহায্য করতে পারে ?" (আলে ইমরান -১৬০)

কিছু জ্ঞানের সন্ধান দেয় এবং প্রতি স্থানেই স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক অনুভূতি জাগায়। সুতরাং এখানে সামান্য কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَانَصِيْرٍ. (البقرة : ١١٧)

"তুমি কি জাননা যে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা আর তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।" (বাকারা-১১৭)

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. (البقرة : ١١٧)

"আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীকে তিনিই বাস্তবে এনেছেন, তিনি কিছু করতে চাইলে বলেন হয়ে যাও, অমনি হয়ে যায়।" (বাকারা-১১৭)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ «ط» لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ «ط» مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ «ج» يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ . (البكرة - ٢٥٥)

"আল্লাহ হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া সর্বময় শক্তি ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই, তিনি চিরজীবিত, চিরদিন নিজ ক্ষমতার আসনে টিকে আছেন, তাঁকে কোন তন্দ্রা ঘুম স্পর্শ করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক একমাত্র তিনি। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে (কারো জন্য) সুপারিশ করতে পারে? তিনি ওদের সম্মুখস্থ জিনিষগুলোকে যেমন জানেন তেমনি জানেন তাদের পেছনের দিককার জিনিষ সম্পর্কেও, তার জ্ঞানের ভান্ডারে কত কি যে আছে তা কেউ কিছুই জানে না বা কেউ শুমারও করতে পারে না, তবে তিনি যেটুকু যাকে জানতে চান সে ততটুকু জানতে পারে। তার ক্ষমতার আসন আকাশমণ্ডলী ও সমগ্র দুনিয়ার উপর ছড়িয়ে রয়েছে, এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। তিনিই মহান তিনিই বড়।" (বাকারা -২৫৫)

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ.

"আল্লাহ তায়ালাই আসমান-যমীন ও এর মধ্যেকার সব কিছুর মালিক, আর তার কাছেই সকল কাজ পেশ হয়।" (আলে ইমরান -১০৯)

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ «ج» مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ - اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ «ج» نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ «ج» يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ «ج» وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ. وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ. (النُّور : ٣٥)

"আল্লাহ্ তায়ালা আসমানসমূহ ও জমিনের নূর, তার নূরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে একটি তাকের সাথে যার মধ্যে একটি বাতি রয়েছে এবং সে বাতি একটি স্বচ্ছ কাঁচের বাতি-দানির মধ্যে এমনভাবে রয়েছে যেন তা মোতির মত একটি উজ্জ্বল তারকা। এ বাতিকে জ্বালানো হচ্ছে বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল দিয়ে। এর আলো পূর্ব পশ্চিম কোন দিকেই বাঁকিয়ে যায় না, যা আগুনের স্পর্শ না পেলেও উজ্জ্বল হয়ে উঠে; আলোর উপরে আরও আলো। এ আলো দিয়েই আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেন, আর আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন।"

(আন নূর -৩৫)

জ্ঞান -বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় থেকেও মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তার কাছে সৃষ্টিকুলের বহু রহস্যই ধরা পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলো অনেক সময়ে তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সে প্রকৃতির পূজারী হয়ে উঠে এবং প্রকৃতিকেই নিজ উপাস্য ও প্রতিপালক বলে মেনে নেয়। এ ভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে জীবন সংগ্রামের কথা ভুলে যায়। এসময়ে একমাত্র কুরআন করীমই মানুষের অন্তরকে আল্লাহ্পাকের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আর আল্লাহ্পাকও তার অন্তরের গভীরে তার সম্পর্কে অনুভূতি পয়দা করে দেন এবং তার বাস্তব ও কর্মজীবনে তাকে পথ দেখান। সৃষ্টিকুলের সকল বস্তুই আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। কুরআনে করীম যেখানে মানুষের অন্তরাত্মাকে বিশ্বপালকের জগদ্ব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন করে, সেখানে এ কথাও স্পষ্ট করেও দেয় যে, সৃষ্টিলোকের প্রতিটি জিনিষের উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তিনি একাই সারা বিশ্বকে পরিচালনার ব্যবস্থা করে চলেছেন।

এখানে এ প্রসঙ্গে কুরআনে করীম থেকে বেশি সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ এর পূর্বে সৃষ্টিকুলের রহস্যের ব্যাপারে কুরআনে করীমে উল্লেখিত বহু আয়াত পেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বর্ণনা করা যে, এ আয়াতগুলোর প্রসঙ্গে নতুন

ঘূর্ণিঝড় এসে এ বাগিচাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাবে, (অবশ্যইএ অবস্থা কেউ পছন্দ করবে না) এমনি করে আল্লাহ্পাক তোমাদের কাছে তার নিদের্শাবলী বর্ণনা করেছেন যাতে করে তোমরা চিন্তা কর।" (বাকারা--২৬৪-৬৬)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ «ط» فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ . (الرعد : ١٧)

"আল্লাহ্ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেক নদী-নালা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী তা প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছে।

তারপর বন্যা এলে পানির উপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠল। ঠিক এমনি করে যে সব সোনা-চাঁদি গলিয়ে অলংকারাদি অথবা থালাবাটি বানানো হয় তার উপরিভাগেও ফেনা ভেসে উঠে। এভাবেই আল্লাহ্পাক হক ও বাতিলের উদাহরণ পেশ করেন। যা বাজে এবং অকেজো জিনিষ তা ফেনার মত হয়ে বিলীন হয়ে যায় আর যা মানুষকে কল্যাণ দেয় তা জমে তলদেশে জড় হয়ে থাকে; এ ভাবে আল্লাহ্পাক বিভিন্ন জিনিষের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে থাকেন।"

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. (ابراهيم : ٢٤-٢٦)

"তোমরা কি দেখছো না যে আল্লাহ তায়ালা কালেমায়ে তৈয়বাকে কোন্ জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন? কালেমায়ে তৈয়বার উদাহরণ হচ্ছে, তা একটি পবিত্র গাছের মত যার শিকড় মজবুতভাবে যমীনের নীচে প্রোথিত রয়েছে এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, যা সব সময়ই তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফল দিয়ে চলেছে, আর আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য এ সব উদাহরণ দিচ্ছেন যাতে করে তার শিক্ষা গ্রহণ করে। আবার একটি আগাছার সাথে মিথ্যা কথার তুলনা করে বুঝাতে চাইছেন, আগাছার শিকড় মাটির উপরিভাগেই ছড়িয়ে থাকে, (মাটির গভীরে প্রোথিত হয় না) যার কারণে তার স্থায়িত্বও থাকে না।" (ইব্রাহীম-২৪-২৬)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰي كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ. وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ. لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ (بقرة : ٢٦٢-٢٦٦)

"হে ঈমানদারেরা তোমাদের দান খয়রাতগুলোকে এহ্সান প্রদর্শন করে এবং খুঁটা দিয়ে বরবাদ করে দিওনা। যারা এভাবে এহ্সান করে পরে মানুষকে কষ্ট দেয়, সে ঐ ব্যক্তিরই মত যে মানুষকে দেখানোর জন্যই তার মাল খরচ করে। আসলে সে আল্লাহ ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। আবার, তারও উদাহরণ ঐ পাথরের মত যার উপর মাটি রয়েছে তারপর প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা তার উপর লাগার কারণে সে পাথর ধুয়ে মুছে ছাফ হয়ে গেল এবং মাটির কিছু মাত্রও সে পাথর ধরে রাখতে পারল না। এ অবস্থা যার হবে সে যা কিছু ভাল কাজ করেছে তা ধরে রাখতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা কাফের জাতিকে হেদায়েত করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য খরচ করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই উঁচু স্থানের বাগিচার মত যেখানে বৃষ্টির পানি পৌঁছার কারণে দ্বিগুণ ফল এসেছে, বৃষ্টি না হলেও শিশির বিন্দুর দ্বারাতেও ফলের তেমন কমতি হয়নি। আর তোমরা যা কিছু করছো তা আল্লাহপাক দেখছেন। এমন অবস্থা কি তোমরা কেউ পছন্দ করবে যে তার একটি বাগিচা থাকবে, তার মধ্যে খেজুর ও আংগুর গাছ থাকবে এবং তার নীচুতে ও পার্শ্ব দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, সকল গাছ ফলে পরিপূর্ণ থাকবে। তার পর সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হবে কিন্তু ঐ বাগিচার যত্ন নেয়ার মত কয়েকজন অতি দুর্বল বংশধর ছাড়া আর কেউ থাকবে না, এরপর একটি

"অতএব, মানুষের চিন্তা করা দরকার কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে পয়দা করা হয়েছে ছিটকে পড়া পানি দিয়ে, যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে ; (সুতরাং) তিনি তাকে দ্বিতীয় বার পয়দা করতে সক্ষম। চিন্তা করা প্রয়োজন সেই সময়ের কথা যে দিন গোপন জিনিসগুলো প্রকাশ করে সেগুলোকে পরীক্ষা করা হবে সেদিন সেগুলোকে পরখ করা থেকে বাঁচানোর জন্য মানুষের নিজের কোন শক্তি থাকবে না ; আর তাকে সাহায্য করার মতও কেউ থাকবে না।" (তারেক-৫-১০)

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

-(الغاشية : ١٧ - ٢٠)

"ওরা কি উটগুলোর দিকে খেয়াল করে দেখে না, সেগুলোকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, দেখে না কি আকাশের দিকে কি ভাবে তাকে উঁচুতে তোলা হয়েছে, আর পাহাড়গুলোকে কিভাবে গেড়ে দেয়া হয়েছে, এবং পৃথিবীকে কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে তাও কি একটু চিন্তা করে না ?" (গাশিয়া-১৭-২০)

وَ اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ . -(التكوير : ١٧- ١٨)

'আর যে রাত বিদায় নেয় এবং যে সকালবেলা শ্বাসগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে তাদের কসম।' (তাকবীর ১৭-১৮)

প্রকৃতগত বিষয়াবলীর কার্যকারিতার অনুভূতিঃ

যাই হোক, এভাবে কুরআনে করীম সৃষ্টিকুল এবং মানবমণ্ডলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার অনুভূতি পয়দা করে দেয় যাতে করে মানুষের চিন্তার বাতায়ন পথ উন্মুক্ত থাকে, তারা সৃষ্টির বিশালত্ব সম্পর্কে অনুভব করে এবং যিনি এ মহাসৃষ্টিকে নিজ অসীম শক্তি -ক্ষমতা বলে পরিচালনা করে চলেছেন সেই মহান স্রষ্টার প্রতি অন্তর প্রাণ দিয়ে ঝুঁকে পড়। আর সেই মহাপ্রভুর প্রশংসায় আত্মনিয়োগ কর যার ক্ষমতার মধ্যে গোটা সৃষ্টিজগত চলছে।

এটুকুই নয়, বরং কুরআনে করীমে মানুষের চেতনা রাজ্যে প্রাকৃতিক জিনিষগুলোর কার্যকারীতা সম্পর্কে তীব্র চেতনা সৃষ্টি করে এবং এ ব্যাপারে অতি সুন্দর এবং নজীরবিহীন এমন এমন উদাহরণ পেশ করে যা মানুষের মানসিক, সামষ্টিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

"তিনি আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে পয়দা করেছেন। তিনি দিনের উপর রাতকে জড়িয়ে দিয়েছেন এবং রাতের উপর দিনকে জড়িয়ে দিয়েছেন। আর সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। দ্যাখো, তিনিই একামাত্র মহাশক্তিমান অথচ বড় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের একটি ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার থেকেই তার জোড়া (স্ত্রী) কে বানিয়ে দিয়েছেন। তারপর তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর আটটি জোড়া (নর ও মাদী)পাঠিয়েছেন। তোমাদেরকে তিনি তোমাদের মায়ের পেটের মধ্যে এমনভাবে সৃষ্টি করেন যে এক সৃষ্টির পরে আর এক সৃষ্টি আসে এবং একাজ তিনটি অন্ধকার যায়গায় সংঘটিত হয়। হ্যাঁ যিনি এভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তিনিই তোমাদের পালনকর্তা। বাদশাহী একমাত্র তাঁর, তিনি ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই। এর পরও তোমাদেরকে কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে ?" (যুমার৫-৬)

كَلاَّ وَالْقَمَرِ . وَاللَّيْلِ اِذَا اَدْبَرَ . وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ . (المدثر :٣٢ـ ٣٤)

"তোমরা যা ভাবছ তা কিছুতেই নয়, চাঁদের কসম, তার পিছু পিছু যে রাত আসে তারও কসম এবং প্রভাতবেলা, যা ধরণীকে আলোকিত করে, তারও কসম।" (মুদাচ্ছের-৩২-৩৪)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ. -(عبس:٢٤ـ٣٢)

"অতঃপর মানুষের উচিত সে যেন তার খাদ্য খাবার ব্যাপারে চিন্তা করে কেমন করে তা তাদের নিকট পৌঁছানো হয়। আমি মহান আল্লাহ, প্রয়োজন মত পানি বর্ষণ করেছি, তারপর এক নির্দিষ্ট আন্দাজমত যমীন ফাটিয়ে দিয়ে তার মধ্যে পয়দা করেছি খাদ্য-শস্য, আংগুর, তরিতরকারী, যয়তুন ফল, খেজুর এবং ঘন সন্নিবেশিত বাগ-বাগিচা, রকম বেরকমের ফলমূল তোমাদের এবং তোমাদের জীবজন্তুর জন্য ঘাস, পাতা ও জীবন ধারণের বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে।"

(আবাসা-২৪-৩২)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ . اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ . -(الطارق : ٥ - ١٠)

"তাদের জন্য মৃত যমীনও একটি নিদর্শন যাকে আমি মহান আল্লাহ জিন্দা করেছি এবং তার থেকে খাদ্য-শস্য বের করেছি। যার থেকে তারা খায়। সেখানে খেজুর ও আংগুর বাগিচাসমূহ বানিয়ে রেখেছি এবং তার মধ্যে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, যাতে করে তার ফল তারা খেতে পারে। আর এসব তার হাতের কর্মফল তো নয় এর জন্য কি তারা শুকুরগুজারি করবে না ? মহাপবিত্র সেই সত্তা যিনি মাটি থেকে উৎপাদিত শাকসব্জি-তরুলতা ও মানুষের নিজেদের সবার মধ্য থেকে জোড়াগুলো পয়দা করেছেন আর এমন অনেক জিনিষ পয়দা করেছেন যা ওরা জানে না। তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত, যার উপর থেকে আমি (মহান আল্লাহ) দিনকে সরিয়ে দেই, ফলে আঁধার ছেয়ে যায়। সূর্য তার (জন্য) নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে, তিনিই তো মহাশক্তিমান, যিনি সবকিছু জানেন। সেই চিন্তাভাবনার অনুভূতি পয়দা করে দেয় যাতে করে মানুষের চিন্তার বাতায়ন পথ উন্মুক্ত থাকে, তারা সৃষ্টির বিশালত্ব সম্পর্কে অনুভব করে এবং যিনি এ মহাসৃষ্টিকে নিজ অসীম ক্ষমতা বলে পরিচালনা করে চলেছেন সেই মহান স্রষ্টার প্রতি অন্তর প্রাণ দিয়ে ঝুকে পড়ে, আর সেই প্রভুর প্রশংসায় আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সব ব্যবস্থা। আবার চাঁদকে ধরে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং রাতও তার নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া দিনের আগে এসে যাবে এও সম্ভব নয়, প্রত্যেকেই তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও উল্লেখযোগ্য যে তাদের বংশধরদেরকে আমি (মহান আল্লাহ্) একটি মালে ভর্তি জাহাজে তুলে দিয়েছিলাম। আর তার জন্য এ ধরনের অনেক যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। আমি (মহান আল্লাহ) চাইলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদেরকে কেউ সাহায্য করতে বা তাদেরকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। শুধুমাত্র আমার রহমতের কারণে তারা কিনারায় পৌছে যায় এবং যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে জীবন সামগ্রী ভোগ করার সুযোগ দিয়েছি সে সময় পর্যন্ত তারা তা গ্রহণ করে।" (ইয়াসিন-৩৩-৪৫)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ. خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ. (الزمر : ٥ -٦)

টিকে আছে, তারপর যখনই তিনি তোমাদেরকে (মরে যাওয়ার পর) ডাক দেবেন তখন তোমরা মাটি থেকে বেরিয়ে আসবে।" (রূম-১৯-২৫)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ. اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا «ط» اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ (فاطر : ٢٧-٢٨)

"তোমরা কি দেখ না যে আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার থেকে (আমি মহান আল্লাহ) বিভিন্ন রং এর ফলমূল বের করেছি। আর পাহাড় পর্বতগুলোকেও সাদা লাল এবং গভীর কালো রেখাযুক্ত বানিয়েছি। মানুষের মধ্যে, জীব-জন্তুর মধ্যে এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যেও এমনি করে বিভিন্ন বর্ণ দান করেছি। অবশ্য অবশ্যই একথা সত্য যে, আল্লাহ তায়ালাকে তার বান্দাহদের মধ্যকার আলেমরাই বেশি ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক মহাশক্তিমান, সংগে সংগে মাফ করনেওয়ালাও বটে।" (ফাতের-২৭-২৮)

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ «ط» اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ. وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا «ط» ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ «ط» وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ. وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ «ط» وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ. وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ . اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ. (يس : ٣٣ ـ ٤٤)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ . وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا
اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ. وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً «ط» اِنَّ فِي ذٰلِكَ
لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ. وَمِنْ اٰيَاتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ
اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ «ط» اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْعٰلَمِيْنَ. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ «ط» اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا «ط» اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا
دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ. (الروم: ١٩-٢٥)

"তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে, আর শুকিয়ে মরে যাওয়ার পর যমীনকে পুনরায় জিন্দা করেন, ঠিক এভাবেই তোমাদেরকেও (কবর থেকে) বের করা হবে আর তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার পরেই না তোমরা মানুষ হিসাবে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছ। তার নির্দেশগুলোর মধ্যে আর একটি হচ্ছে, তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের (স্ত্রীস্বরূপ) জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তাদের কাছে গিয়ে তোমরা শান্তি লাভ করতে পার আর তোমাদের মধ্যে মুহাব্বত ও মায়া-মমতা পয়দা করেছেন, নিশ্চই এসব কিছুর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে আসমান যমীন এর সৃষ্টিও বটে, এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা (খেয়াল করে দ্যাখ), এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাত ও দিনের নিদ্রা ও তার রহমত পাওয়ার জন্য তোমাদের (নিরন্তর) চেষ্টা সাধনা, অবশ্যই এর মধ্যে যারা (অন্তরের কান দিয়ে) শুনে, তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। তার নিদর্শগুলোর মধ্যে এটাও একটি যে তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুত দেখান এমন অবস্থায় যে তোমরা ভীত-বিহ্বলচিত্তে এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখতে থাক। তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করান, যার ফলে পৃথিবীর মাটি মৃত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জিন্দা হয়ে উঠে। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই সকল লোকের জন্য যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। আবার তার নিদর্শগুলোর মধ্যে এটাও একটি যে আসমান যমীন তার হুকুমে

যুদ্ধের সময় তোমরা নিজেদের দেহকে হেফাযত কর। এ ভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তার নেয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেছেন যাতে করে তোমরা শুকুরগুজারী কর।" (আল নাহল-৭১-৭৮)

• اَفَلاَ يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِيْ الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا - (الانبيا : ٤٤)

"কিন্তু ওরা কি দেখছে না, আমি (মহান আল্লাহ) এ যমীন কে বিভিন্ন দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি?" (আম্বিয়া-৪৪)

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ اِلٰى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَّ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ.

- (الحج : ٥)

"হে জনগণ, যদি মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠার ব্যাপারে কোন সন্দেহের মধ্যে তোমরা পতিত থেকে থাক তাহলে জেনে নাও নিশ্চই আমি মহান আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তার পর শুক্রবিন্দু থেকে, এর পর রক্তের পিণ্ড থেকে এর পর আকৃতিসম্পন্ন ও আকৃতিবিহীন মাংসপিন্ড থেকে, (এসব কথা) আমি এ জন্য তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি যাতে করে তোমাদেরকে আমি মূল সৃষ্টি সম্পর্কে জানিয়ে দেই এবং আমি মহান আল্লাহ (সে শুক্রবিন্দুকে) যখন ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের গর্ভে রেখে দেই, তার পর তোমাদেরকে আমি একটি বাচ্চা আকারে বের করে নিয়ে আসি। (তার পর তোমাদেরকে প্রতিপালন করেতে থাকি) যাতে করে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং কাউকে বার্ধক্যের এমন দূর্বল অবস্থা পর্যন্ত জীবিত রাখা হয় সে জ্ঞান লাভ করার পর সে পুনরায় জ্ঞানহারা হয়ে যায়। আর তোমরা দেখছ যে যমীন শুকিয়ে পড়ে আছে তার উপর আমি পানি বর্ষণ করেছি যার ফলে যমীন সজীব হয়ে উঠেছে, সতেজ হয়েছে এবং সবরকমের মনোরম শাকসব্জি ও তরুলতা উৎপন্ন শুরু করেছে।" (হজ্জ-৫)

বলেছেনঃ পাহাড়-পর্বতে, গাছের উপর এবং উঁচুস্থানে মৌচাক নির্মাণ কর, তারপর সকল প্রকার ফল থেকে মধু খেয়ে পেটে বহন করে নিয়ে এসো এবং তোমার প্রতিপালকের (দেখানো) পথে ধীর গতিতে চল। এভাবে, তার পেট থেকে (মধু নামক) বিভিন্ন রং এর শরবত বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে মানব জাতির জন্য রয়েছে রোগ নিরাময়ের ঔষধ। চিন্তা করে যে জাতি তার জন্য এর মধ্যে রয়েছে অবশ্যই শিক্ষা।" (আন নাহাল-৬৫-৬৯)

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ جَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَ الاَبْصَارَ وَ الاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُوْنَ. اَلَمْ يَرَوْ اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ «ط» اِنَّ فِى ذَالِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ. وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُم مِّن جُلُوْدِ الاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُم «ط» وَمِن اَصْوَافِهَاوَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ. وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ «ط» كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ. -(النحل : ٧١ - ٧٨)

"আল্লাহপাক তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটের মধ্যে থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। আর তোমাদেরকে দান করেছেন কান, চোখ ও অন্তর যাতে করে তোমরা শুকুরগুজারী কর। ওরা কি আকাশের শূন্যতায় নিয়ন্ত্রিত পাখীর দিকে তাকায় না, তাদেরকে সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই ঐ ব্যবস্থার মধ্যে ঐ জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বিশ্বাস করে (আল্লাহকে) আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাড়ীকে শান্তির নীড় বানিয়েছেন এবং গৃহপালিত পশুর চামড়া দিয়ে তোমাদের জন্য এমন ঘর বানিয়ে দিয়েছেন যা সফরের সময় যেমন হালকা (ও বহনযোগ্য), তেমন স্থায়ীভাবে তোমাদের ব্যবহার্য বহু জিনিষ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন। আবার আল্লাহ তায়ালা, তার সৃষ্ট বহু জিনিষ থেকে তোমাদের ছায়াদার নীড়ের ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড় খোদাই করে তার মধ্যে তোমাদের ঘর বানানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোষাক দান করেছেন যা তোমাদেরকে গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে বাঁচায় এবং এমন পোষাকও দিয়েছেন যা দ্বারা

রহমত তালাশ করতে পার এবং যাতে শুকুরগুজারি করতে পারে। তিনি পৃথিবীর পাহাড়সমূহকে খুটা হিসাবে গড়ে দিয়েছেন যাতে যমীন তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে। তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং বিভিন্ন রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা গন্তব্যস্থানে পৌছুতে পার। তিনি পৃথিবীর বুকে এমন নিদর্শন রেখে দিয়েছেন যেগুলো দেখে তোমরা পথের সন্ধান করতে পার। তারকারাজীর সাহায্যেও তোমরা পথ খুঁজে নিতে পার। তাহলে তোমরাই হিসেব করে বল, যিনি পয়দা করেন এবং সৃজনী ক্ষমতা যার নেই এ দু'জন কি সমান হতে পারে? তোমরা কি বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না ? (আল নাহাল-১০-১৭)

وَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا «ط» اِنَّ فِى ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ . وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِمَّا فِى بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ. وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ط اِنَّ فِى ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ . ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا «ط» يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ «ط» اِنَّ فِى ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. (النحل : ٦٥ - ٦٩)

"আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন যে যমীন শুকিয়ে মরে গিয়েছে তাকে এ বৃষ্টি দ্বারা হঠাৎ করে তার মধ্যে জীবন দান করেছেন। অবশ্য এর মধ্যে যারা খেয়াল করে শোনে, তাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। তোমাদের জন্য গৃহপালিত জীব-জন্তুর মধ্যেও এক শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে খাঁটি দুধ নামক এক বস্তু তোমাদেরকে আমি (মহান আল্লাহ) পান করাই, এ দুধ যারা পান করে তারা বড় মনোরম পানীয় হিসাবে পান করে। এমনি করে খেজুর ও আংগুর-এর রস থেকেও এমন মনোরম পানীয় দিয়েছেন, যার থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য বানাও আবার পাক পবিত্র শরবত হিসাবেও ব্যবহার কর। অবশ্যই এর মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিশ্চয়ই এক নিদর্শন রয়েছে, যে নিজ বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তোমার রব গোপনে নির্দেশ (অহী) পাঠিয়েছেন মৌমাছির কাছে,

নিয়ন্ত্রণ করেছেন। শোন, সৃষ্টিলোকের মালিক একমাত্র তিনিই আর (এ কারণেই)নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই। বড় বরকতওয়ালা মহান আল্লাহপাক যিনি সারা জাহানের মালিক। (আল আরাফ-৫৪)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ «ط» إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ «ط» إِنَّ فِي ذَالِكَ
لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ
لَا يَخْلُقُ «ط» أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. -(النحل: ١٠-١٧)

"তিনিই তো তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন যা থেকে তোমরা পান কর এবং তোমাদের জীব-জন্তুকেও পান করাও, এ পানি দিয়েই ফসল উৎপন্ন করা হয়, যায়তুন, খেজুর আংগুর এবং সব রকম ফলমূলও এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন হয়। নিশ্চয়ই যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে আল্লাহর বহু নিদর্শন রয়েছে।

তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজিও তার হুকুমেই নিয়ন্ত্রিত। যে জাতি বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য অবশ্যই ঐসকল জিনিষের মধ্যে (আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা বুঝার জন্য) বহু নিদর্শন রয়েছে। আর তোমাদের জন্য যা কিছু তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তার রং বিভিন্ন। নিশ্চয়ই ঐ জাতির জন্য ঐ গুলোতে বহু নিদর্শন রয়েছে যে জাতি শিক্ষা গ্রহণ করে। তিনি তো সমুদ্রকে (তোমাদের জন্য) নিয়ন্ত্রিত করেছেন যাতে করে তোমরা তার থেকে পাওয়া টাটকা গোশত খেতে পার এবং বের করতে পার এমন অলংকার যা তোমরা পরিধান করতে পার। আর তোমরা দেখেছ সাগরের বুক চিরে জাহাজগুলো চলাচল করে। এ সব কিছু এ জন্যে যাতে করে তোমরা আল্লাহর

একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি মুর্দা জিনিষ থেকে জিন্দা জিনিষ বের করেন এবং জিন্দা থেকে মুর্দাকে আনেন। হাঁ, এই কাজ যিনি করেন তিনিই তো আল্লাহ। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছ! রাতের চাদর চিরে তার মাঝ থেকে তিনি সকালকে বের করেন এবং রাতকে প্রশান্তিদাতা হিসাবে বানিয়েছেন। তিনিই সূর্য ও চাঁদের উদয় ও অস্তের হিসাব ঠিক করে দিয়েছেন। এ সব কিছু মহাশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারিত এক পরিমাপমত সৃষ্টি। তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজী বানিয়েছেন যাতে করে সেগুলো দ্বারা মরুপ্রান্তরে ও মহাসমুদ্রে পথ নিরূপণ করতে পার। এমনি করে, আমি (মহান আল্লাহ) আমার নিদর্শনগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি সেই জনপদের জন্য যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তিনিই তো তোমাদেরকে এক ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর প্রত্যেকের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন তার বসবাসের জায়গা এবং আরও নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার সমাহিত হওয়ার স্থান। যারা নিজেদের বুঝশক্তিকে কাজে লাগায় সেই সকল লোকের জন্য আমি মহান আল্লাহ, এ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন, তারপর বের করেছেন তার থেকে সকল গাছপালা চারা, যা দ্বারা পরে বানিয়েছেন শ্যামল তরুলতা এবং এ তরুলতা থেকে বের করেছেন পরতে পরতে সাজানো দানার শীর্ষসমূহ। আরও বের করেছেন খেজুর গাছের মধ্য থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুরের কাদিসমূহ যা খেজুরের ভারে মাটির দিকে নুয়ে পড়ে এবং আংগুর, যায়তুন ও ডালিম-বেদনার বাগ-বাগিচা সাজিয়ে দিয়েছেন। যার ফল কখনো তো একটির সাথে আরেকটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। আবার কখনো এর স্বাদ-গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। এসকল ফলের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দ্যাখো দেখবে ফলের গুটি যখন আসে এবং যখন পাকে এ দু অবস্থার মধ্যটাকে চিনবার জন্য কি চমৎকার নিদর্শন রয়েছে।" (আল-আনয়াম-৯৫-৯৯)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ . اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ط تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ . (الاعراف : ٥٤)-

"প্রকৃতপক্ষে তিনিই তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তার পর তিনি নিজ ক্ষমতার আসনে সমাসীন হয়েছেন (এসব কিছুকে নিজ ক্ষমতায় পরিচালনার জন্য), তিনি রাত্রিকে দিন দ্বারা ঢেকে দেন যা দ্রুত গতিতে পেছনে চলে আসে, তিনিই সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজিকে ক্ষমতা বলেই

বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ
الَّتِى تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّ تَصْرِيفِ
الرِّيَاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ
- (البقرة : ١٦٤)

"অবশ্যই একথা সত্য যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের নিরন্তর আনাগোনার মধ্যে, যে সমুদ্রগামী জাহাজ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার দেশ থেকে দেশান্তরে বহন করে নিয়ে যায়, আল্লাহ্ তায়ালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, মরে (শুকিয়ে) যাওয়া যমীনকে পুনরায় জিন্দা (সজীব) করে তোলেন এবং সেই যমীনের মধ্যেই সকল জীব-জন্তুর বিস্তর খাদ্যসম্ভার দান করেন এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালা -এসব কিছুর মধ্যে অবশ্যই বুদ্ধিমান জাতির জন্য আল্লাহকে চিনবার মত বহু নিদর্শন রয়েছে। -(আল-বাকারা-১৬৪)

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَىِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ . فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَ جَعَلَ الَّيْلَ
سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَهُوَ
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا فِى ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ «ط» قَدْ فَصَّلْنَا
الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. وَ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَّ مُسْتَوْدَعٌ «ط» قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ . وَ هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ
مِّنْ اَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ «ط» اُنْظُرُوْا
اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ . اِنَّ فِى ذٰلِكُمْ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .
- (الانعام : ٩٥ - ٩٩)

"দানা ও আঠির খোলকে ফাটিয়ে দিয়ে তার থেকে অংকুর উদ্‌গমকারী

কপাটগুলো বন্ধ হয়ে যায় ও চিন্তা শক্তিতেও মরচে পড়ে যায়, এবং তার চেতনায় কোন সজীবতা থাকে না। এমনকি তার অনুভূতি শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন তার মন-মানসিকতাকে বিস্ময়কর সৃষ্টিলোকের দিকে ফিরিয়ে দিলে তার অনুভূতি ও চেতনাকে জাগিয়ে তুললে এবং তার চিন্তাধারার মরচে পরিষ্কার করতে পারলেই তার মধ্যে সজীবতা, চাঞ্চল্য এবং তার আত্মার মধ্যে সেই রকম অবস্থা পয়দা হতে পারে যা একজন শৃংখলমুক্ত ব্যক্তির হয়ে থাকে।

আত্মার সূক্ষ্ম অনুভূতি

শারীরিক অনুভূতি থেকে আত্মার অনুভূতি আরও বেশী সূক্ষ্ম, তীব্র, প্রভাবপূর্ণ বিস্ময়কর এবং বিস্ময় সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। সে সময় মানুষ প্রত্যেকটি অনুভূতিকে নতুন করে পায়, প্রতিটি নতুন মনে হয়। এভাবে মানুষ নবতর সজীবতা লাভ করে এবং এ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের জীবনে যে প্রশস্ততা আসে তার ফলে সে এক স্থায়ী শান্তি সাগরে অবগাহন করে।

যদি মানুষ এ শান্তির অনুভূতিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হতো যেমন সে সূচনাতে অনুভব করেছিল এবং মৃত্যুকে জয় করতে পারত তাহলে সে কখনও বৃদ্ধ হতো না, শারীরিক দুর্বলতাও কখনও অনুভব করতো না ; কিন্তু মানুষের এটা দায়িত্বের মধ্যে নেই, বরং নিশিদিন জীবন সংগ্রাম, সমস্যার সংঘাত এবং আর্থিক সংকট তাকে ধীরে ধীরে দুর্বলতা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ সময়, কুরআনে করীম যে চমৎকার জিনিষ মানুষকে দান করে তা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক-প্রবণতা ও অভ্যাসজনিত দুর্বলতা থেকে তাকে মুক্ত করে তার অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ ও সম্মোহনী ক্ষমতা দ্বারা তার তীব্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে, তার চেতনাকে উজ্জীবিত করে এবং এক নতুন চিন্তাশক্তি দান করে। এই শক্তি-সামর্থ্যের এক অত্যুজ্জ্বল অনুভূতির বলে বলীয়ান হয়ে সে যেন নতুন জীবন লাভ করে। কুরআনে করীম অধ্যয়ন করার কারণে মানুষ এভাবে নূতন জীবন লাভ করে এবং নিত্যনূতন এমন আনন্দ পায় যা তাকে সকল দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করে। বস্তুত কুরআনে কারীমই এমন এক কিতাব যা পাঠ করে মানুষ কখনও ক্লান্তি বোধ করেনা, যতবার পড়ে ততবারই সে নূতন জ্ঞান পেতে থাকে এবং আরও গভীরভাবে তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। কুরআন মজীদের মনমোহনী আয়াতসমূহের ভাষায় চূড়ান্ত ঔজস্বীনতা, বলিষ্ঠ অথচ বড় মধুময় বর্ণনা-ভংগী এবং মুগ্ধকর বিবরণমালা মানুষকে জ্ঞানের এক নূতন জগতে নিয়ে যায় এবং চিন্তা ও বুঝ-শক্তির মধ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে।

বারবার এ সকল নিদর্শন ও আল্লাহর ক্ষমতার চিহ্নগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরে এবং সৃষ্টিলোকের সর্বত্র বিরাজমান নিদর্শনগুলোর প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করে স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পয়দা করে। কুরআনে করীম বড় সুন্দর ও আকর্ষণীয় বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে এবং অতি হৃদয়গ্রাহী শব্দ ও মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দ্বারা মানুষের বিবেক, বুদ্ধি এবং অনুভূতিকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছে। যার ফলে সে তার অভ্যাসগত দুর্বলতা ও আবেগমুগ্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পায়।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রতিবেশী দ্বারা প্রভাবিত এবং অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার স্রষ্টা প্রদত্ত যে প্রবণতা বিদ্যমান তা মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও চরম গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ, মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক যে প্রথমবারে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা অনুভব করে, যে স্থানে বাস করে এবং যে সব জিনিষ ব্যবহার করে সেগুলোর গভীর ছাপ তার মনের উপর পড়ে, পুনরায় ঐ জিনিষগুলোর সংস্পর্শে এলে সেগুলোর সাথে তার পরিচয় গভীরতর হয়। মানুষের মধ্যে কোন জিনিষের ব্যাপারে অভ্যস্ত যে কোন জিনিসের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্যতা পয়দা হয়ে গেলে সারা জীবন সে একই প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করে, যেমন বক্তা জিন্দেগীভর বক্তৃতা করতে থাকে, লেখক সারা জীবন লেখার অনুশীলন করতে থাকে এবং তার অংগ প্রত্যংগের উপর এ অভ্যস্ত কাজগুলোর এমন প্রভাব পড়ে যে সেগুলো বাদে অন্য কোন কাজের সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

কোন কাজের সাথে মানুষের মন-মেজাজ খাপ খেয়ে গেলে ঐ কাজ অভ্যস্ত হয়ে উঠাই তার জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। আর এটা মানুষের জন্য জরুরীও বটে। কিন্তু কোন কোন সময়ে এমনও হয় যে, এ বৈশিষ্ট্যটি মানুষ হারিয়ে ফেলে এবং নিজ অভ্যস্ত কাজ থেকে দূরে সরে যায়, তার দৃষ্টি অন্য কিছুর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তার চিন্তাধারাও পরির্বতন হয়ে যায়। আর এভাবে তার এ বৈশিষ্ট্যটি মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য মানুষের মনকে স্বপ্নের জগত থেকে জাগিয়ে তুলে নতুন করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং তার মনের বন্ধ দরজাগুলো খুলে দেয়া দরকার যাতে সে মনের গভীরে প্রবেশ করে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ঐ ব্যক্তির অবস্থা তুলে ধরা যায় সে কোন দুর্গন্ধময় স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে আবদ্ধ থাকার পর দরজা জানালা খুলে দেয়া হলে তাজা ও সুশীতল বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার দেহমন সুস্থ ও সজীব হয়ে উঠে এবং সে যেন নতুন জীবন লাভ করে। ঠিক এমনি করেই মানুষ যখন কোন কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তার মন-মানসিকতা সর্বপ্রকার নতুনত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তার মনের

অভ্যস্ত হয়ে আছে। এজন্য এ সকল অত্যাশ্চর্য জিনিসগুলো তাদের নিকট আর তেমন বিস্ময়কর বলে মনে হয় না এবং এগুলো সম্পর্কে তেমন চিন্তা -ভাবনাও করে না। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যদি একটু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি দিয়ে এগুলো দেখার চেষ্টা করত তাহলে এসকল বস্তুর সৃষ্টি নৈপুণ্য মানুষকে হয়রান পেরেশান করে ফেলত, অথচ মানুষ প্রতিনিয়ত সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে এগুলো দেখছে যার জন্য এগুলোর কোন আবেদন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে না।

দিন ও রাতের আবর্তন, রাতের উপর দিনের প্রাধান্য বিস্তার এবং রাত ও দিনের আনা-গোনার মধ্যে কম-বেশি হওয়া এসব কিছুই কি বৈচিত্র্যে ভরা নয়! প্রতি সকালে সূর্য উদয় এবং প্রত্যেক দিনশেষে রাতের আগমনে সূর্যের বিদায় গ্রহণ এগুলো এমন এক নিয়মে বাধা যার হেরফের কোনদিন হয়নি। সূর্য কখনো উঠতে আলস্য করেনি আবার ডুবতে গিয়েও কখনো বিরত থাকেনি। এগুলো কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে হচ্ছে। রাতের আধারে হীরক খণ্ডের মত তারকারাজি মিট-মিট করে জ্বলতে থাকা, নিশিরাতে নভোচারীদের উর্দ্ধলোকে ফিসফিসিয়ে মত বিনিময়, সরু একটি কাস্তের ন্যায় নূতন চাঁদের উদয়, যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে পুনরায় হ্রাস পেতে পেতে পূর্বের সরু অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। পৃথিবীর বুক চিরে উদ্ধত চারার আগমন এবং সুন্দর মনোলোভা ও সুরভিময় ফুলকলির স্নিগ্ধ মুচকি হাসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র রং এর উড়ন্ত পক্ষীকুল এবং নাম না জানা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ পোকামাকড়, জীব-জন্তুর নবজাত শাবক এবং ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে দানা দানকারী ও দুগ্ধ-দানকারী তাদের মায়েরা, মৃতসম মাটি থেকে উৎসারিত জীবনের ঝর্ণাধারা, বিচিত্র সৃষ্টির পরিচালনার ব্যবস্থা, আশ্চর্যজনক এসব কিছুর এন্তেজাম, সুনিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে এ রহস্যময় ধরণীর পরিচালনা, যার মধ্যে কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই, নেই কোন যায়গায় কোন কমতি ! কোটি কোটি তারকারাজির নিজ-নিজ কক্ষপথে পরিক্রমা, এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হয় না, মহাকালের উত্থান-পতন, সময়ের রহস্যভরা ইতিবৃত্ত, এসকল রহস্যাবৃত সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত অসহায় মানুষ। এতদসত্ত্বেও মানুষের সবার উপর কতৃত্ব এবং জাকজমক ও জৌলুসের সমারোহ, এসমস্ত রহস্যবৃত্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ নিয়েই এ বিচিত্র রহস্য। তার শারীরিক, চৈন্তিক ও আত্মিক কার্যকালাপের মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য, তার যোগ্যতা ও শক্তিনিচয়ের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক-এ সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয়ের নিদর্শনমালা নয় কি ? এসকল সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান এসব কিছু স্রষ্টার মহাবিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ। কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে বসবাসরত মানুষ এ রহস্যমালা দেখতে দেখতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে হয়েছে যে, তার কাছে এগুলোর কোন নতুনত্ব নেই। আর হয়তবা এ কারণেই এ সকল বস্তুনিচয়ের সামনে দিয়ে সে চিন্তাহীনভাবে অতিক্রম করে। আত্মার প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে ইসলাম

নিজেদের বস্তুগত ও পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য জীবজন্তুর মতই কর্মতৎপর থাক।"

ইসলাম একথা কখনই বলে না যেহেতু ইসলাম স্বভাব-প্রকৃতির ধর্ম এবং বাস্তব ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। বরং ইসলাম তো মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত শক্তিসমূহকে স্বীকার করে, সেগুলোর উৎকর্ষ সাধণ করে, তাদেরকে উৎসাহিত করে এবং সেগুলোর প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আত্মাকেই সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

ইসলাম মানুষের সমস্ত দুর্বলতাগুলোকে সামনে রেখে তার মধ্যে আত্মার আলোকে প্রজ্জ্বলিত রাখার চেষ্টা করে। কারণ, সামনের উচ্চ শিখরে আরোহণ করার এবং মানুষকে যে সকল শক্তি অধঃপতিত করে সেগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার এটাই একমাত্র উপায়। অর্থাৎ মানুষের আত্মীয়তা ও সম্পর্ক আল্লাহপাকের সংগে কায়েম করতে হবে এবং এর জন্য বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করতে হবে।

এক দিকে ইসলাম মানুষের অন্তরে এ অনুভূতি পয়দা করে যে, সমগ্র সৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা বিদ্যমান। অপরদিকে তার অন্তরে একথাও জাগ্রত হয় যে, আল্লাহপাক সদা-সর্বদা তাকে দেখা-শুনা করছেন এবং তার মনের গোপন কথা সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন। এমনকি অন্তরে যে চিন্তার উদ্রেক করে তাও তিনি জানেন।

অন্য আর একদিকে ইসলাম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং মুহাব্বত পয়দা করে এবং তার মধ্যে এই ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে যে, তার প্রত্যেকটি চিন্তা-অনুভূতি, কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি নিরীক্ষণ করছেন।

অতঃপর ইসলাম মানুষের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত পয়দা করার সাথে সাথে এ শিক্ষা দেয় যেন তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সংঘটিত।

এর পর ইসলাম মানুষের সকল সংকট ও সচ্ছলতার নিশ্চয়তা দান করে যার কারণে সে মানসিক শক্তি পায় এবং তার মধ্যে আল্লাহপাকের নির্দেশ মানা ও তার সন্তোষ পাওয়ার অভিলাষ জেগে উঠে। এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তার বান্দাহর মধ্যে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বিশ্ব-জগত আল্লাহ পাকের মহাক্ষমতার নিদর্শন

বিশ্ব-জগতের সব কিছুই আল্লাহপাকের মহান অস্তিত্বের নিদর্শন, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সুবিশাল ক্ষমতা প্রকাশ পায়, যা অবলোকন করে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু সদা-সর্বদা এ সকল রহস্যপূর্ণ বস্তু মানুষের সামনে ভেসে বেড়ায় এবং এগুলোর নিকট সংস্পর্শের কারণে এগুলোর ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি

আগত নতুন দিনের সূর্য তার চেতনার জগৎকে জাগিয়ে দেয়, আবার কখনো পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদও তার জন্য আশ্চর্যজনক হয়ে ফুটে উঠে, তার বুদ্ধিবৃত্তির জন্য বিস্মিত হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে এবং তার আত্মাকে মূল্যবান নিদ্রা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। আর কখনো বা বিস্তীর্ণ সৃষ্টিজগতের রহস্য, তার ব্যবস্থাপনা এবং এ সকলের সৃষ্টি-নৈপুন্য তার আত্মাকে গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয়। এসকল মুহূর্ত আকস্মিকভাবে আসে এবং হঠাৎ করে চলে যায়।

কিন্তু আত্মার উন্নতির এই মুহূর্তগুলো হঠাৎ করে আলোর ঝলকের মত আসবে এবং পরবর্তী মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাবে ইসলাম এটা চায়না, বরং ইসলাম এমন প্রশিক্ষণ দান করে যাতে আত্মার অগ্রগতিতে মানুষের মানসিক জগতের মধ্যে এমন নূরের প্লাবন ঘটে যা তার বস্তুবাদী সত্তাকে উদ্ভাসিত করে তোলে এবং সে নূরের ঝলক তার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। রূহানী আলোর এই দ্বীপশিখা অনিবার্য জ্বলতে থাকুক এবং মানব জীবনকে এর আলো দ্বারা আলোকিত করে তুলুক ইসলাম এটাই চায়। আর মানুষ যখন এই স্থায়ি বাতি হাতে পেয়ে যায় তখন সে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। মানুষকে ইসলাম এ পথের সন্ধান দেয়ার সাথে সাথে তার কছে আল্লাহপাকের নির্দেশনার এ দিকটিও তুলে ধরে। মহান আল্লাহ মানুষকে কোন অসম্ভব কাজের দায়িত্বভার দিয়ে তাকে কষ্ট দেননা—এটা তার বিশেষ রহমত বৈকি। আল্লাহপাক একথাও জানেন যে আত্মা সদা-সর্বদা এবং সার্বক্ষণিকভাবে বস্তুগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং শারীরিক চাহিদার যে সংকট রয়েছে তার থেকেও পুরাপুরি স্বাধীন হতে পারে না। কারণ, মানুষ মাটি দ্বারা তৈরি হওয়ার ফলে যেমন এক দুর্বলতা রয়েছে, তেমনি তার প্রবৃত্তির প্রবল চাহিদার শক্তিও কম নয়। আর এর সংগে রয়েছে বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তাই আল্লাহ বলেনঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ – (التغابن:١٦) "সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর"

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا – (البقرة : ٢٦٨)

"আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব বহন করার বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (বাকারা-২৮৬)

তবে, আধুনিক কালের ঐ সকল নতুন বস্তুবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত ইসলাম মানুষকে কোন নির্দেশনা দেয় না, যারা নিজেদের চিন্তাধারাকে বাস্তবভিত্তিক বলে দাবী করে, তারা বলেঃ "হে জনগণ, তোমরা কিছুতেই আত্মিক অগ্রগতি লাভ করতে পারবে না। যেহেতু তোমাদের মধ্যে বস্তুগত শক্তি, প্রবৃত্তির প্রবল তাড়না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন আকর্ষণের তীব্রতা রয়েছে। সুতরাং তোমরা

মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে এবং সমগ্র জীবনের উপর এই আত্মার প্রভাবই সর্বাধিক। সৃষ্টিকর্তার সংগেও এই আত্মার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইসলাম যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম এবং স্বভাব প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্যশীল একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, এজন্য এ ব্যবস্থা আত্মার সঠিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ মানুষের আত্মিক-শক্তিই সত্যিকারভাবে সব থেকে শক্তিশালী এবং সকল সৃষ্টি-রহস্যের বাস্তব অস্তিত্বের সংগে সব থেকে বেশী সম্পর্কশীল। মানুষের শারীরিক শক্তি তার বস্তুগত অস্তিত্ব ও অনুভূতির জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং যদিও বুদ্ধির শক্তি শারীরিক শক্তির তুলনায় বেশী মুক্তপুচ্ছ, কিন্তু তবুও একথা মানতে হবে যে, এও স্থান ও কালের সীমার মধ্যেই অবস্থিত এবং ধ্বংসশীল।

একমাত্র আত্মিক শক্তিই এমন এক শক্তি যা এ সকল সীমা ও সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্থান-কাল, শুরু ও শেষ এর বন্ধন থেকে মুক্ত। এর সম্পর্ক যেমন অনুভূতির জগতের সংগে, তেমনি নিবিড় সম্পর্ক এর বুদ্ধিবৃত্তির জগতের সংগে এবং স্বয়ং এর স্রষ্টা অনাদি ও অনন্ত আল্লাহপাকের সংগে। এ সম্পর্ক তেমনই যেমন স্থান-কালের উর্দ্ধে। কালের সকল কিছুর সংগে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। উর্দ্ধলোক এবং সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সংগে আত্মা কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে সে জ্ঞান যদিও আমাদের নেই কিন্তু আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে অবশ্যই আমরা কিছুনা কিছু অনুভব করতে পারি। কারণ আত্মা এমন এক জিনিস যা এর গতি বিস্তার লাভ করে এবং সৃষ্টিকুলের সকল জীবন্ত জিনিষের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে। আমরা সেই অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য মুহূর্তকে অনুভব করতে পারি যা গোটা মানবকুলকে কাঁপিয়ে তুলে এবং যার কারণে মানুষ তার মনের গভীরে অনুভব করে যে বাস্তবিকই সে আল্লাহকে দেখছে।

প্রকাশ থাকে যে, আত্মার এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বিধায় ইসলামও আত্মার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর পরিচর্যার ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ মানুষের শক্তিনিচয় এবং এবং যোগত্যাসমূহকে ইসলাম কোনভাবে প্রশিক্ষণ ও পথপ্রদর্শন না করে ছেড়ে দেয়নি, বরং মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য ইসলাম বিস্তারিত হেদায়েত দান করেছে।

মানুষকে সঠিকভাবে গড়ে তুলার জন্য ইসলাম যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে সব সময় এবং প্রতিটি মুহূর্তে তার সম্পর্ক স্থাপন এবং চিন্তা -ভাবনা যেন আল্লাহর সংগে সম্পর্কের ভিত্তিতে আর্বতিত হয়।

আপনা থেকেই মানুষের জীবনে সাধারণত এমন কিছু মুহূর্ত আসে যার মাধ্যমে তার আত্মার চেহারা পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং তার আত্মার জগতে অত্যুজ্জ্বল হয়ে তার সামনে প্রতিভাত হয়। কখনো কখনো পূর্ব দিগন্তে অপর দিক থেকে

আনুগত্য এবং ঐ সকল আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, যা জড় পদার্থ, গাছ-পালা এবং জীবজন্তু প্রকৃতিগতভাবে করে থাকে।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্য সঠিক পথ বাছাই করার শক্তি নিহিত থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে, কারণ অনেক সময় তার স্বভাব প্রকৃতিতে এমন কিছু রোগ-ব্যাধি, সত্য-বিমুখতা বা এমন বক্রতা আক্রমণ করে বসে যার কারণে সে সঠিক পথ পরিহার করে, আল্লাহর সংঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহর দেখানো হেদায়েতের পথকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কমুক্ত হতে পারে না। আংশিক হলেও সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে আকর্ষণ ও সম্পর্ক বিরাজ করে, যেমন করে ধাধাগ্রস্ত চোখ পুরোপুরি না দেখতে পারলেও দৃশ্য-বস্তু কিছুনা কিছু তার চোখে পড়েই। এই কারণেই দেখা যায় মানুষ যখন প্রকৃতি-প্রদত্ত সত্য-চেতনা থেকে দূরে সরে যায় তখন সে শিরকে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য অংশীদার ভেবে পূজা করতে শুরু করে। এতদসত্ত্বেও একথা সত্য যে কিছু ব্যতিক্রম ((Exceptional Cases) ছাড়া সাধারণভাবে সবাই মানে যে, আল্লাহ তায়ালাই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা।

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۰ (الزمر : ٣)

“ওদের পূজা পার্বণ তো শুধু এ জন্যই আঁমরা করি যাতে করে তারা আমাদের কে আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়।”(যুমার-৩)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۰ (الزمر : ٣٨)

“আর যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, আসমানসমূহ ও জমীনকে কে পয়দা করেছে, ওরা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ।” (যুমার-৩৮)

ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের কাজই হচ্ছে যে, তা মানুষকে তার স্বভাব প্রকৃতির দিকে এগিয়ে দেয়া এবং তার প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে যে চেতনা আছে তার দিকেই তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা, আর ধর্ম-বিমুখতার কারণে তার মানব প্রকৃতির সহজাত বৃত্তিগুলো যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় তখন ধর্ম এগিয়ে এসে আত্মার সহজাত বিশ্বাসকে নানা প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে আল্লাহর দিকে রুজু করে দেয়।

মানব সত্তার কেন্দ্রবিন্দুআত্মা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের আত্মিক দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মা হচ্ছে মানব সত্তার কেন্দ্র-বিন্দু, যাকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। এর উপর

"স্মরণ করে দ্যাখো ঐ সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের বংশাবলী থেকে মানুষ সমাজের বিস্তার দান করলেন এবং তাদের নিজেদেরকেই তাদের সম্পর্কে সাক্ষী[১] বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ' আমি কি তোমাদের রব বা প্রতিপালক নই ? ওরা বলল, আবশ্যই, আপনিই আমাদের প্রতিপালক, আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করলাম।" (আরাফ-১৭২)

মানুষের আত্মা বিনা বাধায় এবং কোন কষ্ট ছাড়াই আল্লাহর দিকে তেমনি করে রূজু হয় যেমন করে সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে তার নির্মাতার দিকে রূজু হয়।

رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى. (طه - ٥٠)

"আমাদের রব তো তিনি যিনি প্রতিটি জিনিসকে আকৃতি দান করেছেন, তারপর জীবনে কিভাবে চলতে হবে সে পথ দেখিয়েছেন।" (তা' হা -৫০)

আর এ সব কিছুই বান্দার প্রতি আল্লাহর পাকের দয়া-মেহেরবানী

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا .

(الاسراء-٧٠)-

"এতো আমার মেহেরবানী যে, আমি (মহান আল্লাহ) বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে পৃথিবীর স্থলভাগে এবং পানি ভাগে (নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরে) বিচরণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আবার পাক-পবিত্র ও অতি উত্তম বস্তুসমূহ থেকে তাদের জীবন ধারণ সামগ্রী সরবরাহ করেছি। আর আমার বহু জিনিষের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (বনী ইসরাইল-৭০)

আর এটাও আল্লাহ পাকের বড় মেহেরবানী ও দয়া যে, মানুষের অন্তরকে কল্যাণকামী বানিয়ে পরস্পর নিরাপত্তাদানকারী বানিয়ে দিয়েছে।

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ - (السجدة : ٩)

"আর তিনি তোমাদেরকে কান, চোখ, ও অন্তর দিয়েছেন।" (সাজদা-৯)

এভাবে মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের কাজকে আল্লাহপাক মানুষের সত্য -দর্শী অন্তরের কাছে এমনভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সে অতি সহজেই আল্লাহর

---

১. প্রকাশ্য কোন উপায় উপকরণ ব্যবহার না করেও দু' ব্যক্তির মস্তিষ্কে খবর পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সম্ভব। প্রফেসর রাইন (prof.Rhine) ঐ বিষয় বিশেষ গবেষণার কাজ করছেন।

'রূহ' মানুষের এমন একটি গোপনীয় শক্তি যা এটা আত্মা ও অদৃশ্য শক্তির সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে। ফলে মানুষও এভাবে অনুভবের সীমার বাইরে কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পায় অথবা সে এমন একটা স্বপ্ন দেখতে পারে যা পরে সত্যে পরিণত হতেও পারে। মোট কথা হলো অদৃশ্য জগতের কোন ব্যাপারে অবহিত হওয়া এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখা রূহানী কাজ।

অনেক দূর-দূরান্ত থেকে শব্দ পৌঁছে যাওয়াও (Telepathy) মূলত 'রূহানী' কাজ যেমন হযরত ওমর (রাঃ) -এর ঐ বিখ্যাত ঘটনা যখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "ছারিয়া" পাহাড়ের দিকে, ছারিয়া পাহাড়ের দিকে।" এ আওয়াজ ছারিয়ার নিকট কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে পৌঁছে গিয়েছিল। যদিও রূহের এ ধরনের কাজ খুবই আশ্চর্যজনক ও মানুষের জন্য বড়ই পেরেশানকারী ব্যাপার বটে। কিন্তু এটা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। যখন 'রূহ' বা আত্মার সাথে পরমাত্মা মহান আল্লাহর একটা নিবিড় সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এ সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? ঐ সুদূরে খবর পৌঁছানোর (Telepathy) কাজটিই বা কিভাবে আঞ্জাম দেয়া হয়। সুখ-স্বপ্ন কিভাবে অস্তিত্বে আসে?

আত্মার হাকীকত

আত্মার হাকীকাত কি, এ সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে কিছুই জানিনে। আত্মা কিভাবে কাজ করে তাও আমাদের অজানা মূলত আত্মা বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে যোগাযোগের একটি মাধ্যম এবং বান্দাহ্কে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য আত্মা এক প্রাকৃতিক যোগসূত্র, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তার পরমাত্মা থেকে মাটির মানুষ আমাদের মধ্যে এ আত্মা দান করেছেন।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (الحجر - ٢٩)

"এর পর যখন তার (আদমের)শরীর গঠনের কাজকে আমি পরিপূর্ণ করবো এবং তার মধ্যে আমার পরমাত্মা থেকে ফুঁক দিয়ে তাকে জীবন্ত করব তখন তোমরা সম্মানার্থে সেজদায় অবনত হয়ে যাবে।" (হেজর-২৯)

এই কারণেই নিশ্চিতভাবে এটা বলা যায় যে, আত্মা এমন একটা জিনিস যা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করার জন্য মানুষকে পথ দেখায়।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا - (الاعراف - ١٧٢)

চতুর্থ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ

রূহ একটা অনুভবযোগ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়। আধুনিককালের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা তাই রূহের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী নয়। কেননা, তাদের মতে যা অনুভব যোগ্য নয় যা ধরা-ছোয়ার বাইরে, তার কোন অস্তিত্ব নেই। রূহ যেহেতু মানুষের অনুভব ও ধরা- ছোয়ার বাইরে তাই রূহেরও কোন অস্তিত্ব নেই।

'কোন মাযহাবের প্রতি ঈমান না থাকা সত্ত্বেও দার্শনিক হাক্সলে (১৮২৫-৯৫) রূহ সম্পর্কে বস্তুবাদীদের ধারণা বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেনঃ "এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, কোন মানুষের মধ্যে তার সীমার বাইরে এমন এক শক্তির উন্মেষ ঘটে যায় যার মাধ্যমে সে অজানা জিনিস সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। আমাদের ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে না পারা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার বৈধতা প্রমাণ করে না। এটা এমন একটা বিষয় যা আমরা সম্যকভাবে অবহিত নই যে, মানুষ যখন কোন বিষয় উপলব্ধি করে অথবা কোন বিষয়কে স্মরণ করে তখন উপলব্ধি ও স্মরণ করার কাজটি মানুষের মস্তিষ্কে কিভাবে সম্পন্ন হয়। কেউ কি উপলব্ধি ও স্মরণ করার কাজটিকে অস্বীকার করতে পারে ? এমনিভাবেই আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি না যে, মানুষ তার অনুভবের বাইরের বিষয়গুলো কিভাবে উপলব্ধি করতে পারে যদিও এটা একটা নিতান্তই বাস্তব ব্যাপার।"

যদিও 'হাক্সলের স্বীকৃতি আংশিক যে, তিনি ইন্দ্রিয় বহির্ভূত উপলব্ধি ও ক্ষমতাকে কতিপয় লোকের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছেন। আর এ আত্মিক শক্তিকে প্রকৃত মানুষের শক্তি হিসেবে মেনে নেন না। তবুও এ স্বীকৃতি এ দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পশ্চিমের একজন নামকরা দার্শনিকের পক্ষ থেকে এ কথাটা এসেছে, যে মাযহাব ও ধর্ম মানে না। ফলে এ মূল্যায়নকে সঠিক এবং প্রকৃত মনুষত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রূহ নিঃসন্দেহে এমন একটা জিনিস যা অজ্ঞাত ও গোপনীয়তার পর্দায় আচ্ছাদিত। এতদসত্ত্বেও এটা নিতান্তই বাস্তব।

উপলব্ধি ও স্মরণ করার ব্যাপারটা কিন্তু অনুভবযোগ্য নয়, দার্শনিক হাক্সলে যা স্বীকার করেছেন। এটা অনুভবযোগ্য মনে করা ভুল। কারণ, যে জিনিসটা অনুভবযোগ্য তা হলে তার ফল। কিন্তু মূল কাজটা অনুভবযোগ্য নয়। আমরা এটা নিশ্চিত জানিনা যে মানব মস্তিষ্কে উপলব্ধি ও স্মরণ করার ব্যাপারটা কি ভাবে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়টার প্রতি চিন্তা-ভাবনা করলে আত্মিক শক্তির অস্তিত্বের ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হয়। আর এটাও স্বীকার করে নিতে হয় যে,

ইসলাম সত্যপথের পথিকের আত্মিক প্রশান্তির জন্য রূহানী খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করে থাকে। পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

তার একাকিত্ব চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তার পার্থিব কাজে সঠিক পথ নির্দেশিকা দিয়ে থাকে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশিকা দিয়ে থাকে। তার জীবনের অন্ধকার পথে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে করে পথ না হারায় এবং পা পিছলে না পড়ে যায়, পড়ে গেলেও আবার উঠে যাতে আলোতে সঠিক পথ চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট কথা মানুষের হৃদয় যদি সারাক্ষণ আল্লাহর দিকে রুজু থাকে তা হলে তার সমগ্র কাজকর্মই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ . وَ اٰتَى
الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব ও পাশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। পুণ্য রয়েছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব, নবীদের উপর ঈমান আনার মধ্যে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে সালাত কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে, ওয়াদা করে ওয়াদা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশ ও সংগ্রাম -সংকটে ধৈর্য ধারণ করণে। এরাই সত্যবাদী ও মুত্তাকী"(বাকারা-১৭৭)

এটা ঐ ইবাদাত পদ্ধতি যা ইসলাম নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং যার উপরই প্রশিক্ষণের ভিত্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যার মধ্যে সত্য, খোদাভীতি, আল্লাহর চিরন্তন ও ধারাবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সামনে বর্ণনা করা হবে আল্লাহর সাথে মানবাত্মার সম্পর্ক স্থাপনে কি পদ্ধতি ইসলাম ঠিক করে দিয়েছে।

দেয়া হয়নি, জানানো হয়নি যে, সে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং অন্যান্য বান্দাহদের উপর তারও একটা দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

এ উদাহরণ এটা সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে এ শিক্ষাই তুলে ধরে যে, ইসলামী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে এবং গায়ের ইসলামী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে কতটা পার্থক্য বিদ্যমান। আর এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম মানুষের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে আল্লাহর ইবাদতকে কেন নির্দ্ধারণ করা হয়েছে এবং কেন মানুষকে আল্লাহর সাথে স্থায়ী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।

মানব কল্যাণের প্রকৃত ধারা

এ ধরাধামে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা তখনই আসবে যখন মানুষের আত্মা ও মহান আল্লাহর মধ্যে একটা সুদৃঢ় ও প্রেমময় জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এমত অবস্থায় এ নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে যে, পৃথিবীতে সব মানুষের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, সত্য-ন্যায়, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে এবং সব মানুষ পরস্পরে মানবতার মধুর ও আকর্ষণীয় সম্পর্ক অনুভব করবে। এ নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত আছে বলেই ইসলামে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তি এবং জীবন জাপনের মূলনীতি হিসাবে 'ইবাদতে ইলাহী' কে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তার কাজকর্ম, লেন-দেন আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। আল্লাহর ভয়, ভালবাসা, আল্লাহর প্রদত্ত বিধানের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। সে একাকী থাকুক বা জনসমাগমে ইবাদত মশগুল থাকুক বা কর্মক্ষেত্রে তৎপর থাকুক, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকুক বা রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকুক সন্ধি-সমঝোতার প্রশান্তিতে থাকুক বা যুদ্ধ-সংগ্রামের ময়দানে মোট কথা সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা পোষণ করবে।

ইসলামে ইবাদতের ধারণা হলো ইবাদতকারীর গোটা জীবন ও কর্মতৎপরতার উপর ধারাবাহিক সম্পর্ক থাকবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বাস্তব কর্মজীবন অতিবাহিত করবে। ইবাদতের তাৎপর্য কখনো এটা নয় যে, মানুষ বড়ই অনুনয় বিনয় করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে আর নামায থেকে আলাদা হয়েই পূর্বের ন্যায় স্বার্থপর, লোভী, যালেম হিসাবে কাজ করবে। তাহলে এমন ব্যক্তি আমানতের দায়িত্ব পালনে এবং হক প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। এমন সব মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগী নয়।

ইবাদত তো আল্লাহর দিকে এক সফরের বিরামহীন যাত্রা। এ পথের পথিকতো চলার পথে কেবলমাত্র প্রয়োজনে থেমে থেমে পাথেয় সংগ্রহ করবে এবং প্রস্তুতি নিয়ে সামনে চলবে।

জন্য ইসলাম যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করে মানবাত্মার বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। সামনে যার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এখানে আমি ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির এমন কতিপয় বিশেষত্ব আলোচনা করবো যা ইসলামকে অন্যান্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে বিশেষ মর্যাদা ও অনন্যতা দান করেছে।

দুনিয়ার কতিপয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মানুষের সম্পর্কে কোন বিশেষ দেশের সাথে সম্পর্কিত করে। ফলে কোন পদ্ধতি বিশেষ ব্যক্তির সাথে কোন পদ্ধতি পৌরাণিক কোন কাহিনীর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। তারপর সমগ্র প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সেই ভিত্তির উপরই রচনা করে থাকে। ফলে মানুষের চিন্তা -ভাবনা কাজ-কর্মে সেই রঙ্গেই রঙ্গিন হয়ে যায়। আর এ পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে কতিপয় ভাল গুণও বিকশিত হতে থাকে বা একটা সীমা ও পরিধি পর্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ বিবেচিত হয়। এবং কিছুটা সত্যও থাকে কিন্তু যেহেতু এটা একেবারেই স্থানীয় তাই সামগ্রিক মানবতার মানবদণ্ডে এটা পুরাপুরি টিকে না। যেমন পশ্চিমের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় ইংলণ্ডের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আওতায় সেখানে তাদের মধ্যে এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। যেমন তারা চুরি ডাকাতি লুটতরাজ করে না, মিথ্যা বলে না, কাউকে ধোকা দেয় না, কারো সাথে প্রতারণা করে না, অধিকন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বিদ্যমান। জনকল্যাণের উপলব্ধি ও প্রেরণা রয়েছে, জনগণের প্রয়োজনে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাকে কুরবানী করতে প্রস্তুত। কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইংরেজদের এ সব সৎগুণ, তাদের সুন্দর স্বভাব -চরিত্র ও মানব কল্যাণকামিতা সবই ইংরেজ জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। যখনই তারা ইংল্যান্ডের ভৌগলিক সীমারেখা থেকে বের হয়ে আসে তার সম্পূর্ণ উল্টা স্বভাবের মানুষে রূপান্তরিত হয়। কেননা, দেশ পূজার যে মানসিকতার উপর তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সে দেশ প্রেমের ভূত তো ইংল্যাণ্ডেই রয়ে গেছে। এখন সে আর সেই ইংরেজ না যা ইংল্যাণ্ডে ছিল। এখন তো সে এক জন স্বার্থপর, পরলোভী, আরামপ্রিয়, ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী, লুটতরাজ রাহাজানির নায়ক। এক কথায় নিজের সুখ -স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশের প্রয়োজনে যে কোন কর্ম সম্পাদন করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এখানে ন্যায় -অন্যায় ও মানবতার প্রশ্ন তার কাছে খুবই গৌণ।

প্রকৃত সত্য হলো, ইংল্যাণ্ড থেকে বের হয়ে ইংরেজের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি, বরং এখনো সেই দেশমাতৃকার পূজা করছে যার পূজা করার প্রশিক্ষণ তাকে দেয়া হয়েছে। তাকে কখনো মানবতার সেই মহান নীতি নৈতিকতার শিক্ষা

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদাতের পদ্ধতি

ইসলামী পদ্ধতির একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হলো এটা একটি ইবাদতের পদ্ধতিও বটে। কিন্তু ইসলামে ইবাদাত বলতে কেবলমাত্র কতিপয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাই বুঝায় না। বরং ইসলামে ইবাদতের অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও সুগভীর। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে এ সম্পর্ককেই ইসলাম ইবাদত নামে অভিহিত করে। আর আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের ভিত্তির উপরই ইসলামের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নামায, রোযা, হজ্জ, জাকাতসহ যাবতীয় কর্মতৎপরতা, এমনকি রাস্তায় থেমে যাওয়া কিংবা নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে সফর শুরু করা, সফরের দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবত, ত্যাগ ও কুরবানী সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। শর্ত হলো এ সফরের টার্গেট হবে আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তোষ অর্জন করা এবং সফরকারী শুধুমাত্র মুখেই তাওহীদ ও রেসালাতের ঘোষণা দিবে না সে নিজের গোটা আমলি জেন্দেগী এরই উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলবে। এর আলোকেই ইসলামে ইবাদাতের তাৎপর্য ও ব্যাপ্তি বান্দাহর গোটা জীবনকেই শামিল করে থাকে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

"আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবলমাত্র আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত-৫৬)

এ আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই।

ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ সব মুহূর্তের নাম ইবাদাত নয় যা জীবনের আঙ্গিনায় কিংবা সৃষ্টিলোকের পরতে এক মুহূর্তের জন্য উকি দিয়ে বুদবুদের ন্যায় বিলীন হয়ে যায়, বাস্তব ও কর্মজীবনে যার কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাত গোটা জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। ইবাদত যখন মানুষের চিন্তা-ভাবনা আমল-আকীদার উপর কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি করে তখনই এ ইবাদাত দামী ও গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তখন মানুষ এ ইবাদাতের আলোকেই নিজেদের কাজকর্মের ভাল-মন্দ ঠিক-বেঠিক, উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা নির্ধারণ করতে পারে।

যাবতীয় কাজ-কর্মের লক্ষ্যই হলো আল্লাহ। তার প্রদত্ত বিধানই মানুষের জন্য জীবন বিধান যা দেল-দেমাগ, চিন্তা-চেতনার ব্যাপকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে আল্লাহর দিকে অনুগত রাখে এবং যা ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বুনিয়াদ। এ উদ্দেশ্য হাসিলের

সংশোধনের কর্মসূচী দিয়েছে এবং তাদের সার্বিক ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের বাস্তব ব্যবস্থা করেছে।

মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তার মধ্যে ক্রমোন্নতি ও সফলতা অর্জনের যোগ্যতা সব সময় বিদ্যমান থাকে। উন্নতি করা ও বাস্তব জীবনে সফলতা লাভ করে পরিপূর্ণতা হাসিল করার সময় একটা প্রেরণা তার মধ্যে রয়েছে। যদিও সব সময় সে উন্নতি ও সফলতা লাভ করতে পারে না কিন্তু তবুও সব সময় সে চেষ্টা, মেহনত, সংগ্রাম সাধনা অব্যাহত রাখে। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন সে তার চতুর্দিকে অবস্থিত শক্তি-সামর্থের উপর বিজয় লাভ করে থাকে। আর এটা তখনই সম্ভব হয় যখন সে নিজের ভিতর লুক্কায়িত যোগ্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয়ে স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী তা বিকশিত করার ব্যবস্থা করে থাকে। এ সময়টা সাময়িক হলেও তার জীবনে এটা অত্যন্ত বাস্তব হয়ে থাকে।

মোট কথা মানব স্বভাবের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা ও দুর্বলতাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং তার মধ্যে লুক্কায়িত সে সব শক্তি-সামর্থকেও ইসলাম অত্যন্ত মূল্য দেয় যার মাধ্যমে সে একটা ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে থাকে। ফলে ইসলামী জীবন দর্শন যা বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে উচ্চ ও সমুন্নত জীবনের ধারণা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃত ও বাস্তব জীবনের বিপরীত কোন ধারণার সম্ভাবনা এখানে নেই।

ইসলামী জীবন দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সেই সৎকর্মশীল মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায় যাকে ইসলাম বাস্তবে গড়ে তুলেছে।

ইসলামী জীবন দর্শন ও সৎকর্মশীল মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিম্নরূপ। এ বিষয়গুলোর উপরই সামনের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

- পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা,
- ভারসাম্যপূর্ণ সমতা,
- সহজ গ্রহণ ক্ষমতা,
- বাস্তব আদর্শ।

বাস্তব আদর্শ

ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই হলো বাস্তব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। আর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ইসলাম মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। ইসলাম মানুষকে তার বাস্তব প্রয়োজন ও শক্তি-সামর্থ্যসহ বিবেচনা করে থাকে। আর এটাও খেয়াল রাখে যে, মানুষের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট বিপদ-মুসিবত সহ্য করার এবং দায়িত্ব পালনের কতটা যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا.

"মহান আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার শক্তি-সামর্থের বাইরে দায়িত্ব পালনের ভার দেন না।" (বাকারা -২৮৬)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"যতদূর পর্যন্ত সাধ্য আছে আল্লাহকে ভয় করতে থাক।" (তাগাবুন-১৬)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ-

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে।" (আলে-ইমরান-১৪)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

"আল্লাহ তোমাদের দায়-দায়িত্ব হালকা করতে চান, কেননা, মানুষ জন্মগতভাবেই বড় দুর্বল।" (নিসা -২৮)

মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে যেহেতু ইসলাম সম্যকভাবে অভিহিত আছে তাই উহা মানুষের উপর এমন কোন বিধি-নিষেধ ও দায়-দায়িত্ব চাপাতে চায় না যা তারা পালন করতে অক্ষম।

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"সেই মহান আল্লাহ তোমাদের নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন রূপ কাঠিন্য ও সমস্যা রাখেননি।" (হজ্জ-৭৮)

ইসলাম মানুষের উপর যে দায়-দায়িত্ব আরোপ করেছে তা তাদের ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ বহির্ভূত নয়। এ ছাড়া ইসলাম মানুষের দুর্বল স্বভাব চরিত্রের

বাছাই করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, এক আল্লাহর উপর সুদৃঢ় ঈমান আনবে।"(আলে-ইমরান-১১)

ইসলাম মানুষের মধ্যে এমনি একটি জবরদস্ত ইতিবাচক শক্তি সৃষ্টি করতে চায় যার মাধ্যমে কোন রূপ বিদ্রোহ ও নেতিবাচক প্রবণতা থাকবে না। কেননা বিদ্রোহ ও নেতিবাচক প্রবণতা মানুষকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। এতে করে মানুষ নিজের উপরই জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে থাকে, যেমন নিজের কিছু যোগ্যতাকে অবদমন করে অন্য কিছু যোগ্যতা তাকে এগিয়ে আসার সুযোগ দেয়। শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা বিকশিত করার জন্য রূহানী শক্তিকে দমিয়ে দেয় অথবা বস্তুগত দিককে বিকশিত করার জন্য অপার্থিব দিককে দমিয়ে রাখা হয়।

মানুষ অন্যের উপরও জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে থাকে। সে নিজের হক পেতে চায় অন্যের হক আদায় করতে চায় না। ব্যক্তি বা জাতি যেই হোক না কেন মানুষ যখন অন্য মানুষের উপর জুলুম করে তখন সে অন্যকে গোলাম বানিয়ে নেয়। নিজের ক্ষমতার সামনে তাকে অসহায় ও অবনত করে দেয় তার ইজ্জত সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে ধুলায় লুটিয়ে দেয়, তার উপর নিজের হক ওয়াজেব করে দেয়। আর সে নিজের এসব অন্যায় আচরণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও দুর্নাম সম্পর্কে কোনই পরোয়া করে না।

এই নেতিবাচক চিন্তা-ধারার প্রকাশ বস্তুগত অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এ চিন্তাধারা স্বভাব চরিত্র, আচার-আচরণেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। এ চিন্তার অধিকারী ব্যক্তি সমাজে নিয়ম নীতির শৃঙ্খল ভেঙ্গে আযাদ হতে চায়। এতে করে সে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার যোগ্যতাকেই বিনষ্ট করে দেয় মাত্র।

মোট কথা অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তাধরাই এমন যা ক্রটিপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও ভুল পরিচালনার দরুন সৃষ্টি হয়। আর এটা তখনই সৃষ্টি হয় যখন নফসের কোন বিশেষ দিকের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং অন্য দিকগুলো উপেক্ষা করা হয়। যেমন ব্যক্তিগত আবেগ (Individual Instinct) বা সমষ্টিগত আবেগ (Collective Instinct)-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় কিংবা মানুষের বস্তুগত দিক অথবা রূহানী দিকের প্রতি যদি অহেতুক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে ফলশ্রুতিতে ক্রটিপূর্ণ ইতিবাচক দিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে কিংবা নেতিবাচক দিক। এমতাবস্থায় একমাত্র ইসলামই মানুষের সমগ্র দিকগুলোর মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে তার মধ্যে ইতিবাচক কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে।

ইতিবাচক চিন্তা

ইসলামের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সৎকর্মশীল মানুষ অন্যান্য সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী হয়ে থাকে যা মূলতঃ ইসলামী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থারই ফল। আর ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এমন ধরনের গুণাবলীই সৃষ্টি করতে চায়।

প্রকৃত ব্যাপার হলো -মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিপরীতমুখী যোগ্যতা রয়েছে যার মধ্যে কিছু ইতিবাচক ও কিছু নেতিবাচক। এ সব যোগ্যতাগুলোকে যদি বিকশিত করার কোন রকম ব্যবস্থা না করেই ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে এগুলো নিজস্ব ধারায় বিকশিত হবে অথবা এর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। যার পরিণতিস্বরূপ মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিকের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। অন্যদিকে এটাও হতে পারে যে, কখনো তার নেতিবাচক যোগ্যতা সক্রিয় হয়ে কখনো ইতিবাচক। আর এ পর্যায়ে মানুষ এক সুদৃঢ় লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং কোন এক উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা সংগ্রাম করাও তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানুষ এমন এক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হবে যা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বস্তুগত শক্তির উপর তার প্রাধান্য স্থাপিত হবে এবং গোটা সৃষ্টিজগতের উপর সে বিজয়ী হবে।

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

"সেই মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে আসমান -জমিনের যাবতীয় জিনিসকে তোমাদের জন্য অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন।" (জাসিয়া -১৩)

মানুষ এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তার বাস্তব ও কর্ম জীবনের বিড়াট বিপ্লব সাধন করবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ٠

"কোন জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্বভাব ও চরিত্রকে পরিবর্তন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার অবস্থার পরিবর্তন করেন না।" (রায়াদ-১১)

এটা এমন এক বিড়াট শক্তি যার আলোকে মানুষ তার বাস্তব ও কর্মজীবনকে ইসলামী দিকনির্দেশনায় গড়ে তুলতে পারে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ٠

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য

পড়ে এবং অন্যগুলোকে ভুলে যায় তো এর কারণ হলো তার প্রকৃতিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি যা তার কর্মজীবনেও প্রভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন ব্যক্তি যদি তার শারীরিক শক্তির চরম বিকাশ ঘটায় অথবা বুদ্ধিবৃত্তিকে চরম বিকশিত করে স্পপ্নের রংমহলে বন্দী হয়ে পড়ে অথবা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ফেরেশতার জগতে ঘুরে বেড়ায় এবং বাস্তব কর্মজীবন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে তাহলে এমন ব্যক্তি এ সব সত্ত্বেও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে এবং তার জীবন ভারসাম্যহীনতার কারণে একধরনের অস্বাভাবিক তৃপ্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

কোন সমাজ যদি সমষ্টিগতভাবে এ ধরনের দোষ-ত্রুটিগুলোকে নিজেদের মধ্যে লালন করে তাহলে তাদের সামাজিক জীবনে কোন ভারসাম্য ও সমতা সৃষ্টি হতে পারে না।

কোন সমাজের সমগ্র কর্মতৎপরতার ও চেষ্টা সাধনার লক্ষ্য যদি বৈষয়িক সাফল্য ও সচ্ছলতা অর্জন এবং জৈবিক কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করা হয় তাহলে নেই সমাজ বিপর্যয়, ধ্বংস ও অধঃপতনের অতলতলে হারিয়ে যাবে। যেমন ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা এ ধ্বংসের শিকার হয়েছিল।

কোন সমাজ যদি নিজেদের সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য পার্থিব কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও দর্শনের আলোচনায় আমর মাত করে রাখার ভূমিকা পালন করে তাহলে সে সমাজের পতনকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। যেমন বিগত দুশতকে ইউরোপের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় চলে আসে। জাতির দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবীরা যখন কর্মহীন দর্শন চর্চায় মশগুল, তখন জনগণ ক্ষুধা দারিদ্র, দুঃখ-দুর্দশা ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য সমাজতন্ত্রের আপাতমধুর প্রলোভন লুফে নেয়।

কোন জাতি যদি কেবলমাত্র রূহানী শক্তি বৃদ্ধির চর্চায় লিপ্ত হয় এবং এ কাজেই সামগ্রিক যোগ্যতা বিনিয়োগ করে তাহলে এ ধরনের কর্মবিমুখতার পরিণতিতে অবশ্যই তাকে পতন ও ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে।

এ সব কারণে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা এমন একটি বুনিয়াদী টার্গেট যা অর্জনের জন্য ইসলাম মানুষকে জীবনের শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় মেহনত করার পথনির্দেশিকা দিয়ে আসছে। মানব জীবন বিকাশের সর্ব পর্যায়ে ইসলাম সযত্ন প্রয়াস চালায় এবং তার সমগ্রিক যোগ্যতা একই সাথে বিকশিত করার ব্যবস্থা করে, যাতে করে মানুষ ইসলামের দিকনির্দেশনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিজের জন্য উপযুক্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে সমতা, ভারসাম্যের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

ভারসাম্য ও সমতাঃ গোটা সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্য

এ সর্বব্যাপক ভারসাম্য ও ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেরই বেশিষ্ট্য নয় বরং এটা গোটা সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্য। এ ভারসাম্যতার করণেই সৃষ্টিজগতে এত ব্যাপকতা সত্ত্বেও কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয় না। এ সৃষ্টিজগত ও মানুষের স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী যেসব মানুষ তাদের জীবনকে পরিচালিত করে এ ভারসাম্য তাদেরই বৈশিষ্ট্য। তারা এ দুনিয়ার "খেলাফতের" দায়িত্ব পালন করে।

মানব জীবনে ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা কোন চাট্টিখানি কথা নয়। বরং এটা হলো গোটা জীবনব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই নাম যা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক ময়দানে চালিয়ে যেতে হবে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সামষ্টিক চাহিদার মধ্যে আনুকূল্য বিধান করতে হয়, অতি প্রয়োজন ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের মধ্যে যোগসূত্র বের করতে হয়, এ মুহূর্তের প্রয়োজন পূরণের উপায়-উপকরণ আর দূর ভবিষ্যতের উপায়-উপকরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। বর্তমান সময় ও প্রজন্মের সাথে অনাগত সময় ও প্রজন্মের একটা সম্পর্ক তৈরি করা দরকার। মোট কথা এটা এমন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যা গোটা জীবনব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এটা এমন একটি মহান উদ্দেশ্য যা অর্জনের জন্য এ সমগ্র প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানই অপরিহার্য। যাতে করে মানুষ শক্তি, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, বস্তুগত ও নৈতিক জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও উন্নতি হাসিল করতে পারে। কেননা, মানুষের জীবনে যে সব সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি হয়, যে অশান্তি ও মুসিবত আসে, যে বিপর্যয় ও ধ্বংস নেমে আসে তার অন্যতম কারণ হলো -অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। যার পরিণতিতে বাস্তব জীবনে আর ভারসাম্য অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষের মধ্যে যখন ধন-সম্পত্তির লালসা, জৈবিক কামনা, ক্ষমতার প্রচণ্ড লিপ্সা অথবা অন্য কোন নফসানী খাহেশাত চাড়া দিয়ে উঠে তো এর সঠিক কারণ তার প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে যা সর্বদা অস্থির ও তাড়া করে বেড়ায়। প্রথমিক স্তরে সে এটা মনে করতে পারে যে, সে খুব সৌভাগ্যশালী জীবনের লক্ষ্য হাসিল করতে পেরেছে এবং জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধিকে কব্জা করতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হতাশা, দুঃখ-দুর্দশা, অস্থিরতা ও পেরেশানীর শিকার যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলে। যা শেষ পর্যন্ত তার কর্মজীবনেও হতাশা, ও দুঃখ-দুর্দশা বিস্তার ঘাঁয় এবং ক্রমান্বয়ে এটা অনান্য লোকদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। এভাবেই তার জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা, ও দুঃখ-দুর্দশা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সামাজিক জীবনে অন্যায়-অনাচার, জুলুম-নির্যাতন ও বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পায়।

মানুষ যখন তার প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত কোন একটা স্বভাবের দিকে ঝুঁকে

কোন একটা দিক ও বিভাগকে অকেজো ও বেকার রাখে না। বরং প্রত্যেকটি দিকই কর্মচঞ্চল ও জীবন্ত রাখে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্নমুখি প্রবণতা যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে তাকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। মানুষের গোটা সত্তাকে এভাবে কাজে লাগানোর উদাহরণ হলো সেই উচ্ছল প্রাণবন্ত ও প্রবাহমান ঝর্ণার মত যা থেকে বেশী পানি নিষ্কাশনের রাস্তা বের করা যায় তত বেশীই পানি তা সরবরাহ করে থাকে।

ইসলামে বর্ণিত সঠিক, বাস্তব এবং কর্মময় জীবন মানুষের একক ও সার্বিক জীবনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে যে, ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত জীবনই একমাত্র সর্বদিক ও সর্বব্যাপী হতে পারে। জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ ও দ্বায়িত্বশীল নেতা এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাহজিব তামাদ্দুন, সংগঠন আন্দোলন - এ জীবন ব্যবস্থাই জন্ম দিতে পারে। এটা মনে করার যৌক্তিকতা নেই যে, মুসলমানের বস্তুগত ও পার্থিব কর্মব্যস্ততা তার ইবাদতে লোকসান ডেকে আনে। অথবা ইবাদত বন্দেগীর মগ্নতা তাকে দুনিয়ার পরিচালনা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন সম্পর্কে গাফেল করে দেয়। অথচ বাস্তবতা হলো মুসলমানরাই তো একদা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, উন্মোচন করেছেন জ্ঞানের নতুন দিগন্ত।

মানুষ তার ক্ষমতা ব্যবহার করে তার নফস ও বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করে নেয়। আর এ ভারসাম্যই মানুষের জাবতীয় কর্মতৎপরতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে এবং এটাই একজন সৎকর্মশীল মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়।

দেহ-মন-আত্মার ভারসাম্য, মানুষের জৈবিক ও নৈতিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য, মানুষের প্রয়োজন ও সাধের মধ্যে ভারসাম্য, তার কল্পনা ও সাধ এবং বাস্তব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য, বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ও গায়েবের প্রতি ঈমানের ভারসাম্য, ব্যক্তিগত সাধ-আহলাদ উদ্দীপনা ও সমষ্টিগত উদ্দীপনার মধ্যে ভারসাম্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য, মোট কথা জীবনের সব ক্ষেত্রেই একটা অমোঘ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক বস্তুতে সমতা, প্রত্যেক কর্মতৎপরতায় ভারসাম্য !

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.

"এমনি করে আমরা তোমাদেরকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছি।"

(বাকারা-১৪৩)

একটা দিকও কর্মহীন বেকার থাকে না। এ ভারসাম্য, সামঞ্জস্য ও সুন্দর ঐক্যের মাধ্যমে ইসলাম দুটো উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়।

প্রথম উদ্দেশ্য হলো—মানুষ তার সমগ্র শক্তি ও যাবতীয় যোগ্যতা ব্যবহার করবে। তার শক্তি-সামর্থ যেন নষ্ট না হয়। মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে পরিমিত যোগ্যতা ও অফুরন্ত শক্তি দিয়েছেন। এখন যদি এসব যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থকে কাজে না লাগানো হয় তা হলে এটা হবে সেই আল্লাহর প্রতি একটা সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

মানুষের মধ্যে একটা প্রচণ্ড পাশবিক ও জীবনী শক্তি দেয়া আছে। এ শক্তিকে এদুনিয়ার পুনর্গঠন, উন্নতি সাধন ও জীবনের ভিতরে লুক্কায়িতে ধন-সম্পদ আহরণ ও রেযেকের অন্বেষণে এ শক্তিকে কাজে লাগানো, জীবনের উন্নতি ও বিকশিত করার মেহনতে এ শক্তি-সামর্থকে বিনিয়োগ করা এবং সর্বদা এক নতুন সভ্যতা বিনির্মাণে কর্মমুখর রাখা প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে মহান রাব্বুল আলামীন আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেছেন যা আল্লাহকে উপলব্ধি ও তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির কাজে লাগানো দরকার। মানুষের উচিত উক্ত আধ্যাত্মিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত অনুযায়ী জেন্দেগী যাপন করা, কল্যাণের পথ বিকশিত করা, মানবীয় ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ প্রতিপালিত করা এবং বস্তুগত উন্নতি ও কল্যাণকে গোটা মানব সভ্যতার কল্যাণে লাগানোর ব্যবস্থা করা।

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধাশক্তি দিয়েছেন। এ শক্তিকে প্রয়োগ করে মানুষ সৃষ্টি জগতের রহস্য সম্পর্কে পরিচিত হবে, জানবে প্রকৃতির নিয়ম কানুন, উপলব্ধি করবে এ দুনিয়া এবং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহর কোন্ মৌলিক নীতি ক্রিয়াশীল রয়েছে; সৌরজগৎ ও জীবজগতের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটুকু সীমাহীন। অতঃপর এ পরিচিতি ও উপলব্ধির আলোকে মানুষ তার জীবনকে গড়ে তুলবে এবং নিজের সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

মানুষের জন্য এটা বড়ই দুর্ভাগ্য ও লজ্জাজনক যদি সে নিজের অভ্যন্তরিণ শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত না হয় কিংবা তার যোগ্যতা ও সম্ভাবনাকে কাজে না লাগায় বরং তার তো উচিত নিজের জাবতীয় শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ প্রকাশ করা। যাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সে আল্লাহর ইবাদতকারি বান্দা তার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনকারী, চিন্তাশীল সৃষ্টি জগতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত, প্রকৃতির নিয়ম কানুন সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন নিজের শারীরিক, শক্তি-সামর্থ প্রয়োগ করে পার্থিব জীবনকে সুসজ্জিত, বিকশিত উন্নতকারী। মোট কথা সে স্বীয় জীবনের

বিভাগগুলো মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির দাবী ও চাহিদার ভিত্তিতে ইসলাম গড়ে তুলেছে। যদিও কখনো কখনো তার কতিপয় দিক গালেব ও প্রকাশ হয়ে পড়ে।

নিছক দুনিয়াবী কাজকর্ম যেমন বিয়ে-শাদী, তালাক-মিরাজ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যুদ্ধ-সন্ধি এসব ব্যাপারগুলো বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে পূর্ণবিন্যাস করেছে এবং সবগুলোকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেহ ও মনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়ে প্রত্যেকের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ বলে দিয়েছে এবং আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অবলম্বনের তাগিদ করেছে।

ইবাদতকে মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۔ –(الذاريات : ٥٦)

"আমি জ্বীন ও মানুষকে তো শুধুমাত্র আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত-৫৬)

এই ইবাদত তো মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহর অপার মেহেরবানী ও করুণা যে, তিনি নফসের সংশোধন ও দুনিয়াবী জেন্দেগীর সংসোধন ও কল্যাণের জন্য ইবাদতকে উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়াও এই ইবাদতের উপর আখেরাতেও ছওয়াব নির্ধারণ করেছেন এটা তার অতিরিক্ত মেহেরবানী। আল্লাহ মানুষের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। ফলে কেউ সারা জীবন ইবাদত করুক কিংবা গুনাহ করুক এতে আল্লাহর কোন লাভ লোকসান নেই। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।[১]

وَمَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ ۔

"আমি তাদের কাছে কোন রিযক চাই না, এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে, ভরণ পোষণ করবে।" (যারিয়াত-৫৭)

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ۔

"যে ব্যক্তিই চেষ্টা-মেহনত করে তার নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করে। আল্লাহ গোটা সৃষ্টি জগতের মুখাপেক্ষীহীন।" (আনকাবুত-৬)

মিল ও ঐক্যের দু'টি উদ্দেশ্য

ইসলাম মানুষের নফস, তার শারীরিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও রূহানী দিকগুলোকে পরস্পর এতটা ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে যে, তার কোন

---

১. আমার লিখা 'ফিন নফস ওয়াল মুজতামাআ' গ্রন্থেও 'ইসলামী ইবাদত' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন বিধান তাকে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে বিভিন্নমুখি সুযোগ সুবিধা ও যোগ্যতা দিয়েছে। একটা বিস্তীর্ণ ময়দানে তাকে কাজ করতে হয়। জীবনের এ বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে কখনো তার কতিপয় দিক সামনে এগিয়ে আসে, তখন অন্যদিকগুলো আড়ালে চলে যায়। কখনো সে ইবাদতে মশগুল, কখনো চিন্তা-ভাবনায় বিভোর। কখনো নিদারুণ কর্মব্যস্ত, কখনো জৈবিক চাহিদা পূরণের আনন্দে মাতোয়ারা। কিন্তু এ সব মুহূর্ত ও ঘন্টাগুলো পরস্পরে এক অবিচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, সম্পূরক ও পরিপূরক।

ইসলাম এটা বিশ্বাস করে না যে, ইবাদতের ব্যাপার শুধুমাত্র রূহের আধ্যাত্মিক জগত পরিভ্রমণ মাত্র বরং ইসলামে ইবাদতের সময় রূহের সচেতন অংশ গ্রহণের সাথে সাথে শারীরিক নড়াচড়া ও জ্ঞান-বুদ্ধির সজাগ অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নামাযের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, নামাযের সময় একই সাথে নামাযীর শরীর, বুদ্ধি ও রূহ শামিল হয়ে থাকে।[১] সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষ যদি তার স্রষ্টার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে, তার ইচ্ছার প্রতি নিজের ইচ্ছাকে নীল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তার হেদায়েত গ্রহণ করে তা হলে তার প্রতিটি কর্মতৎপরতা ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হবে।

চিন্তা ভাবনার সময়ও মানুষকে একাকী ছেড়ে দেয় না ইসলাম বরং সে সময়ও তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে বেধে দেয়া হয়। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও আত্মার মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এমনকি জৈবিক চাহিদা পূরণের আনন্দঘন মুহূর্তেও মানুষকে ইসলাম একাকী স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় না বরং সে সময়ও তার আত্মার সাথে গভীর সম্পর্ক অটুট থাকে। সুতরাং ইসলামের নির্দেশ হলো মানুষ তার পানাহার থেকে যাবতীয় কাজকর্মের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলে আরম্ভ করবে এমনকি স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনের সময়ও সে বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করবে। বর্ণিত আছে একবার রাসূলে খোদা (সঃ) বলেন, "স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনের কাজের মধ্যেও তোমাদের সওয়াব রয়েছে। সাহাবারা আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাদের নফসের খায়েশাত পূরণের মধ্যেও কি সওয়াব রাখা হয়েছে ? তিনি জবাবে বলেন, কেন রাখা হবে না ? তোমরা যদি হারাম পন্থায় এ যৌনচাহিদা পূরণ করতে তাহলে কি গুনাহ লেখা হতো না ? সুতরাং হালাল পন্থায় যখন তা করলে তাহলে অবশ্যই সওয়াব হবে।" (মুসলিম)

অর্থনৈতিক বিধান, জমিনের উৎপাদিত ফসল এবং নিছক পার্থিব নিয়ম - কানুনের ক্ষেত্রে ইসলাম মানবীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেনি। বরং এসব

১. লেখকের 'ফিন নাফস্ ও মুজতামাতা'আ' বই এর ইসলামী ইবাদত। অধ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পরে মনের অবচেতন স্তরের গভীরতায় হারিয়ে যাবে; কিন্তু কখনো নিঃশেষ হবে না। যদি অবচেতন মন অবশিষ্টও না থাকে তাহলে সে জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেমন ইতিহাসে এমনতর কতিপয় জাতির ধ্বংসের অবস্থা জানা যায়।

মোট কথা এমনতর প্রত্যেকটি জীবন দর্শন যা মানুষের কোন এক বিশেষ দিককে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং অন্য দিক থেকে এ ব্যাপারে কোন খেয়াল করে না তা এক বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে এবং এ দর্শন অনুযায়ী জীবন যাপন কারীরাও ধ্বংস ও বিপর্যয়ের শিকার হবে।

মানুষের সুদৃঢ় স্বভাব

যে ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে মানবতা করুণ পরিণতি থেকে বেঁচে থাকে। ইসলাম মানুষের বিচিত্র স্বভাব প্রকৃতি, তার বিভিন্ন দিক ও প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত আছে। তার জৈবিক চাহিদা, বুদ্ধিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। মানুষের পরিপূর্ণ মানবিক সত্তায় স্বীকৃতি দিয়ে তার সুদৃঢ় স্বভাব প্রকৃতিকে সেই সরল সোজা পথেই পরিচালিত করে যা মূলত তার স্বভাব প্রকৃতি উপযোগী করেই সৃষ্ট করা হয়েছে। ফলে মানুষ যখন ইসলামী জীবন পদ্ধতির অনুসারে জীবনযাপন শুরু করে তখন তার জন্য দেহ, জ্ঞান ও আত্মার জন্য আলাদা আলাদা কোন বিধান দরকার হয় না এবং তার ব্যবহারিক জিন্দেগি ও বিভক্তির শিকার হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। বরং তার গোটা সত্তাই পরিপূর্ণ ভারসাম্য সহকারে সম্মিলিতভাবে সামনে এগিয়ে যায়। মোট কথা প্রকৃত সত্য হলো—আত্মা, বুদ্ধি ও শরীর মিলেই একটা পূর্ণাঙ্গ মানবীয় সত্তা গড়ে উঠে। বাস্তব ও কর্মজীবন ওতোপ্রতভাবে জড়িত থাকে। হতে পারে কখনো একটা দিক উদ্ভাসিত হয় তখন অন্য দিকটা কিছু সময়ের জন্য আড়ালে পড়ে যায় কিন্তু কখনো একেবারে শেষ হয়ে যায় না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের হাত প্রকাশ্যভাবে কাজ করে, নড়াচড়া করে জিনিসপত্র ধরে রাখে কিন্তু তার গোটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস নয়। বরং হাতের এ কাজের সম্পর্ক গোটা দেহ, রক্ত ও রসের সাথে সম্পৃক্ত। এক মুহূর্তের জন্যও যদি দেহ থেকে হাতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে হাতে আর জীবনের স্পন্দন থাকে না এবং তার কর্মক্ষমতা সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। এমনিভাবে মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের শক্তি ও অস্তিত্বের জন্য অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষী। একটা অঙ্গ অন্য অঙ্গ থেকে পৃথক মনে হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা পৃথক নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে পরস্পরে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত।

ইসলাম মানুষের গোটা দেহ ও সামগ্রিক সত্তার দিকে খেয়াল রেখে তার স্বভাব

এমনটা মনে হয়। প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা এই যে, মানুষের জৈবিক জীবন তার বুদ্ধিভিত্তিক ও রূহানী জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা তার বাস্তব অবস্থা থেকে পৃথক নয়। এমনকি তার চিন্তা চেতনা তার বাস্তব জীবনের প্রতিপক্ষও নয়। মোট কথা মানব সত্তার প্রকৃত হাকীকত এটাই। মানুষ যখন তার জৈবিক, বুদ্ধিভিত্তিক কিংবা রূহানী স্তর অতিক্রম করে তখন তার অস্তিত্বের একটা দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে বাকী দিকগুলো পর্দার আড়ালে চলে যায়। কিন্তু একে বারে শেষ হয়ে যায় না।

এতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক অস্তিত্ব খুবই চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। এটা কোন এক অবস্থায় বেশী দিন থাকে না। বরং স্বভাবের দাবী অনুযায়ী সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো একটা দিক সামনে আসে তো অন্য দিকটা পিছিয়ে যায়। কখনো মানব মনের একটা স্তর উদ্ভাসিত হয় তো অন্য স্তর স্থিমিত হয়ে যায়। কিন্তু তা মানব মন থেকে একেবারে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে না। অ্যামিবা (Amaeba) যেমন তার বাহ্যিক রূপ ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্তন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অ্যামিবাই থেকে যায়।

কখনো কোন দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করার ফলে যদি মানুষের কোন বিশেষ দিক বিজয়ী ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং অন্য দিকগুলো দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে তাহলে এ দৃষ্টিকোণের আওতাধীন বসবাসকারী জনগণের নিকট উল্লেখিত দিকই দৃষ্টিগোচর হবে এবং অন্যদিকগুলো অবদমিত হয়ে মনের অবচেতন স্তরে (Repressed) নেমে যাবে।[১] কিন্তু কখনও নিঃশেষ হয়ে যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন জীবন দর্শন যদি এটা প্রচার করে যে, মানুষের আদৌ কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নেই, নেই কোন ধর্ম বা খোদা। যা আছে তা হলো, মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক অস্তিত্ব ও চাহিদা, বস্তুগত উৎপাদন, উন্নয়ন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ জীবন দর্শনে বিশ্বাসী এবং তদনুযায়ী জেন্দেগী যাপনকারীদের বস্তুগত উন্নতি ও চাকাচিক্য খুবই উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হবে। কিন্তু তা আধ্যাত্মিক, বস্তুগত এবং চিন্তার জগত দারুণভাবে অবদমিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং প্রভাবহীন হয়ে

১.অবদমনের তাৎপর্য হলো সে সব জন্মগত ঝোঁক-প্রবণতা চেতনা মনের আঙ্গিনায় প্রকাশিত হওয়া অসামাজিক মনে হয় তা মনের অবচেতন স্তরে নেমে যাওয়া। এ থেকে জন্ম নেয় উন্নাসিকতা। আর মনের অবচেতন স্তরের এ সব কামনা বাসনা চেতন মনে সৃষ্টি করে নানারূপ অস্বাভাবিকতা। যেমন পিতামাতা কোন ছেলেকে বার বার তাগিদ করে ছোট বোনকে আদর স্নেহ করার জন্য এ ব্যপারে বকা ঝকাও করে। তা হলে সে প্রকাশ্যভাবে তো আদর স্নেহ শুরু করে দেবে কিন্তু তার ঈর্ষাকাতর অনুভূতি (Jealus Felling)তার মনের সচেতন স্তরে নেমে যাবে। বড় হবার পর ঈর্ষাকাতর অনুভূতিই অন্যকে বিরক্ত করা, সমালোচনায় উত্তেজিত হওয়া এবং স্বার্থপরতার মত বিভিন্ন উপসর্গে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং হতাশার কারণ হয়।

কোন কষ্ট দিতে চাইলে তার থেকে সে বাঁচতেও পারে না এবং আল্লাহর বিনা হুকুমে কোন ফায়দাও যে পেতে পারে না।

"এ সত্যকে ভাল করে জেনে নাও, যদি গোটা মানবজাতি তোমাকে কোন ফায়দা দিতে চায় তো সে তা পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ফায়দা আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ভাগ্যলিপিতে লিখে না দেন; আর সবাই মিলেও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তো সে তাও পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ক্ষতি তোমার ভাগ্যে লিখে না দেয়া হয়।" (তিরমিযি)

যাই হোক, আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারের উপর গভীর ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কারণেই গড়ে উঠে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উপর পরিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ত নির্ভরতা এবং তখন মানুষ নিজেকে আল্লাহর দেয়া নিয়তির হাতে সোপর্দ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকেই নিজের সন্তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে।*

"এটিই হচ্ছে সে আকীদা যা নবীপাক (সঃ)-এর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল এবং তিনি তাঁর গোটা সত্তাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করেছিলেন ও প্রতি সংকট সমস্যায় ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছিলেন। এই কারণেই দেখা যায় যে কোন কঠিন অবস্থাতেই তিনি ভেঙ্গে বা মুচড়ে পড়েননি, তা যত কঠিনই হোক না কেন, বরং আল্লাপাকের মর্জির নিকটই নিজেকে সোপর্দ করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছেন, আর যা কিছু দুঃখ-বেদনা এসেছে তা তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এর হাকীকত বলতে গিয়ে আল্লাহপাক বর্ণনা করেছেন,-

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. (البقرة : ٢١٦)

"আর হয়ত তোমরা এমন কোন জিনিষ অপছন্দ কর যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (বাকারা-২১৬)

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا . (النساء:١٩)

"আর হতে পারে এমন যে তোমরা কোন জিনিষ অপছন্দ করছ অথচ তার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা কল্যাণকর অনেক কিছু রেখে দিয়েছেন।" (নিসা-১৯)

---

* তবে, এই নির্ভরতা প্রাণপণ চেষ্টা করার পর হতে হবে। যেহেতু মানুষ তার ভাগ্যলিপিতে কি লেখা আছে তা জানে না, এজন্য সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে এবং তার বুঝ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে যাবে। ফল ভাল বা মন্দ যা-ই পাওয়া যাক না কেন, ফল লাভ করার পরেই সে মনকে বুঝ দেবে যে আমি তাই পেয়েছি যা আমার তকদীরে ছিল। সুতরাং চেষ্টা করার আগেই ভাগ্য-নির্ভর হয়ে যাওয়া চলবে না, যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই চেষ্টা করতে বলেছেন, ব্যাখ্যায় হাদীসে বলা হয়েছেঃ উট বেঁধে রেখে তাওয়াককুল কর, ছেড়ে দিয়ে নয়।" (অনুবাদক)

পবিত্র আল্লাহ্‌পাক সকল বিষয়ে অবগত এবং তিনিই যে কোন পরিণতির জন্য অবশ্যই কোন কার্যকারণ নির্দ্ধারিত করে রেখেছেন। আর তিনিই নিজ হিকমত ও ক্ষমতাবলে সেই পরিণতিতে উপনীত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এটা অকাট্য সত্য যে, মানুষ কোন জিনিষের মালিক নয়, আর সে কোন কাজের কারণে কোন পরিণতি ঘটাতে পারবে এ ক্ষমতা বা শক্তিও সে রাখে না। চূড়ান্তভাবে এ কথাও সে জানেন যে, মন্দ কি এবং কিসের মধ্যে রয়েছে আর ভাল কোথায় লুকিয়ে আছে। এজন্য এটা একান্ত জরুরী যে, মানুষকে জানতে হবে যে, আল্লাহ্‌পাকই একমাত্র সকল কাজের পরিকল্পনা নির্মাতা, তিনিই সবকিছু করতে সক্ষম এবং তিনি যা চান তা-ই করেন।

এভাবে ইসলামের প্রথম যুগে উপরে বর্ণিত আকীদা বিশ্বাসই ছিল মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস। এরই ভিত্তিতে তৎকালীন মুসলিম জনগণ নিজেদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছিল এবং নিজেদের সকল কাজকর্ম ও ত্যাগ-কুরবানী এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো এবং এরই ফলে তারা পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের অধিকারী হয়েছিল।

সত্যের প্রতি পূর্ণাঙ্গ ও অবিচল আস্থা (ঈমান)

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সত্য বিশ্বাস এভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এভাবে মুসলিম জনতা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার কারণেই তাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ নির্ভর হয়। 'আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন একথা মেনে নেয় বলেই যখন কোন কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তখন সে বিষয়ে মন খারাপ না করে তা তাকদীরে ছিল এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়েছে আর তিনি তার মঙ্গলের জন্যই ঐ পরিণতি দিয়েছেন·একথা মেনে নিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। এতে তারা কোন বিপদে মন খারাপ করে না বা বিচলিতও হয় না, আবার কোন খুশীর অবস্থায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে যা খুশী তা করে না।

জীবন সামগ্রী বা আয়-রোজগারের সংকট তাদেরকে বিচলিত করে না যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে, রুজির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা। অসুখ-বিসুখ, ভাল-মন্দ, মানুষের দেয়া দুঃখ-বেদনা এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ্ তায়ালা- একথা মানার কারণে তারা কোন অবস্থাতেই ঘাবড়িয়ে যায় না, যেহেতু এ সব কিছুই আল্লাহর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, এতে তাদের নিজেদের করার কিছুই নেই।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا - (المعارج : ٢١٩)

"মানুষকে বে-সবর (অধৈর্য) অবস্থায় পয়দা করা হয়েছে, মুসীবত এলে সে ঘাবড়ে যায় আর যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে কৃপণতা করতে থাকে।"

(মায়ারিজ-১৯-২১)

অর্থাৎ তার প্রকৃতির মধ্যেই, এই খাসলতগুলো, তার জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহপাক দিয়ে দিয়েছেন। এরপর এগুলো অতিক্রম করে, উদারতা, সহিষ্ণুতা ও অবিচলতা আনতে পারলেই পাওয়া যাবে ইহকাল ও পরকালের শান্তি। কুরআনে হাকীম ও নবী পাক (সঃ)-এর শিক্ষা থেকে যখন সে একথা জানতে পেরে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে তখনই আল্লাহপাক তাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ ঈমানের কারণেই তার মনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায় এবং কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করে। অবশ্য, একথার দ্বারা এ অর্থ নেয়া ঠিক হবে না যে, মানুষ যাবতীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতার উর্দ্ধে উঠে যেতে পারে, বরং এ হচ্ছে ঈমানের কারণে সমস্যারাজির মুকাবিলায় এক সার্বক্ষণিক জিহাদ, যার শিক্ষা নবী (সঃ) নিজেই দান করেছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকেই মুসলিম উম্মত এ শিক্ষা পেয়ে সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক জিহাদী জিন্দেগী যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল।

নবীপাক (সঃ)-এর যুগে মুসলিম উম্মত এই জিহাদ থেকে কখনো পিছপা হয়নি, বরং তাঁর মহান সংস্পর্শে থেকে উম্মতে মুসলিমা প্রকৃত এবং সঠিক শিক্ষা লাভ করেছিল। যার ফলে তারা জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি দিক ও বিভাগে নিজেদের উজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশ্বকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। জীবন যুদ্ধের এই সাফল্য এবং উন্নতি ও অগ্রগতির অগ্রযাত্রার মূলে ছিল আল্লাহ্র নিকট নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে সোপর্দ করে দেয়া। এই তাওয়াক্কুল আল্লাহর কারণেই ইচ্ছাশক্তি প্রখর হয় এবং অন্তরের দুর্বলতার কারণে শিরা-উপশিরার মধ্যে যে স্থবিরতা এবং পেরেশানী পয়দা হয় তা দূর হয়ে যায়। এই তাওয়াক্কুলের কারণে বিরোধী শক্তির তৎপরতার সৃষ্ট ভয়ভীতি এবং অপারগতার অনুভূতি খতম হয়ে যায়। কারণ মুমিন গভীরভাবে অনুভব করে যে যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনা এবং তাদের ফলাফল সবকিছুই আল্লাহর হাতে; সুতরাং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়ভীতি, অপরাগতা ইত্যাদির কোন প্রশ্ন আর থাকতে পারে না। বরং এই তাওয়াককুলের কারণে সংকল্প, শক্তি আবেগ ও দৃঢ়তা পয়দা হয়। আর এই সংকল্পের দৃঢ়তা, শক্তি সাহস ও আবেগ-অনুভূতির ফলে পৃথিবীতে যে তুলনাহীন মুসলিম জাতির অভ্যুদয় হয়েছে তার বীরত্বগাথা ও জিহাদী তৎপরতা ও নির্ভীক পদক্ষেপ ও মরণজয়ী অগ্রযাত্রার ঘটনাবলীতে পৃথিবীর ইতিহাস ভরপুর। এ কারণে সমগ্র দুনিয়ার অনাগত মানুষের জন্য আজও তারা উন্নতি ও কল্যাণের দিশারী হয়ে রয়েছে।

ইবাদত রূহানী উন্নতির সোপান ও এক প্রভাবপূর্ণ মাধ্যম

মুমিনের রূহানী তরক্কী আত্মিক উন্নতির জন্য সব থেকে প্রভাবপূর্ণ ট্রেনিং হচ্ছে সার্বক্ষণিক আনুগত্যবোধের সাথে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ইবাদত। বিশেষ করে ফরয ইবাদত বলতে যা আমরা বুঝি অর্থাৎ ইসলামের বুনিয়াদী কাজগুলো যথা নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আত্মাকে প্রশিক্ষণ দান। আর এই ইবাদতগুলোর দ্বারা কর্মময় বাস্তব জীবনের সংকট ও সমস্যারাজি, দেহ-মনের লাগামহীন চাহিদার কারণে যে শয়তানী প্ররোচনা পয়দা হয় তার মুকাবিলায় মানুষের মনের মধ্যে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হয়।

বিশেষ করে নামায হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল মধ্যমণি। আর এই নামাযের ব্যাপারে ইসলাম সর্বাধিক কড়াকড়ি* করেছে যথা, উল্লেখ করা যেতে পারে একজন মুসলমান নামাযের জন্য অজু করার সময় যখন হাত ধোয় তখন সে শুধু হাতের বহিরাবরণের ময়লাই ছাফ করে না, বরং ইতিপূর্বে তার হাত দুটি যে সব গুনাহ্ করেছে সেগুলোও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে এবং অজু করার সময় সে সচেতনভাবে এটা অনুভব করে যে, সে প্রকৃতপক্ষে অজুর মাধ্যমে বাহিরের ধুলাবালি পরিষ্কার করার সাথে সাথে হাতের দ্বারা কৃত গুনাহগুলোও ধুয়ে-মুছে ফেলছে; এতটুকুই শুধু নয়, বরং সে নিজ প্রভু-পরওয়ারদিগারের দরবারে তওবা-ইস্তেগফার করে ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহ সুব্হানুহু ওয়া তায়ালার দিকে সর্বান্তকরণে রুজু হয়।

মুমিন যখন অজু করতে গিয়ে নিজ চেহারা ধোয় তখন চেহারার মধ্যে অবস্থিত চোখ দুটি পরিষ্কার করতে গিয়ে চোখ দ্বারা যে সব গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো থেকেও পবিত্রতা লাভ করতে চায় এবং ঐ সকল গুনাহের কারণে পরনিন্দা হয়ে নিজ পরওয়ারদিগারের কাছে অবনত হয়।

এই ভাবে অজু করনেওয়ালা মুসলমান নিজ হাতদু'টির কবজা, চেহারা ও পা দু'টি ধোয়, তখন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক ময়লাগুলো ধুয়ে মুছে ফেলার সাথে সাথে অন্তরের কলুষ কালিমাগুলোও ধুয়ে মুছে ফেলতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃত গুনাহ্-খাতাগুলো থেকে নাজাত পেতে চায় এবং এর জন্য সে মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। আর এভাবে প্রতি অজুর দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার সাথে দেহমনের পবিত্রতালাভও হতে থাকে। নবীপাক (সঃ) অজুর এই ফজীলাত ও উপকারিতা সম্পর্কে বহুবার বহু উপদেশ দান করেছেন।

---

* কুরআনে কারীমের ৮২টি স্থানে নামাযের নির্দেশ এসেছে। হাদীসে বলা হয়েছে, নামায দ্বীন-ইসলামের খুটি, যে একে দাঁড় করালো সে দ্বীনের ঘরকে দাঁড় করলো আর যে একে ছেড়ে দিল, সে দ্বীনের ঘরকেই ভেঙ্গে দিল।

সেসকল তাকীদ (গুরুত্বরোপ) ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অজুর এই হাকীকাত মুমিনের অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেয়া এবং মুসলমানগণ একাজকে নিছক একটি অভ্যাস বা অনুষ্ঠান হিসেবেই যেন পালন না করে, কারণ তাতে এই কাজের প্রতি বেপরওয়াভাব আন্তরিকতাহীনতা ও একাজটি বোধগম্যহীন এক আনুষ্ঠানিক কাজ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করবে এবং যেনতেন করে মানুষ অজু সেরে নামায আদায় করে নেবে। বরং এটা হতে হবে যে, একজন মুসলিম পরিপূর্ণ চেতনা এবং পুরোপুরি মনোযোগ সহকারে, সম্পূর্ণ বিনয়াবনতভাবে, নম্রতার সাথে ও সুন্দর নিয়ত নিয়ে অজু করবে এবং আল্লাহ জাল্লাশানুহুর দরবারে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে। এই পাক-পবিত্র আলোকময় মুহূর্তগুলোতে চিরস্থায়ী ও চিরন্তন মাওলা পাকের সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করবে।

অজুর উদ্দেশ্য শুধু এটাই নয় যে, মুমিন শুধু তার স্পর্শ করার অঙ্গগুলো ও বাহ্যিক দিককেই পরিষ্কার রাখবে আর সে একাজের অন্তর্নিহিত অর্থপূর্ণ দিককে উপেক্ষা করবে; কারণ তার অর্থপূর্ণ ও অভ্যন্তরীণ দিককে উপেক্ষা করলেতো সে কাজের সকল ফায়দাই খতম হয়ে যাবে এবং তার সকল অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে। অজুর আসল প্রাণই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়াই সব নয়। অজুর দ্বারা মুমিন শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা লাভ করুক তার জন্য আল্লাহপাক নামাযের পূর্ব-প্রস্তুতিস্বরূপ অজু করার হুকুম দিয়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে সিজদাবনত হওয়ার পূর্বে মুমিনকে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এমন না হয় যে, আল্লাহর দরবারে বান্দাহ্ অপবিত্র আত্মা নিয়ে হাজির হবে এবং তার মন মগজ নানা প্রকার জাহেলী মতবাদের জঞ্জালে পরিপূর্ণ থাকবে; বরং আল্লাহর হুকুমে অজুর অনুষ্ঠান দ্বারা আন্তরিকভাবে এবং সর্বান্তকরণে মুনিবের দরবারে হাজির হওয়ার যে প্রস্তুতি আসে তাতে অন্য কারও আনুগত্য করার জাহেলিয়াতকে অস্বীকার করা হয়। বরং মুমিন অজু করে আল্লাহর দরবারে যখন হাজির হবে তখন তার আত্মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে হবে এবং পার্থিব যাবতীয় আবর্জনা থেকে মুক্ত হতে হবে, তা সে চিন্তাগত বা বস্তুগত জীবনের কোন দিক থেকে হোক না কেন। এভাবে শারীরিক, আত্মিক ও বস্তুগত জিনিষটির যে কোন অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র হয়ে নিজ মওলার দরবারে হাজির হয়ে সে মওলাপাকের ক্ষমতা রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করতে সক্ষম হবে এবং ঐ সময় পূত-পবিত্র মন নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শিক্ষাসমূহের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যেন মানুষ শুধু বাহ্যিক ও বস্তুগত জিনিষকেই গুরুত্ব না দেয়, বরং অভ্যন্তরীণ সংস্কার সংশোধন দ্বারা নিজের জীবনকে সব দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রেখে মানবতার খিদমতের

মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে পারে। এমন না হয় যে, সে পৃথিবীর বিভিন্ন চাকচিক্যময় জিনিষের মোহে জনগণের বৃহত্তর খিদমতের মূল কাজকেই ভুলে যাবে। তার কর্তব্য হবে, যে কোন জিনিষের গভীরে তলিয়ে দেখা এবং জীবনের সামষ্টিক ক্ষেত্রে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা। এমনই সচেতন ও প্রশস্ত মন নিয়ে মানুষ নামাযে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর অসীম কুদরতের মধ্যে প্রবেশ করবে, আর তখনই সে অনুভব করবে যে, তার মনের সংকীর্ণ দুয়ারগুলো এক এক করে খুলে যাচ্ছে এবং সে ধীরে ধীরে আঁচ করতে পারবে যে বস্তুগত দুনিয়ার সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে অসীম সত্তার সংগে সম্পর্ক স্থাপন করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহপাকের নূরের সেই জগতে পৌঁছে যাচ্ছে যেখানে কোন সীমা বা শেষ সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু ঐ নূরের জগতে বিচরণ শুধুমাত্র আল্লাহর আলোকে আলোকিত ও পবিত্র আত্মাই করতে পারে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ «ج» مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ - اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ «ج» نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ «ج» يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ «ج»

(النور : ٣٥)-

"আল্লাহপাক হচ্ছেন আসমান-যমীন-এর নূর। (সৃষ্টিজগতের মধ্যে) তাঁর নূরের উদাহরণ হলো, যেমন একটি তাকে চেরাগ রক্ষিত আছে, সে চেরাগ রয়েছে একটি চেরাগ-দানীতে আর চেরাগদানীটি হচ্ছে যেন একটি ঝিকিমিকি তারা। এই চেরাগকে এক মুবারক ও পবিত্র যায়তুন তেল দ্বারা জ্বালানো হয়েছে যার আলো পূর্ব বা পশ্চিমে কোন দিকেই ঝুঁকে পড়ছে না, যার তেল আগুনের স্পর্শ না পেয়েও নিজে নিজেই জ্বলে উঠে। এভাবে এক আলোর উপর অন্য আলো পড়ায় সেই আলোর উজ্জ্বলতা সীমাহীন তীব্রতা লাভ করেছে। এমনই স্নিগ্ধ নূরের দিকে আল্লাহ তায়ালা যাকে খুশী তাকে এগিয়ে নিয়ে যান।" (নূর-৩৫)

নামায বান্দাহকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয় এবং এটা এমনই এক চমৎকার জিনিস যার তুলনা সৃষ্টির অন্য কোন জিনিষের সাথে করা যায় না। একমাত্র নামাযের মাধ্যমেই মানুষের আত্মা আসমানের সুমহান উচ্চতায় বিচরণ করে। অথচ ঐ সময় তার মাটির দেহ মাটিতেই অবস্থান করতে থাকে। নামাযের অবস্থায় মুমিন স্বয়ং আল্লাহর আলো থেকেই আলো পেতে থাকে এবং বস্তুগত দুনিয়ার কিনারা ভেদ করে উর্দ্ধ-জগতের কিনারায়

পৌঁছে যায়। এ সময় তার আত্মা চিরন্তন ও চিরসত্য মওলাপাকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (ابقرة : ۱۳۸)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা তেমনই বাধ্যতামূলক (ফরজ) করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া পরহেজগারী ইখ্‌তিয়ার করে (বাছ-বিচার) করে চলতে পার!"

(বাকারা-১৩৮)

অর্থাৎ রোজার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে; তাক্বওয়া বা বাছ-বিচার করে চলার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং একাজ আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার আনুগত্য ও তাঁর হুকুম তামিল করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মানুষ শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন চাহিদা থেকে পরহেজ করবে যাতে করে তার রোজা শুধুমাত্র খানা-পিনা ত্যাগ করার জিনিস না হয়; বরং তা মনের এক প্রশিক্ষণে পরিণত হয় এবং রোজা রাখার সময় তার মন আল্লাহপাকের দিকে রুজু হয়ে যায়, তার অন্তরের মধ্যে যে সব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা আসে তা যেন পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তার দৃষ্টি হয় সংযত। এইভাবে রোজা একজন মুমিন-এর অন্তরাত্মার মধ্যে উর্দ্ধ আকাশ থেকে এক পবিত্র আলো দান করে।

একইভাবে যাকাত-এর উদ্দেশ্যও হচ্ছে মানুষের অন্তরকে কৃপণতার ব্যাধি থেকে মুক্ত করা। আত্মাকে খোশ-খেয়াল বা নিজস্ব মতে চলা থেকে বিরত রাখা, গোটা মানবজাতির সাথে ভ্রাতৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং এমন ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা যে, তার মধ্যে বিরাজমান প্রভুত্বের মনোভাব দমে যায়; যেহেতু গোটা মানবজাতি এক বংশের লোকের মত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বংশের মালিকানাধীন সহায়সম্পত্তির মালিক ঐ বংশের প্রত্যেক ব্যক্তিই হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামত ও তাঁর দেয়া যা কিছু রিজিক আসে তার মধ্যে পরিবারের সবার সমান অংশিদারিত্ব থাকে।

হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহপাকের এরশাদঃ

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ. ذَالِكَ وَ مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَ اُحِلَّت لَكُمُ الاَنعَمُ الاَّ مَا يُتلى عَلَيكُم فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الاَوثَانِ وَاجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيرَ مُشرِكِينَ بِهِ وَ مَن يُّشرِك بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخطَفُهُ الطَّيرُ اَو تَهوِى بِهِ الرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ. ذَالِكَ وَ مَن يُّعَظِّم شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِن تَقوَى الْقُلُوبِ «ط» لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ اِلى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى البَيتِ العَتِيقِ . وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلنَا مَنسَكًا لِيَذكُرُوا اسمَ اللّٰهِ عَلي مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الاَنعَامِ فَالٰهُكُم اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَه اَسلِمُوا وَ بَشِّرِ المُخبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَت قُلُوبُهُم وَالصَّابِرِينَ عَلى مَا اَصَابَهُم وَ المُقِيمِى الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقنَاهُم يُنفِقُونَ . (الحج ك ٢٧ - ٣٥)

"আর জনগণকে হজ্জ করার জন্য সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দাও যাতে করে তারা তোমার নিকট প্রত্যেক দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে এবং উটে চড়ে এসে এখানে তাদের লাভজনক বস্তুগুলো দেখতে পায় এবং নির্দিষ্ট কিছু দিনে তারা তখন তাদের প্রদত্ত জানোয়ারগুলোর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে (ও জবাই করতে পারে)। এরপর ঐ জানোয়ারগুলোর গোশত থেকে নিজেরাও যেন খায় এবং অভাবগ্রস্ত ও গরীব লোকদেরকেও যেন খাওয়ায়। তারপর তারা যেন তাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতার আবর্জনাগুলো ধুয়ে মুছে ফেলে দেয় এবং নিজেদের মান্নতগুলো আদায় করে আর এই সুপ্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে (এটাই ছিল কা'বাঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য)। আর যে কেউ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত মর্যাদাপূর্ণ বস্তুগুলোর মর্যাদা রক্ষা করবে সে তার প্রভুর নিকট থেকে দেয়া বস্তু থেকে কল্যাণের অধিকারী হবে। আর তোমাদের জন্য বর্ণিত কিছু জীব-জানোয়ার বাদে বাকী পশুগুলো হালাল করা হয়েছে। সুতরাং, মূর্তিপূজা-রূপ অপবিত্রতা থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাক, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই খালেসভাবে নিজেদেরকে সোর্পদ কর। খবরদার আল্লাহর শরীক বানানেওয়ালা হয়ো না। আর যে কোন লোক আল্লাহর সাথে শরীক বানাবে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে আকাশ থেকে পড়ে গিয়েছে এবং তাকে মাটিতে পড়ার আগেই কোন পাখীতে ছো মেরে নিয়ে গিয়েছে অথবা তীব্র হাওয়া তাকে প্রবাহিত করে জনপদ

থেকে দূরে কোন স্থানে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। (এ ব্যক্তি যেমন কোন সাহায্যকারী-বিহীন অবস্থায় পড়ে অসহায় ও উপায়হীন হয়ে যায় একজন মুশরিকও এভাবে উপায়হীন হয়ে যাবে।) সঠিক অবস্থা এটাই। (এ অবস্থা ভালো করে বুঝে নাও) এবং আল্লাহর নির্দ্ধারিত মর্যাদাপূর্ণ জিনিষগুলোর এহতেরাম যে করে সে অবশ্যই তা এইজন্য করে যে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে এবং তার ভয়েই সে বাছ-বিচার করে চলতে চায়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ মান্নতের পশু ব্যবহার করার অধিকার তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তারপর তাদেরকে কুরবানী করতে হবে আল্লাহপাকের সেই পুরাতন ঘরের কাছে।

প্রত্যেক নবীর উম্মাতের জন্য কুরবানী করার পৃথক পৃথক নিয়ম দিয়েছি যাতে তারা তাদেরকে প্রদত্ত পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে। (এ সমস্ত নিয়ম প্রথার মধ্যে মৌলিক উদ্দেশ্য একই) এটা মানতেই হবে যে, তোমাদের সবার প্রভু পরওয়ারদিগার একজনই এবং তারই অনুগত হও। হে নবী, ঐ বিনয়পূর্ণ জীবন যাপন করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে কোন মুসীবতই তাদের উপর আসুক না কেন তাতে তারা বিচলিত হয় না। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী হয় এবং আমি (মহান আল্লাহ) যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি তার থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) পথে তারা খরচ করে।" (হজ্জ-২৭-৩৫)

হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির পবিত্র স্থানগুলোর জিয়ারাত ও হজ্জের অন্যান্য ফরযগুলো আদায় করাতে বাস্তব কর্ম-জীবনে বিস্ময়কর ও অতুলনীয় সুফল দেখতে পায় এবং এমন এক অদ্ভুত পরিবর্তন তাদের জীবনে সূচিত হয় যে, তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তাদের জীবনে বস্তুগত আকর্ষণ এবং শারীরিক চাহিদার দংশন নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর দিকে তাদের মন-মগজ ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি ও ক্ষমা পাওয়ার জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে উঠে।

উপরন্তু যে যে এলাকায় আল্লাহর রাসূল তশরীফ নিয়ে গিয়েছেন বা অতিক্রম করেছেন সকল জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা সেখানে নামায পড়ে এবং ইবাদাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। আর যে সকল স্থানে অবস্থানকালে অথবা অতিক্রমকালে অহী নাজিল হয়েছে, যেখানে নবী (সঃ) যুদ্ধ-জিহাদ করেছেন, বিজয়ী হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সবর করেছেন সে সকল এলাকা অতিক্রম করার সময় হাজীদের মনে এক অদ্ভুত আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয়। পার্থিব যাবতীয় আবিলতা থেকে তাদের মন-মগজ ও ধ্যানধারণা মুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর নূর তাদের সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকে যার ফলে তাদের অনুভূতির পর্দায় আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব যেন মূর্ত হয়ে উঠে।

ইসলামে ইবাদাতের অর্থ ও তাৎপর্য

উপরের আলোচনায়, ইসলামে ইবাদাতের যে ধ্যান-ধারণা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে কিছু কথা এসেছে। কিন্তু, ঐ কয়েকটি কাজের মধ্যেই ইসলাম ইবাদাতকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, আসলেই ইবাদাত ঐ কয়েকটি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামে ইবাদাতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রকৃত অর্থে ইবাদাত গোটা জিন্দেগীতে পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে বা তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যা কিছু করে এবং যা কিছু পরিত্যাগ করে তা সবই ইবাদাত। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে মনের নিভৃত কোণে যে অনুভূতি বা চিন্তা আসে এবং তাঁর ভয়েতেই যে খারাপ চিন্তাগুলোকে দাবিয়ে দেয় তা সবই ইবাদাতে পরিণত হয়ে যায়। রাত-দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখনই মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ বা চিন্তা আসে তখনই তা ইবাদাতে গণ্য হয়ে যায় এবং এভাবে মানুষের গোটা জীবনই ইবাদাতের জীবন হয়ে যায়। জীবনের যে কোন দিক ও বিভাগে মানুষ যা কিছু করে তা যদি আল্লাহপাকের হুকুম অনুযায়ী হয় তখন তা সবই ইবাদাত হয়ে যায়।

এ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে ইবাদাতের অর্থ আল্লাহর সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক আর এই সম্পর্কের কারণে রূহ বা আত্মার সংগে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক চলতে থাকে। এই সম্পর্কের কারণেই বান্দাহর মধ্যে মুহাব্বত, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া-পরহেজগারী সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কের কারণেই মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এবং এর ফলে জীবনে অগণিত সুফল দেখা দেয় যা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়।

ঐ সকল সুফলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানুষ ও সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে মুহাব্বাত ও দরদের সম্পর্ক গড়ে তোলা যা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও সজীবরূপে প্রকাশ পেতে পারে। এর কারণ মানুষ নিজেও তো ঐ সৃষ্টিকর্তারই বিশাল সৃষ্টি মল্লিকার একটি সুন্দর কলি যিনি গোটা জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সব কিছুর সাথে সম্পর্কের এই ঘনিষ্ঠতা এবং তার তীব্র চেতনা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে, নৈকট্য সৃষ্টি করে এবং এক অন্তরের সাথে আর এক অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন করে। এজন্য অবশ্যই মানুষের মধ্যে অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কেরও চেতনাবোধ পয়দা হওয়া প্রয়োজন।

কুরআনে করীম এই সম্পর্কে ও পারস্পরিক বন্ধনের চেতনাকে বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেঃ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ.

(فصلت : ١١)—

সবার সাথে সূক্ষ্ম ও কোমল সম্পর্ক রাখতে গিয়ে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটাই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করার কারণে গড়ে উঠে। জীবনজগতের সাথে এ কোমল সম্পর্কের অভাব তার মধ্যে বিষের মত চলাচল করে তার দেহ-মনকে বিষাক্ত করে তোলে। সুতরাং এ অভাব দূর করে, প্রাণী হওয়ার কারণে সকল প্রাণীর সাথে অবশ্যই তার সুকোমল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। খাদ্যে বিষের মিশ্রণে যেমন উত্তম খাদ্য দূষিত, অখাদ্য এবং ধ্বংসকারী হয়ে যায়, তেমনি মুহাব্বতের অভাবে মানুষের মনমগজ তার নিজের জন্য সৃষ্টিকুলের বিষাক্ত ও ধ্বংসকারী হয়ে যায়। মুহাব্বতই হচ্ছে আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ও মানবাত্মাকে ফুলের মত সুরভিত করে মাটির তৈরি এই মানবাত্মাকে ফেরেশতাতুল্য করার জন্য অতি উজ্জ্বল এক মাধ্যম। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন-বিধান যা কুরআনের মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে মানুষকে এই বৃহত্তর মুহাব্বত গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী নীতি-নৈতিকতার ধারক ও বাহক হওয়ার কারণে যে মানুষ প্রাণিজগতের সবার সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে সে তার সম আদর্শের অধিকারী মুসলমানকে অবশ্যই ভালবাসবে এবং তার ভালবাসা থেকে ঐ সকল মানুষও বঞ্চিত হবে না যারা নিশিদিন তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য নানা প্রকার জল্পনা কল্পনায় ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার সার্বক্ষণিক ইবাদাতের বন্ধনে আবদ্ধ ও সদা-সর্বদা এবং স্থায়ীভাবে তাঁর সন্তুষ্টি-প্রয়াসী আল্লাহর যে বান্দাহ তার চিন্তা চেতনার গভীরে অপর যে কোন মানুষের জন্য দরদ মুহাব্বতের অনুভূতি থাকবেই এই মানবতাকে লালন করাই তো ইসলামের মূল কাজ। তবে এ আবেগ অনুভূতি আল্লাহর বন্দেগী ও রাসূলের আনুগত্য করার মাধ্যমে স্থায়ী হয়। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সবার সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে, সে সৃষ্টজীব হিসাবে অপর মানুষকেও বাবা আদম ও মা হাওয়ার সন্তান বলেই জানে এবং তারা আসলে 'সবাই ভাই ভাই' একথা স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সত্য যে, সকল মানুষই মাটির তৈরী এবং সবাইকে মৃত্যুর পরে আল্লার কাছেই ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টিতত্ত্বের এই যে ধারা এই ধারা অনুসারে প্রত্যেক মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই, আর এই কারণেই সকল মানুষকে আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে।

মানবাত্মার একাত্মতার এই অনুভূতি থেকেই মানুষের জন্য মানুষের এ মুহাব্বত ও মানুষে মানুষে এক অনাবিল সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর ইসলাম তার মন-মোহিনী হেদায়েত দ্বারা এ সম্পর্ককে আরও মজবুত ও গভীর বানায়। এমনকি একজন মুসলমানের কাছে এ সম্পর্ক তার ঈমান-আকীদার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

মানুষের অন্তরের গভীরে বিরাজমান এই মৌলিক চেতনা ও চিন্তার ভিত্তিতেই মন্দ ও অপ্রিয় কাজ বা ব্যবহারগুলো পরিত্যাজ্য বলেই স্বাভাবিকভাবে মনে হয়। সুতরাং শান্তিই যে মানুষের মূল বাঞ্ছিত ও কাম্য বস্তু তা সাধারণভাবে সকল মানুষই মনে করে ও বুঝে। এবং যুদ্ধ ও মানুষে মানুষে স্বার্থের হানাহানি এটা কোন স্থায়ী জিনিষ নয়, বরং এটাকে সাময়িক এবং অবাঞ্ছিত এক পরিস্থিতি বলে মানুষ গ্রহণ করে তা যত দীর্ঘ ও স্থায়ী এবং সীমাহীন দুঃখ দুর্দশাই এই পরিস্থিতি বয়ে নিয়ে আসুক না কেন। এ সব কিছু সত্ত্বেও মানুষে মানুষে সম্পর্কের অনুভূতি থাকবেই, হিংসা-বিদ্বেষ যে মানবতা নয় তা তারা গভীরভাবে অনুধাবন করে, সবাই তারা মন্দকে মন্দই মনে করে এবং সবাই এ বিষয়ে আশা পোষণ করে যে, মানুষ এক সময় না এক সময় ভাল পথ ধরবে, মানবতার কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করবে এবং অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় ব্যবহার করা থেকে ফিরে আসবে।

কিন্তু এমন সময় যদি এসেই যায় যে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের এই চেতনাটুকুও থাকবে না এবং তা পুনরুদ্ধারের আশাও খতম হয়ে যাবে। অন্যায়, অনাচার, অবিচার, মারামারি-কাটাকাটি স্বার্থের হানাহানি ও প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে বংশ পরম্পরানুক্রমে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকবে, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার এই যুদ্ধ বিজয়ী দল পরাজিত দলের সংগে জংলী জীব জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে না। বরং সেখানে বিজয়ী শক্তির মধ্যে সুপ্ত মানবতা তাদের নিজেদের অজান্তেই জেগে উঠবে, যদিও পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবতা সাড়া দিয়েছে ইসলাম এই মানবতা বোধকেই সঠিকভাবে জাগিয়ে তুলতে চায়।

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) শত্রুদের অনুকরণে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের অংগ প্রত্যংগ কাটতে নিষেধ করেছেন এবং এই নিষ্ঠুর প্রবণতাকে দমন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি এরশাদ করেছেনঃ

"আল্লাহ্ তায়ালা সকল ব্যাপারেই এহ্সান করতে বলেছেন, এমনকি শত্রুর সংগে ব্যবহারের ব্যাপারেও। কোন শত্রুকে হত্যা করার প্রয়োজন হলেও এহসানের সাথে এ কাজ সম্পন্ন করো। কষ্ট দিয়ে বা মানসিক নির্যাতন করে কাউকে হত্যা করোনা, আগুনে পুড়িয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করো না।"

আরও এরশাদ করেছেনঃ "বন্দীদের সংগে সদ্ব্যবহার করো।"

তিনি নিজের জাতির ঐ সকল লোকদের জন্য এক হৃদয় নিংড়ানো ভাষায় দোয়া করেছেন যারা তাঁকে কষ্ট দিতে গিয়ে সর্বপ্রকার হিংস্রতার আশ্রয় নিয়েছিল এবং যত রকমের বাড়াবাড়ি করতে পারত সবই করেছিল। তার দোয়ার ভাষা ছিলঃ

"হে আল্লাহ! আমার জাতির এ সকল লোকদের মাফ করে দিন, কারণ তারা তো জানে না (যে তারা ভুল করছে)।"

মুসলমানগণ প্রত্যেকটি যুদ্ধে এই চেতনা এবং তদনুযায়ী কাজ বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। এমনকি রোম ও খৃষ্টান জগতের সংগে ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হলে তাদের চরম বিশ্বাসঘাকতা ও অতীতের সর্বপ্রকার চুক্তিভংগ, অহংকার এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মুসলমানদের গণহত্যা করে হাউজ রক্তে ভরে দেয়ার মত চরম নৃশংসতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাদের সংগে মুসলিমগণ দ্বীন ইসলামের নির্দেশমত পরম মানবতাপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন এবং দুশমনদের অনুকরণে তাদের অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

এই পবিত্র ও উন্নত মনের অনুভূতি ও চেতনাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে একটি মনোরম এবং সুন্দর জীবন গড়ে তোলার চাবিকাঠি ছিল। আল্লাহর সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ইবাদাত ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাতের পাবন্দী করার ফলেই এই মানবতা ও সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

যদিও মানব নির্মিত সংস্কারধর্মী যে কোন আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ও মানবতার বিকাশ সাধন ও জনগণের কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সম্পর্ক না থাকায় সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া বাস্তবে অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হয় না। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অতীতের বহু ঘটনায় দেখা গিয়েছে যে, ঐ সংস্কারবাদীরা তাদের প্রচারিত মানবতা প্রদর্শনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বরং প্রকৃত সত্য কথা এই যে, ঐ সব উন্নত চিন্তা ও আদর্শের বাণী ও সুন্দর সুন্দর কথা কল্পনা-বিলাস ও মিথ্যা স্বপ্ন হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, গান্ধীর মানবতাবাদী ধ্বনির কথাই নিন, যখন তাঁর বড় বড় বুলি ও দার্শনিক চিন্তাধারা বাস্তবের ছোঁয়াচ পেল এবং মুসলমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধল তখন দেখা গেল উগ্রবাদী হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ও নিষ্ঠুর ভৌগলিক জাতীয়তাবাদিতার ছত্রচ্ছায়ায় সব রকমের নীতি নৈতিকতা, মানবতা ও আইনকানুন লংঘন করে মুসলিম নিধনে তৎপর হয়ে উঠল। সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই চিন্তা করুন, এর প্রবক্তারা ১৯৪৮ সালে আরব জাহানের উপর ইসরাঈলী দখলদারীত্বের প্রশ্নে কার্যতঃ সমর্থন ও সাহায্য যোগাল। অপরদিকে আলজিরিয়াতে ফরাসীদের জুলুম-নির্যাতনকে তারা কার্যত সমর্থন দিল (অথচ নীতিগতভাবে সমাজতন্ত্র গোটা দুনিয়ার মজলুমদের পৃষ্ঠপোষক ও উদ্ধারকারী হওয়ার দাবীদার)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাতের ফায়দাসমূহ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদাত করাতে বাস্তবে যে ফায়দা পাওয়া যায় তা হচ্ছে মানুষ শারীরিক চাহিদাসমূহকে দমন করে বস্তুগত জিনিসের চাপ সহ্য করার শক্তি অর্জন করে। এটা নিঃসন্দেহে অতি সত্য কথা যে, শারীরিক চাহিদা আল্লাহ্ পাকেরই দান এবং এ কারণে তা পূরণ করারও প্রয়োজন রয়েছে, তা কোন অপবিত্র বা বাজে কোন খাহেশ নয় যে, তাকে দাবিয়েই দিতে হবে; কিন্তু তাই বলে একেবারে জৈবিক চাহিদার গোলাম হয়ে যেতে পারে এবং দেহ যখন যে জিনিসের দাবী করবে তা পেতেই হবে এবং তা পাওয়ার জন্য একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে একবারে সীমাছাড়া না হয়ে যেতে হয় তার জন্য অবশ্য সজাগ থেকে নিজ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে-সেটাই কাম্য-সেখানেই মানুষের মর্যাদার পরিচয়। এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই মানুষ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

অপরদিকে যদি এই শারীরিক চাহিদার বশীভূত হয়ে মানুষ যখন যা দিলে চায় তাই করতে শুরু করে তখন এ চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে। অদম্য চাওয়ার ও পাওয়ার ক্ষুধা তাকে গ্রাস করে ফেলবে এবং জাহান্নামের আগুন যেমন করে বলবে هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ "আরও আরও আছে নাকি" এই স্তরে পৌঁছে দেব। তার এই সীমাহীন চাহিদা কোনদিন মিটবে না, কেউ মিটাতে পারবে না, কারো পক্ষে (এই দুনিয়ায়) মিটানো সম্ভবও নয়।

এই কারণে ইসলাম না এই চাহিদাকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয় যে, তাকে নিয়ে রসাতলে ডুবাবে না একে এমনভাবে দাবিয়ে দেবে যে, তাকে দুনিয়ার সর্বপ্রকার আরাম আয়েশ থেকে বঞ্চিত করবে, এ ধরনের অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম কোন নীতিতে ইসলাম বিশ্বাস করে না। বরং ইসলাম চায় মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত শারীরিক ও মানসিক চাহিদা এমন এক সীমার মধ্যে থেকে মিটাক যাতে অপর কারো কোন ক্ষতি না হয় বা হক নষ্ট হতে না পারে। এভাবে ইসলাম দেহমনের চাহিদার নিবৃত্তির প্রশ্নে ভারসাম্যপূর্ণ এমন এক নীতি অবলম্বন করে যার বিকল্প বা যার থেকে সুন্দর কোন ব্যবস্থা মানুষের পক্ষে প্রণয়ন সম্ভব নয়। এই নীতি অবলম্বনকারীগণ দেহ-মনে যে প্রশান্তি পায় এবং নিজেকে এত হাল্‌কা বোধ করে যেন সে মুক্ত আকাশের মধ্যে বিচরণশীল এক স্বচ্ছন্দ গ্রহ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদাতের কারণে মানুষ বস্তুগত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। নিজেই বস্তুর গোলাম না হয়ে বরং বস্তুকে গোলাম বানিয়ে আল্লাহ তায়লার হুকুম মত নিজের কাজে লাগায়। আর এটা সর্ববাদীসম্মত কথা যে, সারা বিশ্বের যিনি স্রষ্টা এবং যিনি এই দৃশ্যমান বস্তুজগতের পরিচালক তিনি যে কোন বস্তু থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তির অধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে

তার শক্তির মুকাবিলায় বস্তুশক্তি এক কাণাকড়ির মূল্যও রাখে না। একথা জানা ও মানার পর কেউ যদি পার্থিব কোন শক্তির অনুগত বা পূজারী হয়ে যায় তবে তার জীবনে হীনতা ও দীনতা ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না।

বস্তুশক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্য দুটি হতে পারেঃ এক, আল্লাহ্‌পাকের দেয়া নির্দেশ অনুসারে হতে পারে অথবা স্বাধীনভাবেও তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালার দেয়া হেদায়েত অনুসারে বস্তুশক্তিকে কাজে লাগানোই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে তার উৎকর্ষের জন্য প্রচেষ্টা চালানোকে মুসলিমগণ ঈমানী দায়িত্ব মনে করবে। যেহেতু সেটাকে হক বলে জানবে এবং তার পক্ষে যে কোন পরিশ্রমকে তারা ইবাদাত বলে গণ্য করবে। অপরদিকে যদি আল্লাহর হেদায়াতের পরওয়া না করে নিজ খেয়াল খুশী মত কেউ ব্যবহার করে তাহলে হয়ত তার দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ উদ্ধার হবে কিন্তু তা মানবজাতির জন্য সাধারণভাবে ক্ষতিকর হবে; অতএব তা প্রতিরোধ করাকে মুসলমানগণ জিহাদ হিসাবে গ্রহণ করবে এবং সাধ্যমত তার বিরোধিতা করবে।

সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আপোষের কোন ফর্মুলাই সঠিক হতে পারে না। সত্য আপোষহীনভাবে মিথ্যার বিরুদ্ধে তাকে উৎখাত করার জন্য সংগ্রাম করে যাবে, আর মিথ্যাও সহজে ময়দান ছেড়ে দেবে না বরং সে সত্যের উপর বিজয়ী হবার জন্য তার শেষ হাতিয়ারটুকুকেও কাজে লাগাবে। সুতরাং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। সত্য সংগ্রামীগণ আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও অনড় মনোবল নিয়ে কাজ করতে থাকলেই তবে আল্লাহপাকের সাহায্য আসবে। এ জিহাদ চালাতে গিয়ে আল্লাহর নির্দ্ধারিত নিয়ম-নীতিকেই তারা নিজ নীতি বলে মেনে নেবে। আর এই কারণেই তাদের সকল তৎপরতা জিহাদ বলে গণ্য হবে। এ জিহাদ হবে মর্যাদাপূর্ণ। এতে হীনতা বা দুর্বলতার কোন অনুভূতি থাকবে না, থাকতে পারে না।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

(آل عمران : ١٣٩)-

"মনভাঙ্গা হয়ো না এবং দুঃখও করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি (প্রকৃতপক্ষে) তোমরা মুমিন হও।)" (আলে-ইমরান ১৩৯)

মুমিন বিশ্বাস করে যে, সত্যের শক্তি আপাত দৃষ্টিতে বস্তুশক্তির দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে আজকের দুনিয়ায় কম হলেও সত্যই উত্তম এবং বস্তুশক্তির ভূমিকায় সর্বদা শক্তিশালী; এমনকি যদি কোন সময়ে, কোন সত্যের ধারক বাহকরা প্রদমিত অবস্থায় আছে বলে দেখা যায় বা কোন জিহাদে পরাজিতও হয়ে যায় তবুও সত্যই চির সঠিক ও সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু সত্য-দ্বীন আল্লাহর

নিকট থেকে এসেছে এবং আল্লাহর সঙ্গেই সরাসরি সম্পর্ক। এজন্য শেষ অবধি সত্যই বিজয়ী হবে এবং শেষ পর্যন্ত সত্যই টিকে থাকবে।

বাতিলের উপর সত্যের বিজয় সম্পর্কে এ চেতনা ইসলামী আকীদার একটি জরুরী এবং বুনিয়াদী অংগ এবং ইসলামী সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। আল্লাহর ইবাদাত করার দরুন এবং তাঁর সাথে গভীর সম্পর্কের ফলেই এই চেতনা গড়ে উঠে। এ চেতনা কখনও হঠাৎ করে আসে, আবার কখনও ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে আসে, কিন্ত ঈমানের জন্য এঁ চেতনা থাকা অপরিহার্য।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনার ফলে মুমিনগণ আল্লাহপাকের শক্তি থেকে সাহায্য পেয়ে বস্তু-শক্তিগুলোর উপর বিজয়ী হয় যদিও তা দৃশ্যতঃ খুবই শক্তিশালী, কিন্তু আসলেই বাতিল চির দুর্বল।

অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বস্তুগত যত শক্তি আছে সব কিছুর বাস্তব মূল্য অবশ্যই আছে; কিন্তু এগুলো তুচ্ছ এবং অতিনগণ্য এমন কিছু শক্তি যা কাউকে ইচ্ছা করলেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না অথবা একাকী কাউকে কোন পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, অথচ মজবুত ঈমান ও সঠিক আকীদা সব কিছুর উপর বিজয়ী হতে পারে এবং সব কিছুকে সঠিকভাবে পথনির্দেশ করতে পারে।

মুরতাদ ও যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন একাকী, নিয়মিত কোন বাহিনী তাঁর সাথে ছিল না, কোন বস্তুশক্তি অস্ত্রসম্ভারও তাঁর হাতে ছিল না। জিহাদের ডাকে যারা এগিয়ে এসে দুশমনের মুকাবিলা করতেন সেই অনিয়মিত বাহিনীও ছিল এ যুদ্ধের বিরোধী, সাধারণভাবে মুসলমানগণ ছিলেন দ্বিধাবিভক্ত। এমনকি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ও পরে যে বীরকেশরী বিভিন্ন যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সেই সিংহদিল হযরত ওমর (রাঃ) এই যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে পারছিলেন না। এসব কিছু সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজ সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন এবং তার সিদ্ধান্তের নিকট সবাই আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধে গেলেন এবং অবশেষে সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত হলো। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত। বস্তুর উপর ঈমানী চেতনার বিজয় হলো এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর রূহানী শক্তির কাছে বস্তু শক্তির দাপট ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে গভীর সম্পর্কের কারণেই এই রূহানী শক্তির সৃষ্টি হয়েছিল এবং শক্তির মাপকাঠির সর্বপ্রকার নিয়ম-কানুনকে এই ঈমান প্রদীপ্ত রূহানী তেজ ভেঙ্গে খান খান করে রেখে দিয়েছিল।

এই কারণেই ইসলাম এই রূহানী শক্তি হাসিল করার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছে এবং প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেননা, বাস্তবে

রূহানীশক্তির উপরই জীবনের কাজগুলোর গতি নির্দ্ধারিত হয়। সমাজ দেহের নির্মাতা ও সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে এই রূহানী শক্তির ভূমিকা প্রথম এবং প্রধান। বস্তু-শক্তি বহিরাবরণ হিসেবে কাজ করে এবং যে কোন কারণে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

রূহানী তরাক্কীর যে উপায় ইসলাম নির্দ্ধারণ করেছে তা অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজ-দেহের গভীর মূলে যার শিকড় প্রোথিত, তার প্রশস্ততা দিগন্তব্যাপী তা পূর্ণাঙ্গ এবং হৃদয়তন্ত্রীর প্রতিটি তারে তা ধ্বনি তোলে ও প্রত্যেকটি সজীব অংগকে কর্মমুখর করে তোলে। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গোটা জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আসলে জীবনের কোন দিক এবং বিভাগ এমন নেই যাকে ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে নাই অথবা যাকে কোন হেদায়েত দেয়া হয়নি।

ইসলামের এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দিবারাত্রের সামগ্রিক এবং সার্বক্ষণিক এমন এক স্থায়ী ব্যবস্থা যা মানুষের প্রত্যেকটি কাজ ও ব্যবহারের ব্যাপারেই তাকে পরিচালনা করে এবং তার অন্তরের মধ্যে সদাসর্বদা আল্লাহ্ ভীতির এই প্রশিক্ষণ চেতনাকে উজ্জীবিত করে এবং তার মধ্যে আল্লাহর নূরের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রশিক্ষণ

বই-এর শুরুতেই আমরা আলোচনা করেছি যে মানুষের অস্তিত্বই হচ্ছে এমন এক সত্তা যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একটি দেহের মধ্যে বহু জিনিষের সমাহার। সুতরাং দেহের অঙ্গ হিসাবে যেমন বাহ্যিক ও দৃশ্যমান জিনিষগুলো একের সংগে অপরটি সম্পর্কযুক্ত তেমনি দৈহিক কাঠামো, বুদ্ধি ও আত্মাও পরস্পর থেকে পৃথক কোন সত্তা নয়। যদিও প্রয়োজনের তাগিদে এবং লোকদেরকে বলার জন্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে পৃথক পৃথক বিষয় বলা হয় বা আলোচনাও করা হয় ; কিন্তু এগুলো পৃথক পৃথক কোন জিনিষ নয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে ও পরবর্তী আর একটি অধ্যায়ে এদের একের মধ্যে আর একটি মিশে থাকার মূলকথা (হাকীকাত) সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে যদিও একথা সত্য যে, আমরা "রূহের হাকীকাত" শিরোনামে একটি পৃথক অধ্যায় রেখেছি। এর কারণস্বরূপ বলা যায় যে, মূলত রূহ বা আত্মাই হচ্ছে সেই বুনিয়াদ যার উপর গোটা ইসলামের ইমারাত দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ইমারাতের মধ্যে রয়েছে, সামষ্টিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও চরিত্রগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাগগুলোর ভিত্তি। কিন্তু এ অধ্যায় ও সামনের অধ্যায়ের আলোচনায় ইনশাআল্লাহ এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বুদ্ধি ও দেহের উভয়ের প্রশিক্ষণ অন্তরাত্মার প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত এবং আত্মার সাথে মিলে প্রশিক্ষণ লাভ করার পর সব কিছু মিলে এক অভিন্ন সত্তা ও একই অস্তিত্বে পরিণত হয়। আরও সামনের দিকে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাব যে, ইসলামী পথ তার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে রূহানী দিককে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ মানব সভ্যতার গুলবাগিচায় যে সব ফুল ফুটে তার প্রতিটি কলি আত্মা থেকেই সঞ্জীবনী সুধা পান করে লালিত পালিত হয় এবং বাবা আদমের ফুল বাগিচার ফুলগুলো রূহ-এর খুশবোতে সুরভিত হয়। মানুষের চিন্তাধারার প্রতিটি চিন্তাকলি এবং তার শরীরের প্রতিটি দোলা রূহ-এর অনুসরণ করেই চলে।

প্রকৃতপক্ষে, এটা এক অনস্বীকার্য সত্য যে মানুষের বুদ্ধিই হচ্ছে আল্লাহপাকের নেয়ামতগুলোর মধ্যে একটি বড় নেয়ামত।

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الاَبْصَارَ وَالاَفْئِدَةَ

قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ۔ (الملك : ٢٢)

"বল, আল্লাহা তায়ালাই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও

তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর দিয়েছেন; কিন্তু তোমাদের মধ্যকার খুব কম লোকই শুকুরগুজারী করে।"

এখনে فُؤَادٌ শব্দটি বুদ্ধি, চেতনা অথবা অনুভূতি শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধিই মানুষকে এক ধোঁকা এবং পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে আল্লাহ্‌পাক মানুষকে বুদ্ধি দান করে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। কারণ এই বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ সত্য মিথ্যা, ভাল-মন্দ ও বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে কি ফায়দা আছে তা আবিষ্কার করেছে এবং সৃষ্টিজগতের বস্তুসমূহের মধ্যে, বর্তমানে বহু প্রকারভেদ করে দেখিয়েছে।

বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বে মানুষ এই পরীক্ষার মধ্যে পতিত বেশি, বুদ্ধি-বৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, বিভিন্ন অত্যাশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কার করেছে, এ্যাটম বোমা, রকেট ইত্যাকার যে সব অস্ত্রপাতি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, তারা নিজেদের বুদ্ধিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং একেবারে স্রষ্টার আসনেই বসিয়ে দিয়েছে। তারা বুদ্ধিকেই সব কিছু মনে করে রূহকে একেবারেই উপেক্ষা করে দিয়েছে। ফলে আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে, কারণ রূহের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে যোগাযোগ রাখা সম্ভব। মানবীয় বুদ্ধি যেখানে খেই হারিয়ে ফেলে সেই অজানার সন্ধানের বুদ্ধি নয়, আত্মার মাধ্যমেই সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

মানবীয় বুদ্ধি-বৃত্তির এই ধোঁকা আসলে ভিত্তিহীন এবং অন্ধ। কারণ যুক্তি এই হয় যে, মানুষের বুদ্ধি দ্বারা যে সকল জিনিষের বেড় পাওয়া যায় না বা বুঝে আসে না। অতএব তা মানা যাবে না এটাই যদি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমানী হতো তাহলে মানুষ নিজ অস্তিত্বের উপরেই তা পরীক্ষা করে দেখতে পারত, তার পৃথিবীকেন্দ্রিক জীবনকে অস্বীকার করে মুক্ত পুচ্ছ হয়ে যে উর্দ্ধাকাশের নিঃসীম নীলিমায় বিচরণ করত, বুদ্ধিবলে যখন সে উর্দ্ধাকাশে উড়তে শিখেছে বা কক্ষপথে তার যান পাড়ি জমিয়েছে তখন বস্তুগত জিনিসের স্বাভাবিক দাবীকে অস্বীকার করে সে তো প্রশস্ততর পরিসরে মনমত ভ্রমণ করে বুদ্ধির সাথে সাথে আত্মিক উৎকর্ষও লাভ করতে পারতো, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি।

আধুনিক যুগের মানুষের মধ্যে যদি সঠিক অন্তর্দৃষ্টি থাকতো তাহলে তারা রূহ বা আত্মাকে উপেক্ষা করে নৈতিক শক্তির উপর সাধারণ বুদ্ধিকে এত বেশি গুরুত্ব দিত না। যার কারণে মানুষকে শান্তি-পথের সন্ধানে সঠিক পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এটা অবশ্যই প্রকৃত সত্য মানুষকে সাধারণ জীব জানোয়ারের মত পয়দা করা হয়নি যে, সে তার দৈহিক শক্তি দ্বারাই পৃথিবীর নিয়ামক হবে, বরং তার শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি তার নৈতিক চেতনার মাধ্যমেই সে বিশ্বকে তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে

পারে। এই নৈতিক চেতনাই তার বুদ্ধিকে সঠিক পথ দেখায় এবং জীবনের কুহেলিকায় আলোর সন্ধান দেয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আবিষ্কার উদ্ভাবনীর ফলে মানুষ যে প্রকৃতপক্ষে কোন সঠিক ও শান্তিপূর্ণ জীবন পথের সন্ধান পেয়েছে তা নয়, বরং এগুলোর ব্যবহার বিধির উপর তা নির্ভর করছে। এগুলোকে কল্যাণ বা অকল্যাণকর কাজে যুদ্ধের অস্ত্র বা উৎপাদনশীল শিল্প কারখানার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এই নীতির উপরে নির্ভর করছে এব্যাপারে সন্দেহ নেই; ভাল-মন্দ নির্দ্ধারণের ক্ষমতা বুদ্ধিরও আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি প্রদর্শিত ভাল পথে টিকে থাকার নিশ্চয়তা বুদ্ধি দিতে পারে না। বরং অনেক সময়ে এমনও হয় যে, যুক্তি-বুদ্ধি হয়ত কোন জিনিষকে মন্দ অযৌক্তিক বলে জানাল; কিন্তু আত্মার বাঁকাপনা ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নে ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝা সত্ত্বেও মন্দপথে পা বাড়ানোই স্থির হয়ে গেল। অপরদিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মা সদা-সর্বদা কল্যাণ পথই নির্দ্ধারণ করে এবং বুদ্ধিকে সেই অনুযায়ী কাজে লাগায় যাতে করে জীবন তার মঞ্জিলে মাকসুদে পৌছুতে পারে। আর রূহ বা আত্মা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয় তাহলে তা হয় পথভ্রষ্ট এবং তা মানুষকে ভুল পথ নির্দ্ধারণ করে দেয় ও ভুল পথে চালানোর জন্যই বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম বা প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্যশীল জীবন ব্যবস্থা। এজন্য তা আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের শক্তি ও যোগ্যতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় এবং তার যোগ্যতার সঠিক ব্যবহার করে। সেগুলো মানুষের উপকারার্থেই কাজে লাগায় আর এজন্য আত্মা এ সকল যোগ্যতাকে এমনভাবে লালন-পালন করে যেন তা আরও ধারাল এবং কার্যকরী হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাধারার সীমানা নির্দ্ধারণ

ইসলাম মানব-বুদ্ধিকে এভাবে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে যে, সর্বপ্রথম বুদ্ধি কোন্ কোন্ স্থানে কাজ করবে তা ঠিক করে দেয়। যে সকল ব্যাপার মানুষের দৃষ্টি ও ধরা ছোয়ার বাইরে সেগুলো নিয়ে অযথা মাথাব্যথা করা থেকে ইসলাম মানুষকে বিরত রাখে। বরং ইসলাম ঐ সকল অদৃশ্য বস্তুর মধ্য থেকে যার যার সাথে সম্ভব প্রয়োজন মত পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এ বিষয়টিকেও আত্মার দায়িত্বে দিয়ে দেয়। কারণ, ঐ বিষয়গুলোর জ্ঞান একমাত্র আত্মার মাধ্যমেই সম্ভব এবং আত্মাই ঐসব উপায়-উপকরণের বোঝা বইতে পারে যা স্রষ্টা পর্যন্ত পৌছে দেয়। আল্লাহকে চিনতে ও জানতে গিয়ে বুদ্ধির বাহ্যিক অনুভূতি ও চাওয়া পাওয়ার যে চিন্তা ভাবনা ইসলাম সেগুলোর একটি সীমানা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে এবং তাকে মানব-নির্মিত সাধারণ দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান (Metaphysics) হিসাবে এমন লাগামবিহীন

অবস্থায় ছেড়ে দেয়নি যে সারা জিন্দেগী তার পিছনে ছুটতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু পাবে না।

এরপর ইসলাম মানুষের যুক্তিবুদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য ফলপ্রসূ এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করেছে এবং সত্যকে জানবার উপায় উদ্ভাবন করেছে আর এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টি মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েছেঃ

১। চিন্তা ভাবনার জন্য বুদ্ধিই হচ্ছে সঠিক মাধ্যম।

২। সৃষ্টিলোকের মধ্যকার রহস্যাদি, তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্তিত্ব এবং তাদের সহযোগিতাপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক জানার জন্য জ্ঞান-গবেষণা অপরিহার্য।

প্রথম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ইসলাম যে পথনির্দেশ করেছে তা এভাবে শুরু করেছে যে, মানুষকে সর্বপ্রথম স্থিরিকৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত হতে হবে। কারণ, ঐ চিন্তা কোন নিশ্চিত জ্ঞান সমৃদ্ধ বা জ্ঞানের ভিত্তিতে করা হয় না, বরং শুধু পিতা-পিতামহের অন্ধ অনুসরণই ঐ চিন্তা ভাবনার ইন্ধন হিসাবে কাজ করে। এসম্পর্কে আল-কুরআনের ভাষ্যঃ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَائَنَا عَلٰى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ - (الزخروف : ٢٣)

"আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদের এক বিশেষ জীবন পদ্ধতির অনুসারী হিসাবে এবং সত্য বলতে কি আমরা তাদের পদাংক অনুসরণই করছি।"

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَائَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَائُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا. -(البقرة : ١٧)

প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং ক্ষতিকর ক্রিয়ার কথা বুঝিয়ে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলে তারা জওয়াব দিতঃ

"আমরা ত সেই জীবন পদ্ধতিই অনুসরণ করবো যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।" এতদসত্ত্বেও তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা হয়েছেঃ

"যদি তাদের বাপ দাদাগণ কোন যুক্তি-বুদ্ধি কাজে না লাগিয়ে অন্ধভাবে কোন কিছুর অনুসরণ করে থাকে এবং সঠিক পথে নাও চলে থাকে তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করতে থাকবে?"

إِنْ يَّتَّبِعُ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ . (النجم : ٢٣)

"সত্য বলতে কি লোকেরা তো শুধু আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণই করে যাচ্ছে এবং কু-প্রবৃত্তির মুরীদই হয়ে রয়েছে"

إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. (النجم : ٢٨)

"ওরা শুধুমাত্র অলীক কল্পনা বিলাসের অনুসরণ করে চলেছে আর কল্পনা বা আন্দাজ অনুমান দ্বারা সত্যকে পাওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র সহায়তা হয় না।"

এরপর কুরআন শিক্ষা দেয় যে কোন জিনিসকে নিজের ঈমান-আকীদা হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে এবং কোন জিনিষের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করার আগে এমন কিছু যুক্তি প্রমাণ নিজের মনের মধ্যে সংগ্রহ করে নেওয়া উচিত যার কারণে মন নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. (الاسراء : ٣٦)

"এমন কোন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়োনা যার সম্পর্কে কোন সঠিক জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর এদের সকলকে (সে কি কাজ করেছে সে সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হবে।"

এটা বিরাট এক দায়িত্ব যার গুরুত্বের অনুভূতি দিতে গিয়ে কুরআন মজীদ ব্যাখ্যা দিচ্ছেঃ প্রথমতঃ"চোখ, কান ও দিলকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ "এদের সকলকে" বলে সামষ্টিকভাবে এদের সবাইর কাছেই কৈফিয়ত তলব করা হবে। এভাবে কৈফিয়ত চাওয়ার কারণ যাতে মানুষ এ বিরাট গুরু দায়িত্বকে ভালভাবে বুঝে এবং তাড়াহুড়ো করে কোন গুরু দায়িত্ব কাধে তুলে না নেয় বরং যে কোন জিনিস ভালভাবে জেনে শুনে এবং সে দায়িত্ব বহন করতে পারবে কি না ভেবে চিন্তে তা যেন গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে কুরআন পাক বেশ কিছু স্পষ্ট হেদায়েত দিয়েছে, যেমন আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা পেশ করতে গিয়ে বলছেঃ

هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. (الكهف : ١٥)

"আমার এই জাতি তো বিশ্বপালকের পরিবর্তে অন্যকে নিজেদের ভাল-মন্দে সবকিছুর মালিক বানিয়ে নিয়েছে। সত্যিই যদি অন্য কারো কোন ক্ষমতা থেকেই থাকে তা তাদের (কাজের) স্বপক্ষে কোন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ হাজির করে না কেন।" (কাহাফ-১৫)

যখন এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ভুল ও মিথ্যা দেব-দেবী বা সমাজ কর্তাদেরকে উপাস্য বা বিনা যুক্তি প্রমাণ হাজির করে না যা গ্রহণ করতে মানুষের বুদ্ধি বাধ্য হয় বা মিথ্যা রটনা افك। (যা কিছু মুনাফিকের ষড়যন্ত্রে কারণে ছড়িয়ে পড়েছিল)। সে সম্পর্কে কুরআনের দাবীঃ

لَو لاَ جَاءُوا عَلَيهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإذْ لَم يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِندَ اللّٰهِ هُمُ الكَافِرُونَ. (النور : ١٣)

"ওরা যে মিথ্যা রটনায় লিপ্ত সে বিষয়ে ৪ জন (দেখা) সাক্ষী হাজির করছে না কেন? যদি তা না পারে তাহলে, (জেনে নাও) আল্লাহর নিকটে তারাই মিথ্যাবাদী।" (আন নূর- ১৩)

হুদুদ বা শাস্তির আইন কার্যকরী করার পূর্বে সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব এত বেশি এজন্য যে, যে অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে তা যেন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, কোন আন্দাজ-অনুমান বা আজে বাজে রিপোর্টের ভিত্তিতে যেন এত বড় শাস্তিকে কার্যকরী না করা হয়। আর এজন্য নবী পাক (সঃ) এর সুন্নাত থেকে এই ফিকাহ্র মসলা গ্রহণ করা হয়েছে যে কোন প্রকার সন্দেহ থাকলে সেখানে হদ নাকচ হয়ে যাবে। আইনের প্রয়োগে সতর্কতার কারণ, কোন শাস্তির হুকুম জারীর পূর্বে যেন তৃপ্তিজনকভাবে সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করা হয়, নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া যাবে, শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

যাই হোক, এসকল হেদায়েত দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং চিন্তা-শক্তির সঠিক প্রশিক্ষণ দান।

সৃষ্টি-লোকের বৈচিত্র্যময় নিদর্শনসমূহের ও রহস্যপূর্ণ বস্তুগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা

আল্লাহকে জানতে-বুঝতে গিয়ে দ্বিতীয় অসিলা হচ্ছে সৃষ্টিলোকের বিচিত্র নিদর্শনাবলী। এ গুলো সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি সূক্ষ্ম; ধারালো ও গোছালো হয়। মহাশূন্য আকাশে ও সৃষ্টিলোকের অন্য সবখানে একটু গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে সবখানে এক অদ্ভুত নিয়ম শৃংখলা বিরাজ করছে। মুমিনের মনকে এ রহস্যপূর্ণ শৃংখলার চেতনা আরো বেশি আল্লাহ-ভীরু করে তোলে, কারণ এসব কিছুর মূলে তারই অদৃশ্য হাত যে কাজ করে চলেছে সে বিষয়ে বুঝতে তাকে আর বেগ পেতে হয় না। এর সাথে মুমিনের অন্তরের মধ্যে শৃংখলাবোধ পয়দা হয়। এবং প্রতিটি কাজে-কথায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে তার মধ্যে শৃংখলা, সৌন্দর্যবোধ ও ভারসাম্য গড়ে উঠে

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই গতিতে সূর্যের আলো গোটা পৃথিবীর উপর এসে পড়ে। অন্যান্য তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহের দূরত্ব এই আলোর গতি হিসেবেই মাপা হয়। এগুলোর পরিমাপ আলোক বছর

হিসাবে নিরূপিত হয়, সেকেন্ড, মিনিট ও ঘন্টা দিয়ে নয়। এ অত্যাশ্চর্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর জ্ঞান-গবেষণা মানুষের দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে আরও বেশি প্রখর করে তুলে এবং সে এসব কিছু দেখতে দেখতে এমন ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠে যে, সে সামান্যতম উদাসীনতাও করেনা। কারণ, সে বুঝে যে তার অতি সামান্য একটু ঔদাসিন্য বা বেখেয়ালিপনা অত্যন্ত কঠিন ও মারাত্মক পরিণতির দিকে তাকে নিয়ে যাবে। একইভাবে সে একথাও জানে যে, ছায়ালোকের মধ্যে অবস্থিত এ সকল নক্ষত্ররাজির মধ্যকার গতিতে সামান্যতম হের-ফেরের ফলে গোটা সৃষ্টিই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সুতরাং একই কারণে বুদ্ধির জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া, নির্ভুলভাবে বুদ্ধির ব্যবহার এবং সবকিছুকে সুসামঞ্জস্যভাবে চিন্তা করা অপরিহার্য; যাতে করে সৃষ্টিলোকের অংশগুলো সম্পর্কে চিন্তাস্রোত মানুষকে স্রষ্টা বা সামগ্রিক সৃষ্টি সম্পর্কে বুঝতে সাহয্যে করে।

ইসলামের সূচনাপর্বে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা মুসলমানদের চিন্তা শ্রোতকে প্রখর ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করেছিল যদিও জ্ঞান-গবেষণা ও আবিষ্কার করার জন্য আধুনিক যুগের মত কল-কব্জা বা সরঞ্জামাদি তখন আবিষ্কার করা হয়নি। এসকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্তেও মুসলমানরা এমন বহু জিনিসও আবিষ্কার করেছে, যেগুলো থেকে জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম মূল্যবান ও তীব্র গতিসম্পন্ন এ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (Scientific Discoveries) মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছিল। এগুলো থেকে জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে মানুষের জন্য কল্যাণময় বহু অবদান রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্যঃ চক্ষু বিজ্ঞান সম্পর্কে এবনুল হায়সাম এর গবেষণা ও তার গবেষণালব্ধ ফল, সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তনের গতি নির্ণয় এবং সূর্য ও চাঁদের গ্রহণ সম্পর্কে সুগভীর চিন্তা দ্বারা ইসলামী নীতির ভিত্তিতে মুসলমানদের অবদানের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে, আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলকে জানা ও বুঝার জন্য কাজে লাগায় এবং এটাই আত্মার কাজের অনুরূপ যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই সবার রক্ষক এবং তদ্বীরকারী। আসমান ও যমীনকে সঠিকভাবে তিনিই পয়দা করেছেন, তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ম-শৃংখলা, সুকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করেন, এ জগতটাই তো চিন্তা ভাবনার স্থল। এগুলো সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান-গবেষণা বা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে এবং হবে তা কোন দিন কোন ইতিতে পৌছাতে পারবে না আর কোন দিন এর সীমা পরিসীমা করাও যাবে না। দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টিলোকের শুরু থেকে এ মহাসৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় লেগে আছে কিন্তু স্বাধীন লাগামহীনভাবে চিন্তা ভাবনার কারণে চিন্তার ফানুস উড়ানো ছাড়া মূল রহস্যের কোন সন্ধান কোন দিন তারা পায়নি। এ ক্ষত্রে কুরআন মানবাত্মাকে উড্ডয়ন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়ে তার মধ্যে জীবন

মৃত্যুর চেতনা দান করে তাকে এ জীবনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করেছে। এর ফলে তার অন্তরের মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ আল্লাহর সাথে সুগভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

সৃষ্টিলোক, সত্যও ইনসাফ

যেহেতু সৃষ্টির বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাই আসল উদ্দেশ্য নয়, আর জীবনের বাস্তব দিক ও পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করে এবং বাস্তবতার দাবীর পরওয়া না করে শুধুমাত্র দর্শনশাস্ত্রের কচকচির মধ্যে ঘুরে ঘুরে আপনহারা হওয়াও জীবনের লক্ষ্য নয়, বরং মানব জীবনের চিন্তা-গবেষণার মূললক্ষ্য মানুষের অন্তরকে সুন্দর করে তাকে গোটা মানবতার কল্যাণের পথে নিয়োগ করা। দুনিয়ার জীবন, সৃষ্টিলোক এবং জীবনের সাফল্য নিহিত রয়েছে দুটি জিনিসের মধ্যেঃ সত্য ও ন্যায়নীতি বা ইন্‌সাফ (এর মধ্যে)।

কুরআনে করীম এ সত্যকে বারবার তুলে ধরেছেঃ

وَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ . (الانعام: ٧٣)

"তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সত্যসহ (সত্য সঠিক জিনিস প্রকাশ ও চালু করার উদ্দেশ্য) সৃষ্টি করেছেন।" (আন আম - ৭৩)

اَ لَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. (ابراهيم : ١٩)

"তুমি কি দেখছ না যে আল্লাহ্ তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন?" (ইব্রাহিম- ১৯)

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ ؟ (الحجر: ٨٥)

"আকাশমণ্ডলী পৃথিবী আর এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে সত্যের ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে আমি পয়দা করিনি।"

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. (النحل: ٣)

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সত্য সঠিকভাবে পয়দা করেছেন। যে সকল জিনিসকে ওরা তাঁর অংশীদার (বা সমকক্ষ) মনে করে তাদের বহু উর্দ্ধে তিনি (ও তাঁর ক্ষমতা)।" (নাহালা-৩)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ «ط» اِنَّ فِي ذَالِكَ لاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

(العنكبوت : ٤٤)

"আল্লাহ্ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে সত্য-সঠিকভাবে পয়দা করেছেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমানদার তাদের জন্য অবশ্যই এর মধ্যে সত্যকে জানতে বুঝতে নিদর্শন রয়েছে।" (আনকাবুত- ৪)

مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ. ((الروم-٨

আল্লাহ্ তায়ালা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সকল বস্তুকে সত্য-সঠিক বুনিয়াদের ভিত্তিতে পয়দা করেছেন।" (রূম- ৮)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً. (ص : ٢٧)

"আসমান-যমীনকে এবং এ'দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোকে আমি (মহান আল্লাহ) মিছেমিছি বা বৃথা পয়দা করিনি।" (সাদ- ২৭)

অবশ্যই এসব পয়দা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র কিছু উদ্দেশ্য আছে যা পুরাপুরি জানার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি যেটুকু যাকে জানিয়েছেন, ততটুকুই সে জানতে পেরেছে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ. (الدخان: ٣٨)

"আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দু'য়ের মাঝে যা আছে সেগুলোকে আমি খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি।" (দু'খান- ৩৮)

وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ. (الجاثية : ٢٢)

"আল্লাহ্ তায়ালা আসমানসহ ও যমীনকে সত্য-সঠিকভাবে পয়দা করেছেন, আর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছু করেছে (দুনিয়ার বুকে থাকাকালীন) তার বদলা তাকে দেয়া যায়। আর একথা সত্য যে লোকদের উপর (তাদের পাওনা মত না দিয়ে) জুলুম করা হবে না।" (জাসিয়া- ২২)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ :
(التغابن : ٣)-

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সত্য-সঠিকভাবে পয়দা করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতিদান করছেন, আর তোমাদের সে আকৃতিকে বড় সুন্দর করেছেন।" (তাগাবুন- ৩)

অর্থাৎ "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির প্রত্যকটি জিনিসের আকৃতিকে সুন্দর ও সঠিক এবং কর্মোপযোগী আকৃতিদানের ব্যবস্থা সঠিকভাবেই

"তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, বাস্তব অস্তিত্বে এসে যাও (পয়দা হয়ে যাও) তাতে তোমাদের ইচ্ছা হোক বা না হোক, তারা বললঃ আমরা পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারেই এসে গেলাম।" (ফুসেলাত-১১)

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ - (الانشقاق : ١-٥)

"যখন আসমান ফেটে যাবে এবং নিজ প্রভুর হুকুম তামিল করবে, আর তার কর্তব্যই তো হলো (নিজ প্রভুর) হুকুম পালন করা। আবার যমীনকে যখন বিছিয়ে দেয়া হবে আর তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকে যখন বাইরে নিক্ষেপ করে খালি করে ফেলা হবে এবং এভাবে নিজ প্রভুর হুকুম তামিল করা হবে যা তামিল করাই তার কর্তব্য।" (ইনশেকাক১-৫)

وَ الشَّمْسِ وَ مَا ضُحَاهَا وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا وَ اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا - (الشمس : ١ - ٤)

"সূর্য ও তার রৌদ্রোজ্জ্বল কিরণের কসম, আর চাঁদ যে তার (সূর্যের) পিছনে আসে তার কসম এবং দিনেরও কসম যা (সূর্যকে) প্রকাশ করে আরও কসম রাতের যা (সূর্যকে) ঢেকে দেয়।" (আশ শ্যামস ১-৪)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا. وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا.

(الزلزا)-ل)

"পৃথিবীকে যখন ভীষণভাবে আন্দোলিত করে (নাড়িয়ে) দেয়া হবে এবং যখন সে তার মধ্যস্থিত বোঝাগুলো বের করে দেবে, তখন মানুষ বলে উঠবে! এ কি হচ্ছে? সেদিন (পৃথিবী) নিজের উপর সংঘটিত খবর বর্ণনা করে দেবে কারণ তোমার রবই তো তাকে এইভাবে বলার হুকুম দেবেন। (যিলযিলা ১-৫)

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ. (يس : ٤)

"সূর্যের কোন সাধ্য নেই যে, সে চাঁদকে ধরে ফেলবে আর রাতও (নির্দিষ্ট সময় ছাড়া) দিনের পূর্বে আসতে পারবে না। প্রত্যেকেই তারা নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে যাচ্ছে।" (ইয়াসিন-৪০)

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.

(الحج : ٥)–

"আর যমীনকে তুমি দেখছ, শুকনা হয়ে পড়ে আছে, তারপর যখন তার উপর পানি বর্ষণ করাই তখন সে অকস্মাৎ (ফুলে ফেপে) নড়ে উঠে এবং সজীব হয়ে উঠে।" (হজ্জ-৫)

وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.

(فصلت : ٣٩)–

"তোমরা তো দেখছো যমীন (শুকিয়ে) চুপসে পড়ে আছে, তারপর যখন তার উপর পানি বর্ষণ করাই তখন তা হঠাৎ নড়াচড়া করে উঠে এবং সজীব হয়ে উঠে (ফুলে ফেঁপে উঠে)"। (ফুসেলাত-৩৯)

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. (الحشر : ٢١)

"আমি (মহান আল্লাহ) এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করলে তোমরা অবশ্যই দেখতে পেতে তা ভয়ে নীচের দিকে যাচ্ছে এবং ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।" (হাশর-২১)

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً – (الاسراء : ١٢)

"একটু খেয়াল করে দেখো আমি (মহান আল্লাহ) রাত্র ও দিনকে আমি দু'টি নিদর্শন হিসেবে বানিয়েছি। তারপর রাতের নিদর্শনকে বানিয়েছি আলো বিহীন এবং দিনের নিদর্শনকে বানিয়েছি উজ্জ্বল দিবালোকে ভরপুর।" (বনী ইসরাইল-১২)

وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ . (التكوير : ١٨١)

"কসম রাতের যখন তা বিদায় নিল এবং কসম প্রভাত বেলার যখন তা নিঃশ্বাস ফেলল।" (তাকভীর-১৭-১৮)

কুরআনে পাকের কোন কোন স্থানে সকল সৃষ্টির কথা একসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

(الحشر : ١٠)–

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করে চলেছে, আর তিনি মহাশক্তিমান বুদ্ধিমান-বিজ্ঞানময়।" (হাশর-১০)

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ۔

(التغابن : ٤)-

"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আরও জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করে চলেছ আর যা কিছু প্রকাশ কর তা সবই।" (তাগাবুন-৪)

وَ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ ۔ (الروم : ٢٦)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যে যেখানে আছে সবাই তাঁর অনুগত।" (রুম-২৬)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ «ط» اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔ (احزاب : ٧٢)

"আমি (মহান আল্লাহ) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়পর্বতগুলোর নিকট পেশ করলাম আমার আমানত। সবাই এই গুরুদায়িত্বের বোঝা বহন করতে অস্বীকার (অপারগতা প্রকাশ) করল, তারপর এ বোঝা বহন করে নিল মানুষ। অবশ্যই সে বড় জুলুমবাজ-জাহেল।" (আহযাব-৭২)

কখনো একথা বলা হয়েছে, ঐ মাটি থেকেইতো মানুষকে পয়দা করা হয়েছে যা দ্বারা অন্য সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছেঃ

وَ اللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

(نوح : ١٧–١٨)-

"আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে আশ্চর্যজনক এক পন্থায় যমীন (মাটি) থেকে উৎপাদন করেছেন, তারপর আবার তার মধ্যে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, এরপর হঠাৎ করে তোমাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন।" (নূহ-৫৫)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى۔

(طه : ٥٥)-

"এই মাটি থেকে তোমাদেরকে পয়দা করেছি, এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব, আবার এর থেকেই তোমাদেরকে দ্বিতীয়বারের মত বের করব।"

(তা-হা-৫৫)

সৃষ্টির সৌন্দর্য

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্রব্যাদির মাধ্যমেও মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক জানা যায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পর্কের মূল উদ্দেশ্য কি তা জানা যায় না। সত্য বলতে কি, সৃষ্টির সৌন্দর্যের অনুভূতি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অংগ, যার দ্বারা সৃষ্টির মধ্যে প্রসারতা ও প্রশস্ততা, চিন্তাধারায় গভীরতা এবং অনুভূতিতে তীব্রতা পয়দা হয়। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা পর্যন্ত বান্দাহকে পৌছে দেয়া। এভাবে এ বিষয়টি বান্দাহর মূল আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বস্তুগত কারণে মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতে সুসামঞ্জস্য ও শৃংখলাপূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে মানুষ প্রকৃতপক্ষে সুন্দর ও নেক বখ্‌ত মানুষে পরিণত হয়, কারণ অর জীবন উর্দ্ধগতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর সংগে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাওয়ার কারণে তার ব্যক্তিসত্তা ও স্রষ্টার মধ্যস্থিত পর্দা অপসারিত হয় ও সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়ে যায়।

তার দৃষ্টির দিগন্তব্যাপী প্রসারতা ও প্রশস্ততার একটি সুফল এই দেখা যায় যে, মানুষ সকল প্রাণীকে ভালবাসতে শুরু করে। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ যখন নিজের জীবন্ত আত্মাকে অনুভব করে এবং জানদার হওয়ার কারণে অন্যান্য জানদারদের সাথে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে তখন স্বাভাবিকভাবে জীবের সংগে জীবের মুহাব্বতের একটি সম্পর্ক আছে বলে অনুভূত হয়।

কুরআনে করীমে প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষসহ গোটা বাস্তব জগৎ সম্পর্কে যেখানে আলোচনা এসেছে তা এই অনুভূতিই জাগিয়েছে এবং এভাবে মানুষ বস্তুজগতের সকলের সঙ্গে গভীর আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করে এবং এ কারণেই মানুষের মধ্যে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মুহাব্বতের একটি স্থান অবশ্যই দেখা যায়। এমনকি মানুষ যখন কোন ক্ষতিকর প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচতে চায় তখনও উক্ত প্রাণীর প্রতি তার দরদের সম্পর্ক একেবারে মুছে যায়না।

এ অনুভূতিতো আছেই, এর সংগে মানুষের মধ্যে বিরাজমান বিশাল সৃষ্টির সবার সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক তার সভ্য ও ভদ্র হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং তার মধ্যকার কঠোরতা ও হৃদয়হীনতার মনোভাব দূর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা রাখে। কারণ মানুষের মধ্যে বস্তুগত কারণে সীমাবদ্ধতা ও রুজি-রোজগারের জন্য কঠিন কাজ করতে গিয়ে যে আত্মকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হয় তা প্রকৃতির

রেখেছিলেন" তাদের মধ্যে সত্য প্রবণতা দান করেছিলেন যার কারণে সে সত্য সঠিক জিনিষ বুঝে এবং শয়তানের ফেরেবে অনেক সময় অন্যায় কাজ করলেও ভাল ও সঠিক জিনিস সম্পর্কে একেবারেই অচেতন হয়ে যায় না। সত্যের মর্যাদা যে বেশি একথা তাদের চিন্তা-চেতনায় সর্বদাই বিরাজ করে, এভাবে সত্যের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়। মিথ্যা পর্যুদস্ত হবেই, মিথ্যার দৌরাত্ম ও মিথ্যার জারিজুরি চিরদিন চলবে এটা স্রষ্টার ইচ্ছার বাইরে। তবে, সত্যের বিজয় আসবে তাঁর বান্দাহ্দের হাতেই, এজন্য বান্দাহ, যারা সচেতনভাবে সত্যকে বুঝে, তাদেরকে একত্রিত হতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ পথে ত্যাগের মনোভাব পূর্বশর্ত এ শর্তটি যাদের মধ্যে বিরাজ করবে তারাই একত্রিত হতে পারবে এবং তারাই সত্য সঠিক জিনিসকে কায়েম করতে সক্ষম হবে। একাজে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে, কাউকে কিছুতেই ঠকানো হবে না। সুতরাং এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের ঘোষণাঃ

وَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ - (الجاثية : ٢٦)

"আল্লাহ্পাক তো আসমান ও যমীনকে পয়দা করেছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেন সেই কাজের বদলা দেয়া হয়, যা সে (পৃথিবীর বুকে করেছে)। এটা আল্লাহর ওয়াদা, তাদের পাওনা যথাযথভাবে না দিয়ে, তাদের প্রতি কিছুতেই কোন জুলুম করা হবে না।

উপরের আয়াতটিতে জাযা-প্রতিদান-এর কথা উল্লেখিত হয়েছে, আখেরাতে ঐ সত্যের বদলা দেয়া হবে, যে সত্যের উপর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে, উপরন্তু আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার দিকে রুজু করাও সত্য, আর এই রুজু করার অর্থ হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি নিছক ছেলে খেলা বা বেফায়দা নয়।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ، (المؤمنون : ١١٥)-

"তোমরা কি মনে করেছ যে আমি (মহান আল্লাহ) তোমাদেরকে বৃথাই সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না?" (আল মু'মিনুন- ১১৫)

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হওয়া পর্যন্ত এবং হিসাব নিকাশের দিনে তার কাজের প্রতিদান পাওয়ার সময় প্রত্যেক মঞ্জিলেই এই 'হক্ব'- এর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতি পদে পদে হক্ব (সত্য) মুনিবের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে, তার সৃষ্টি বাজে, বেকার ও নিরর্থক নয়।

ইসলামী-চিন্তাধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অর্থ খুবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। সুতরাং, কুরআন সদা-সর্বদা এ অর্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে, যথাযথ গুরুত্ব দেয় এবং ঐ দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা জানায় যে, সকল আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস এবং এর উপরই সকল বিশ্বাসকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত। অর্থাৎ সেই সত্য মওলার উপর নিজের বিশ্বাসকে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন যাঁর ইচ্ছায়, যাঁর ক্ষমতায় এবং যাঁর মর্জি মুতাবিক মানব সৃষ্টি, কুরআন প্রেরণ এবং মানুষকে পথপ্রদর্শন।

আল্লাহ্‌পাক নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেনঃ "সত্য-সঠিক মওলা পাকের ইচ্ছায়। আমি (মওলা) সত্যসহ কুরআনকে নাযিল করেছি, আর কুরআন সত্যসহ নাযিল হয়েছে।" وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

সত্যের আলোকে আলোকিত (সত্যেভরা) এ মহাশূন্যলোকে ইসলাম মানুষকে মানবতার ট্রেনিং দেয় এবং তার অনুভূতির মধ্যে সত্য মওলা সম্পর্কে গভীর চেতনা সৃষ্টি করে। এমনকি তার দেহ-মনের চিন্তা-ধারণা বিশ্বাস সবই হক্ক-মওলার রং-এ রঞ্জিত হয়ে যেতে হবে। এর কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন জিনিসকে অযথা এবং বিনা কারণে সৃষ্টি করেননি, বরং প্রতিটি সৃষ্টি সত্যিকার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে সত্যকথা যে, মানুষের মন-মেযাজ অনেক সময় নিজের জীবনে আগত বহু সত্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল পথে চালিত হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে এ জীবনটাকে খামাখা-ই অস্তিত্বে আনা হয়েছে, এর মধ্যে বুদ্ধি সংগত কোন কারণ বা হিকমত নজরে আসে না। এ ধারণার ফলে তার আত্মা বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। চিন্তার ক্ষেত্র নৈরাজ্য এবং কাজের মধ্যে অসংলগ্নভাব এসে পড়ে; তখন যে সত্য প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ সৃষ্টিটাকে পরিচালনা করে চলেছেন তার তাৎপর্য বুঝে আসে না, বরং সবই নিরর্থক মনে হয়।

এ ভুল ধারণার কারণে মনে হয়, যেন গোটা সৃষ্টিটাই লক্ষ্যহীন ও বৃথা। এ জিন্দেগীও মনে হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়াই পয়দা হয়েছে, এভাবে মানুষের মনে বিভিন্ন প্রকার গুমরাহী সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় আত্মা এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে দিশেহারা হয়ে যায় এবং লক্ষ্যহীন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে শুরু করে, যার ফলে সে জীবনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট ও মন্দ-পরিণতিতে ভরে গিয়ে এক ভাগ্যহত পরিণতি বরণ করে। কখনো তার আত্মাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কু-প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয় এবং তার মধুর এজীবন তার নিজের কাছেই দুর্বিষহ ও বিড়ম্বিত মনে হয়, আবার আত্মার পথভ্রষ্টতা তাকে জালেম, উৎপীড়নকারী এবং মানব বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত করে দেয়।

এ জন্যই প্রকৃতির প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে সত্য মওলার যে অস্তিত্ব বর্তমান

রয়েছে সে বিষয়ে ইসলাম মানুষকে ওয়াকেবহাল করে, তার অনুভূতির প্রতি তন্ত্রীতে সত্যের ঝংকার তোলে এবং সে মহাস্রষ্টার দাসত্ব করতে শুরু করে এবং তার দাসত্বের মধ্যেই যে এ জিন্দেগীর সার্থকতা এবং পরকালের সাফল্য একথা বুঝতে তাকে বেগ পেতে হয় না। এই সত্য চিন্তা তাঁকে তার কাছেই জওয়াবদিহির চিন্তা দান করে এবং তাকে সুশৃঙ্খল, দরদী, দায়িত্বশীল ও উপকারী মানুষে পরিণত করে ও সকল দিক থেকে সুন্দর করে তোলে। এর ফলে এ জীবনটা যেমন তার কাছে অর্থবহ হয়ে যায়, তেমনি মওলার কাছেও প্রিয় হয়ে তাঁর দরবারে হাসিমুখে সে হাজির ওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي

الْاَلْبَابِ. الَّذِيْ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ط

سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (آل عمران : ١٩ - ٣١)

"অবশই আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পর্যায়ক্রমে আবর্তনের মধ্যে ঐ সকল বুদ্ধিমানদের (শিক্ষা গ্রহণের) জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং যখন তারা শায়িত অবস্থায় থাকে তখনো; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (তারা বলে উঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র, যাবতীয় দুর্বলতার উর্দ্ধে। অতএব আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিন।" (আলে-ইমরান ১৯০-১৯১)

চিন্তা ও আল্লাহর স্মরণ

সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিন্তা করে এবং আল্লাহ্‌পাকের নিদর্শনসমূহ ও সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে বুঝতে গিয়ে নিজেদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু তাদের এ চিন্তা অনুভূতি জগতের বহির্ভূত উদ্দেশ্যহীন কোন জিনিসের জন্য চিন্তা নয়, অথবা আল্লাহ্‌পাকের চিন্তা থেকে মুক্ত কোন চিন্তাও নয়, বরং প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একদিকে যেমন সৃষ্টি জগৎ ও তার রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে, তেমনি অন্যদিকে, শয়নে স্বপনে জাগরণে, উঠতে-বসতে সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকে। আর এভাবে তাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ্‌র চিন্তা-বিজড়িত। তাদের জ্ঞানও একেবারে মুক্ত পুচ্ছ নয়, বরং আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞানভাণ্ডার কালামপাক ও হাদীসে

রাসূল থেকে গৃহীত। আর এ কারণেই তাদের চিন্তাভাবনার কারণে তারা তড়িৎ গতিতে আল্লাহ্‌র দিকেই এগিয়ে যায়। তারা বলে উঠেঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ۚ (آل عمران : ۱۹۱)

"হে পরওয়ারদিগার! এগুলো আপনি বৃথা সৃষ্টি করেননি।"

(আলে-ইমরান- ১৯১)

এখানে একথাও প্রণিধানযোগ্য, এই চিন্তা-ভাবনা ও তার ফসলের মধ্যে এমন কোন বিরতি বা সামঞ্জস্যহীনতা পাওয়া যায় না যার কারণে চিন্তা ও তার ফলের মধ্যে সম্পর্ক টের না পাওয়া যায়। এমনকি চিন্তাশীল লোকদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর 'তারা বলে'- শব্দ দুটি পর্যন্ত বলা হয়নি, বরং يَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ বলার পর পরই একথার অবশ্যম্ভাবী প্রার্থনাই হবে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ۚ একথাগুলো আনা হয়েছে, যেন চিন্তা ও চিন্তার ফসল এমনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত যে, এ দু'অবস্থার মধ্যে কোন ব্যবধানই নেই এবং চিন্তার পর সত্য মওলাকে জানা বুঝা অবশ্যম্ভাবী একসত্য।

এ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌কে চিনতে পেরেই ক্ষান্ত হয় না। কারণ, সত্যকে জানা বুঝার দ্বারা বাস্তব জীবনে কোন পথনির্দেশই যদি পাওয়া না যায়, তবে ঐ চিনতে পারা আর না পারা সমান কথা। তা যদি না হতো তাহলে সৃষ্টিজগতে এমন অনেক জিনিসও আছে যেগুলোর তুলনা মানুষের সাথে করলে সেগুলো অস্তিত্বহীনই মনে হবে। কারণ, পৃথিবীর এ বাস্তব জীবনে ঐগুলোর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আর এ কারণেই ঐ সত্য-সন্ধিৎসু ব্যক্তিরা সত্যকে জেনে বুঝেই থেমে যায় না, বরং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তর ও আত্মা মহামহিমের পবিত্রতা গাঁথা গেয়ে উঠেঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ (آل عمران : ۱۹۱)

"হে পরওয়ারদিগার! এসকল জিনিসকে আপনি বৃথা সৃষ্টি করেননি। (অযথা ও অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টির অর্থহীন কাজ করার ত্রুটি থেকে) আপনি পবিত্র।"

(আলে ইমরান- ১৯১)

এর পর এই সকল চিন্তাবিদগণ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং তাঁর পবিত্রতা-গাঁথা গেয়েই থেমে যায় না। বরং এ চিন্তা-ভাবনার কারণে ঐ পূর্ণ ঈমান লাভ করে। যার রঙে রঞ্জিত হয়ে যায় তাদের জীবনের সকল কাজ, চেতনা ও যাবতীয় চিন্তা-ভাবনাসমূহ এবং তারা সেই ঈমান-প্রদীপ্ত রাস্তা পেয়ে যায় যার উপরেই তারা গোটা জীবনের গাড়ীকে চালাতে থাকে। যা তাঁদের বাস্তব জীবনকে পরিচালিত করে এবং তার জন্যই তারা আমরণ জিহাদে লিপ্ত থাকে।

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ط فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ. -(آل عمران : ١٩٠ - ١٩٥)

"হে আমাদের রব! এসব আপনি বৃথা এবং নিরর্থক পয়দা করেননি। বাজে কাজ করার মত ক্রটির ঊর্দ্ধে আপনি। হে আমাদের প্রতিপালক! যাকে আপনি দোযখে প্রবেশ করাবেন তাকে লাঞ্ছিত করেই ছাড়বেন। আসলে জালেমদের সাহায্যকারী কেউই নয়। হে আমাদের প্রভু! আমরা সেই আহবানকারীর ডাক শুনেছি যিনি আমাদেরকে ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, আমাদের গুনাহ্-খাতা মায়াফ করে দিন, আমাদের দোষ-ক্রটিগুলোকে মুছে দিন এবং আমাদেরকে নেক লোকদের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ্! আপনি রাসূলদের জবানীতে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করুন আর কেয়ামতের দিনে আমাদেরকে অপমানিত করবেন না। অবশ্যই আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। জওয়াবে তাদের রব (আল্লাহ্পাক) বলেন, আমি কোন নেক কাজ করনেওয়ালা ব্যক্তির আমল নষ্ট করি না তা সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা সবাই একে অপরের আপনজন। অতএব, ঈমান আনার পর যারা হিজরত করেছে এবং তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, এর পর যাদেরকে আমার পথে থাকার কারণে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তারপর তারা আমার জন্য যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের দোষ-ক্রটি মুছে দেবো এবং এমন বাগ-বাগিচায় ভরা জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবো যার নিচ ও পাশ দিয়ে ছোট ছোট শ্রোতস্বিণী নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। এসব হবে তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের কাজের বদলা (প্রতিদান) আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালাই উত্তম প্রতিদানকারী।" (আলে ইমরান-১৯০-১০৫)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্পাকের বিশ্বলোকের বিশাল সৃষ্টি ও বৈচিত্র্যে ভরা রহস্যরাজি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ইসলামী ধারা পেশ করা হয়েছে। তারপর বিশ্বপ্রকৃতি

সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে তাদিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথ দেখানো হয়েছে।

এ চিন্তা-পদ্ধতি বিস্ময়করভাবে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। এর শুরু চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আর এর শেষ কাজ করায়। অর্থাৎ, সেই সত্য সঠিক কাজ করা যা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। আর সে সত্যকে বাস্তবে চালু করার পদ্ধতিই হচ্ছে জিহাদ। বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় জিহাদ এ জন্য, যাতে করে সমগ্র জীবন এ পথে এবং এ শরীয়াত অনুযায়ী চলতে পারে এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও আখেরাতের লক্ষ্য হাসিল হয়ে যায়। আর এভাবে আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। কুরআনে করীমের মুজেযা (অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য শক্তি) এ সকল বিষয় ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথা উপরোক্ত ছ'টি আয়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর যদি মানুষ আল্লাহ্পাকের বুদ্ধি, হিকমাত ও তদ্বীর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে তার বুদ্ধিগত শক্তিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাচীন দিক নির্দেশনা ও আধুনিক দার্শনিক গোলকধাঁধার মধ্যে তুলনা করে দেখে তবে তখনই তার কাছে এ দু ধরনের পদ্ধতির পার্থক্য অকস্মাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়ে যে পন্থা গড়ে উঠেছে তার সাথে মহান আল্লাহ্পাক প্রদত্ত পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে, তখন মানুষ বুঝবে যে, আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়ালাই প্রতিটি জিনিস সঠিকভাবে পয়দা করেছেন আর সেই সত্য সঠিক জিনিসকেই জীবন পদ্ধতি হিসাবে নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন।

বিশ্বলোকের বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কে গবেষণা চালাতে গিয়ে পাশ্চাত্য জগৎ চরম ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং নানা প্রকার ভ্রান্ত-কল্পনার শিকারে পরিণত হয়েছে, যার কারণে কখনো দাবি করা হয়েছে যে, এই বিশাল সৃষ্টি কোন স্রষ্টা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে, কখনো দাবি করা হয়েছে বিশ্বলোকের অস্তিত্ব এক আকস্মিক ঘটনামাত্র, এর জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন নেই বা কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থামত এগুলো চলছে না।

এসব কল্পনা বিলাস সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ বাস্তব সত্যের দিকে কিছুনা কিছু প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে এবং মানতে হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা ভুলের অনুসরণ করে চলেছে এবং তারা ভ্রান্তির শিকার। সুতরাং Cracy Morrison তাঁর রচিত "ঈমানের প্রতি আহবানকারী হিসেবে বিজ্ঞান" পুস্তকে লিখেছেনঃ

"এ বিশ্বে বিরাজমান রয়েছে অসংখ্য নিয়ম পদ্ধতি শৃঙ্খলা, যার অবর্তমানে এ সৃষ্টির অস্তিত্বও টিকে থাকাই সম্ভব নয়, এ নিগূঢ় সত্য এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এসৃষ্টির স্রষ্টা অবশ্যই একজন আছেন এবং এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এবং তার উৎকর্ষ সাধন সারা বিশ্বে বিরাজিত কর্মসূচীরই একটি দৃশ্যমান ও স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

যা কিছু আবিষ্কার উদ্ভাবন এ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানগোচর হয়েছে তা ছাড়াও এখনো

অনেক অনেক জিনিস মানুষের জানতে বাকি আছে, এখনো অনেক জিনিস মানুষের জ্ঞান ও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসেনি। আবিষ্কৃত জিনিসের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু অণু (Atom) কেও ভাংতে সফল হওয়ায় বড় সত্য ও শক্তির ধ্যানধারণা সম্পর্কে চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে। শুধু এতটুকুই নয় যে প্রাণহীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু কণার সম্মিলনের ফলে যে নুতন ও বিস্ময়কর সৃষ্টির উদ্ভাব হয়, বরং এ মহাসত্য আমাদের চিন্তারাজ্যে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করেছে, বরং সত্য করে বলতে কি আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা, প্রকৃতির বাহ্যিক ও দৃশ্যমান পর্দার আড়ালে যে মহাস্রষ্টা বিরাজ করছেন, তাঁর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে।"

"কিন্তু ইসলামী চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন তাদের জন্য এসব ক্লান্তিকর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই হয়নি, বরং সেই যুগে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতা সঞ্জাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন যখন সকল দিক দিয়ে ইউরোপ অন্ধকারের অমা-নিশায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। এই কারণেই বলা যায় যে, ঐ সময় ইসলামী চিন্তাধারা ছিল আল্লাহ্প্রদত্ত হেদায়েত দ্বারা পরিচালিত ও তার বুদ্ধি ছিল আল্লাহ্র নূরের আলোকে উদ্ভাসিত এবং রূহ বা পরমাত্মা থেকে আলোকপ্রাপ্ত।

ইসলামী আইনকানুন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

ইসলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে আইনকানুন তৈরির মধ্যে যুক্তির যে এক বিশেষ স্থান আছে সে বিষয়ে জ্ঞান গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করছে। সুতরাং এ বিষয়ে কুরান এরশাদ করছেঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَّا أُوْلِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

-(البقرة : ١٧٩)

"আর তোমাদের জন্য রয়েছে শাস্তির মধ্যেই জিন্দেগী। হে বুদ্ধিমানেরা! এ হুকুম পালন করলেই হয়তো তোমরা অন্যায় কাজকে পরিহার করতে পারবে।" (বাকারা-১৭৯)

وَاِنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. -(البقرة : ١٨٤)

"কিন্তু তোমরা যদি রোজা রাখ তাহলেই তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগালেই একথা বুঝবে।" (বাকারা- ১৮৪)

يَسْئَلُوْنَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ط كَذَالِكَ يُبَيِّنَ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ. -(البقرة : ١٢٩)

"ওরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে; বল, ও দুটো জিনিষে ভীষণ ক্ষতি রয়েছে আর মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে; কিন্তু ও গুলোর ক্ষতি উপকার থেকে বেশি। আরো ওরা জিজ্ঞাসা করছে তোমাকে তারা কি খরচ করবে (আল্লাহ্‌র পথে)? বল, তাই খরচ করবে যা তোমাদের প্রয়োজন থেকে বেশি। এমনি করেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে স্পষ্ট করে জানান তার আয়াতগুলো যাতে করে তোমরা চিন্তা করতে পার।" (বাকারা- ১২৯)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَّ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. -(البقره : ٢٣٠)

"তালাক দেয়ার নিয়ম (আল্লাহ্‌র দেয়া ব্যবস্থা মতে) দু'বারে। তারপরে, সুন্দরভাবে তাকে (স্ত্রীকে) রাখা যেতে পারে অথবা সুন্দর ব্যবহারের সাথে তাকে বিদায় করা যেতে পারে। আর তোমাদের জন্য ফিরিয়ে নেয়া হালাল হবে না ঐ সমস্ত জিনিস যা তাদেরকে তোমরা দিয়েছ। তবে, তারা উভয়ে যদি ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্‌র দেয়া সীমার মধ্যে তারা টিকে থাকতে পারবে না (যদি পুনরায় একত্রে সংসার করে) সে অবস্থায় (স্ত্রীর নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য) বিচ্ছিন্নতা লাভের কামনায় স্ত্রী কিছু বিনিময় দিতে চাইলে তা গ্রহণ করে পরিত্যাগ করায় কোন বাঁধা নেই, (স্ত্রীও নিজেকে এই ভাবে মুক্ত করে নিতে পারে)। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সীমানা। এই সীমানা তোমরা কেউ অতিক্রম করো না। যে ব্যক্তি (স্বামী বা স্ত্রী বা ন্য কেউ কুপরামর্শের মাধ্যমে) এই সীমানা অতিক্রম করবে তারাই হবে জালিম। এভাবে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় (অর্থাৎ দু বারে তালাক দিয়ে, এরপর তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে বা দু তালাকের পর তিন মাস অপেক্ষা করার মাধ্যমে) তারপর ঐ স্ত্রী ঐ ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত আর হালাল হবে না যতক্ষণ সে (স্ত্রী) অন্য কোন ব্যক্তিকে বিয়ে না করে নেয় (শুধু আকদ নয়, বরং স্বামী স্ত্রী হিসাবে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীতে পরিণত হওয়া)। এর পর যদি ঐ (দ্বিতীয়) স্বামী (সেই হতে পারবে যদি তারা বুঝে যে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত এ

বিধান তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন ঐ অতিক্রম করার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক)"। (বাকারা-২৩০)

وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ . كَذَالِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. (البقرة ك .١٤ - ٢٤١)

"এ ভাবে (উপরোক্ত পদ্ধতিতে) যে সকল স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকে মুনাসিবত কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত, মুত্তাকী (আল্লাহ্‌ভীরু, যারা সব ব্যাপারেই আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে এবং আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহি করার খেয়াল রাখে) তাদের উপর (স্ত্রীদের) হক (পাওনা) এ ভাবে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে স্পষ্ট করে তার আয়াতগুলো (বিধানগুলো) জানাচ্ছেন যেন বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে পার (এবং তোমাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পার)।" (বাকারা- ২৩১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا . فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَ لَا تَسْاَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ. ذَالِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ لَّا تَكْتُبُوْهَا وَ اَشْهِدُوْا . اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيْدٌ ج وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ . -(البقرة : ٢٨٢)

"হে ঐ সকল ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্জের লেন-দেন কর তখন তা লেখাপড়া করে নাও। দাতা-গ্রহীতা উভয়ের মধ্য থেকে কোন এক ব্যক্তি চুক্তিপত্র যেন লিখে দেয়। লেখাপড়ার যোগ্যতা আল্লাহ্ তায়ালা যাকে দিয়েছেন এরকম কোন ব্যক্তিকে লিখতে বললে সে যেন অস্বীকার না করে। এইভাবে লেখক লিখবে এবং যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব বর্তায় (অর্থাৎ কর্জ যে নিচ্ছে) সে ঋণের বিবরণ লেখানোর জন্য নিজ মুখে বলবে। তাকে আল্লাহ্র ভয় রাখতে হবে যিনি তার প্রতিপালক। কারণ, যে পরিমাণ ঋণগ্রহণ করা হচ্ছে তা উল্লেখ করার সময় কম-বেশী না করা হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি কম বুদ্ধি অথবা দুর্বল হয়, অথবা বিবরণের কথাগুলো ঠিকমত বলতে না পারে তাহলে তার পক্ষে তার কোন অভিভাবক যেন বিবরণ লেখায় ইনসাফের সাথে এবং সঠিকভাবে। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী গ্রহণ করো আর দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ সাক্ষী এবং তোমাদের পছন্দমত দু'জন মহিলা সাক্ষীকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করো যাতে করে একজন ভুলে গেলে অপর জন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর যখন কোন ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় তখন তারা যেন সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। আর ছোট খাটো লেন-দেন হোক বা বড় লেন-দেন হোক পরিশোধের নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করে চুক্তিপত্র লিখে নিতে কোন গাফলতি করোনা এটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি, সাক্ষ্যকে মজবুত বানানোর উত্তম এক ব্যবস্থা এবং কোন সন্দেহের মধ্যে না পড় তার জন্য সর্বাধিক সঠিক ব্যবস্থা। তবে, যে সমস্ত ব্যবসায়ের আদান-প্রদান তোমরা সামনা-সামনি এবং হাতে হাতে কর সেগুলো না লিখলেও তেমন কোন অসুবিধা নেই; কিন্তু সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান প্রদানেও সাক্ষী রেখে নিও এবং লেখক ও সাক্ষীকে কোনভাবে যেন কষ্ট দেয়া না হয়। এধরনের কাজ বা ব্যবহার যদি কর তাহলে গুনাহে কবীরাই করা হবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মপদ্ধতি শেখাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেবহাল।" (বাকারা-২৮২)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ اَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ
وَ خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْاَخِ وَ بَنَاتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهَاتُكُمُ الَّتِى اَرْضَعْنَاكُمْ
وَ اَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهَاتُ نِسَائِكُم اللَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَاِن لَم
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ
اَصْلاَبِكُمْ وَ اَن تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَت اَيمَانُكُم كِتَابَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
فَرِيْضَةً وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ج
وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ ج بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ط فَانْكِحُوْا هُنَّ بِاِذْنِ
اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
وَ لاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ. فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ج ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم ج
وَ اَن تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

-(النساء : ٢٣ - ٢٦)

"বিয়ে হারাম যাদের সঙ্গে তাদের বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীম বলছেঃ "তোমদের উপর (বিয়ে) হারাম করা হয়েছে (১) তোমাদের মাদেরকে, (২) তোমাদের মেয়েদেরকে? (৩) তোমাদের বোনদেরকে, (৪) তোমাদের ফুফুদেরকে, (৫) তোমাদের খালাদেরকে, (৬) তোমাদের ভাইজিদেরকে, (৭) তোমদের ভাগ্নিদেরকে, (৮) তোমাদের দুধ মাদেরকে, (৯) তোমাদের দুধ-বোনদেরকে (১) তোমাদের

শাশুড়ীদেরকে, (১১) তোমাদের স্ত্রীদের (আগের পক্ষের) মেয়েদেরকে, অবশ্য যদি তাদের সঙ্গে ঘর-সংসার করে থাক, আর যদি বিয়ের আকদ হয়েছে কিন্তু ঘর-সংসার করা সম্ভব হয়নি এমন হয়, তাহলে তাদের পেটের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হারাম নয়। (১২) তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলেদের বৌদেরকে বিয়ে করাও চিরদিনের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। (১৩) দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করাও হারাম, তবে যা হওয়ার তা হয়েছে, (ইসলাম গ্রহণ করার পর সে বিষয়ে কোন ধর-পাকড় করা হবে না) অবশ্যই আল্লাহপাক মাপ করনেওয়ালা মেহেরবান এবং (১৪) অপর সকল বিবাহিতা স্ত্রীলোক, যারা কারো হেফাজতে রয়েছে তাদেরকেও বিয়ে করা হালাল নয় (যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজ নিজ স্বামীদের অধীনে রয়েছে। এর বাইরে ঐ সকল মেয়েদেরকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করা হালাল যারা যুদ্ধ বন্দিনী হিসেবে আসার পর সরকার কর্তৃক কোন চুক্তির মাধ্যমে বিনিময় বা ফেরত দেয়া হয়নি এবং যাদেরকে মুজাহিদদের মধ্যে সরকার কর্তৃক বন্টন করে দেয়া হয়েছে, তারা দাসী হিসেবে হালাল)। (প্রকাশ থাকে যে, দাস-দাসী কেনা-বেচার প্রথা আগে যা ছিল রাসূল (সঃ) মুসলমানদের জন্য স্বাধীন মানুষের সেই কেনা-বেচার প্রথা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন)। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত তোমাদের জন্য স্থায়ী বিধান যা মেনে চলা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই তালিকার বাইরে অপর সকলকে দেন মোহর-এর বিনিময়ে (উর্দ্ধে চার সংখ্যা পর্যন্ত) বিয়ে করা হালাল, তবে শর্ত হচ্ছে বিয়ে করতে হবে স্বাধীনভাবে যৌনসম্ভোগ করার জন্য নয়। তারপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তাদের থেকে নেবে তার বিনিময়ে তাদেরকে ফরজ জ্ঞানে মোহ্র আদায় করবে। অবশ্য (পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে) মোহ্র নির্দ্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পাত্র-পাত্রী উভয়ের সম্মতিতে যদি কোন আপোষ হয়ে যায় (মুহ্র লাঘব বা ক্ষমার ব্যাপারে) তাহলে সে বিষয়ে কোন বাঁধা বা অসুবিধা নেই। আল্লাহ্পাক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। আবার যদি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কোন মেয়ে, (যে পারিবারিক নিরাপত্তা পাওয়ায় সম্মানী হয়েছে) তাকে বিয়ে করার মত আর্থিক যোগ্যতা না রাখে তাহলে সে যেন তোমাদের কারো দাসী মুমিনাকে তার মুনিবের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে (কারণ, সে ক্ষেত্রে তা মুহ্র খুব কম ধার্য করলে চলবে)। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ঈমানের অবস্থা ভাল করেই জানেন। তোমরা ঈমানদারেরা (ঈমান রাখার কারণে) একই গোষ্ঠির লোক। অতএব, তাদের মুনিবদের থেকে অনুমতি হাসিলের ভিত্তিতে তাদেরকে নির্দিষ্ট মুহ্রের বিনিময়ে অনুমোদিত পন্থায় বিয়ে করে নাও যাতে করে তারা বিয়ের নিরাপত্তামূলক পদ্ধতির সুযোগ লাভ করতে পারে এবং লাগামহীন যৌনসাথী হিসাবে বিহার করতে না পারে অথবা লুকোচুরি করে প্রেম-বিনিময়ে লিপ্ত না হয়। এইভাবে বিয়ে-শাদীর রক্ষাকবচ লাভ করার পর ঐ দাসীরা যদি কোন অসৎ পন্থা অবলম্বন করে বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সে অবস্থায় তাদেরকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়াদের তুলনায় অর্দ্ধেক শাস্তি দেয়া হবে। (প্রকাশ

থাকে যে, অবিবাহিত নর-নারীর জন্য ব্যভিচারের সাজা একশত চাবুক, এর অর্ধেক বিবাহিত দাস-দাসীদের সাজা) যদি সবর করতে পার এবং দাসীদেরকে বিয়ে না করে আর্থিক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টায় লেগে থাক যেন সচ্ছল হলে ও সম্ভ্রান্ত কোন মহিলার মোহ্র আদায় করার যোগ্যতা অর্জন করে ভাল মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অপেক্ষা কর তাহলে সেটা তোমাদের জন্য বড়ই কল্যাণকর হবে (কারণ, দাসীদের নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়) এতে তোমাদের সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে আল্লাহ্পাক ক্ষমাশীল ও রহমদিল। আল্লাহ্ তায়ালা এ সকল পদ্ধতি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা ঐ পদ্ধতিগুলো মেনে চল যা তোমাদের পূর্বেকার নেক লোকেরা মেনে এসেছে। তিনি নিজ উদার ও মহান দয়া সহকারে তোমাদের দিকে রুজু করতে চান। তিনি মহাজ্ঞানবান, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞানময়।" (নিসা ২৩-২৬)

ذَالِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ ط
كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . -(المائدة : ٨٩)

"এটাই তোমাদের শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা, যখন তোমরা কোন কিছু সম্পর্কে কসম খেয়ে তা রক্ষা না কর। নিজেদের শপথগুলোর মর্যাদা রক্ষা করবে। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নির্দেশগুলো তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন (সেগুলো পালনের মাধ্যমে) তোমরা তাঁর শুকুরগুজারি করতে পার।" (মায়েদা-৮৯)

وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَ اِنَّ كَثِيرًا
لَيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ .
-(الانعام : ١١٩)

"অথচ আল্লাহ্ তায়ালা যেসব জিনিসকে মজবুরী অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল সময়ের জন্য হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর স্পষ্ট বিবরণ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর অধিকাংশ জনগণের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে ভুল পথ অবলম্বন করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা অতিক্রম-কারীদেরকে ভাল করেই জানেন।" (আনআম-১১৯)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.
-(الجمعة : ٩)

"হে ঈমানদারগণ! জুমার দিনে নামাযের জন্য যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (আযানের মাধ্যমে নামাযের প্রতি আহবান জানান হয়) তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ-

এর (কাজের) দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং কেনা-বেচা (ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য যে কোন কাজ) পরিত্যাগ কর। এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর (তোমরা বুঝবে) যদি তোমাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার কর।" (জুমা'আ-৯)

শরীয়াতের বিধানের যৌক্তিকতার চেতনা

নিঃসন্দেহে শরীয়াতের যাবতীয় বিধান আল্লাহ্ তায়ালাই নাযিল করেছেন, কিন্তু এটাও সত্য যে, বাস্তব জীবনে মানুষই সে বিধানকে কাজে লাগায় বা মেনে চলে। সুতরাং তাদের চিন্তা-চেতনায় এই বিধানগুলোর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা যথাযথভাবে অনুভূত হতে হবে। তা না হলে সেগুলোর পূর্ণ অনুসরণ ও প্রয়োগ সম্ভব হবে না।

মানুষের জীবন কোন যন্ত্র নয় যে, শরীয়াতের বিধানে কোন মূলনীতিকে তার উপর তেমনি চাপিয়ে দেয়া হবে যেমন মেশিনের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, আর অমনি তা চলতে শুরু করে, বরং মানুষের জীবন প্রতি মুহূর্তে এবং ধীর ধীরে চলে ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এই জন্য শরীয়াতের আইন কানুনের মধ্যে যৌক্তিকতার অস্তিত্ব আছে বলে মানুষ যদি না বুঝে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন আইন-কানুনের পারস্পরিক সম্পর্ক উদঘাটন করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় শরীয়াতের হুকুম-আহকাম কার্যকরী করতে সক্ষম হবে না। এ কারণেই কুরআনুল কারীম মানুষের যুক্তি-বুদ্ধিকে এ সকল আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে আহ্বান জানিয়েছে এবং এই আয়াতসমূহ ও বিধানগুলো ভাল করে চেনে বুঝে সেগুলোর উপর সঠিকভাবে আমল করার জন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যদিও কুরআনুল কারীমে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলো চিন্তা-ভাবনার জন্য স্পষ্টাক্ষরে কোন আহবান পাওয়া যায় না। কিন্তু এটাই প্রকৃতপক্ষে সত্য যে, কুরআনুল কারীমের সাধারণ আহ্বানই হচ্ছে যে, কোন হুকুম-আহকাম পালনের পূর্বে তা ভালভাবে বুঝে ও চিন্তা করে যেন নিজেদের জীবনে পালন করা হয়। কুরআনুল কারীমের মধ্যে উল্লেখিত সকল নির্দেশের প্রাণই এটা। এর অর্থ অবশ্য কেউ যেন এমন না ভাবে যে, নিজের যুক্তি-বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তা গ্রহণ করা হবে না, বরং মুক্ত ও সুস্থ বুদ্ধি নিয়ে মানুষ যখনই কুরআনুল কারীমের নির্দেশগুলো বুঝার চেষ্টা করবে তখন অবশ্যই তার কাছে এ নির্দেশগুলোর যৌক্তিকতা ধরা পড়বে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হচ্ছে আবেগমুক্ত ও যে কোন জিনিষের প্রভাবকে ঝেড়ে মুছে ফেলে সব কিছুর দিকে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি দান করা।

ফিকাহ্ শাস্ত্র বা আইন-কানুন রচনার ক্ষেত্রে মুসলিম ফকীহ্গণ কত গভীরভাবে জ্ঞান-গবেষণা করে আইনের যে বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন তা আমাদের

নজরের সামনে আছে এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের এ পুঁজি এখনও পূর্ণ যৌবনী শক্তি নিয়ে আমাদেরকে পথ দেখাতে প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে যথাযথভাবে পড়াশুনা করলে আপনি আমি যে কোন লোক বুঝতে পারবো যে, এ শাস্ত্রের মধ্যে জ্ঞান-গবেষণা কত গভীরভাবে করা হয়েছে এবং যত সুন্দরভাবে যুক্তি প্রমাণ সহকারে প্রতিটি আইনের কার্যকারীতা তুলে ধরা হয়েছে। আর যুক্তি বুদ্ধির এ উৎকর্ষ সাধন এ জন্যই যে কুরআনের উদাত্ত আহ্বানই হচ্ছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের সাথে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে প্রতিটি আইন-কানুনকে বুঝবার চেষ্ট করা।

ইসলামের প্রথম অধ্যায়েই কুরআনে উল্লেখিত মজবুত, দ্ব্যর্থহীন ও বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার ও সেগুলো কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা জানা বুঝার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) ঐ সকল দাসদের উপর চুরির দায়ে হাত কাটা শাস্তি প্রয়োগ করেননি যারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে (হাতেব ইবনে আবি বালতাআর উটনী) চুরি করেছিল,বরং তিনি হাত কাটার শাস্তিকে নাকচ করে দিয়েছিলেন 'ক্ষুধার তীব্রতা'কে যুক্তিসংগত অজুহাত হিসাবে পাওয়ার কারণে। তিনি বলেছিলেনঃ

" আল্লাহ্র কসম, আমি যদি জানতে না পারতাম যে, তুমি তাদের শ্রম গ্রহণ করো, অথচ তাদের ক্ষুধা মেটানোর মত যথেষ্ট মজুরী দাও না তাহলে অবশ্যই তাদের হাত কেটে ফেলতাম।"

হযরত ওমর (রাঃ) এ জন্যই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র আইনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং আইনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই কঠোর শাস্তির যৌক্তিকতা তালাশ করতে পেরেছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। এই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার মূল কারণ হচ্ছে যে, উলিল আম্র (শাসনকর্তা ও দায়িত্বশীল) হওয়ার কারণে দুঃখীজনের অভাব দূর করতে হবে এবং তাদেরকে সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েই তাদের নিকট থেকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়ার দাবী করতে হবে এবং তখনই তাদেরকে শাস্তি দেয়া যুক্তিসংগত হবে।

অপর দিকে, ইসলাম শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছে তাতে দেখা যায় সেখানে কোন বিষয়ের খুব বিস্তারিত আলোচনা নেই, বরং রাষ্ট্র পরিচালনা ও অর্থ সম্পদ আয় ও ব্যয়ের মূলনীতি পেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। কারণ, বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা কোন আইন বিশেষ কোন যুগের মধ্যে ও বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেও স্বভাব প্রকৃতি ও জীব হিসেবে তার প্রয়োজনকে সামনে রেখে (সর্বসাধারণ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকে সামনে রেখে) যে মূলনীতি পেশ করা হয় তা হয় চিরন্তন, তা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় প্রজোয্য এবং সবার কাছেই এবং সবার যুক্তিবুদ্ধির কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

উপরন্তু, এই বুদ্ধিবৃত্তির স্বীকৃতি দান করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করা হয়েছে এবং জ্ঞান-গবেষণা বা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সবার জন্য রয়েছে অবারিত দ্বার। একথা মেনে নেয়ায় আগামী দিনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভাবনাময় হয়ে গিয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিন্তু জ্ঞান গবেষণার মূলনীতির চারটি ভিত্তি আজও অম্লান এবং চিরদিন অম্লান থেকে মানুষকে আঁধারে পথ দেখাবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

মূলনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ-আদাল বা ইনসাফ ও শুরা বা পরামর্শঃ

শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছেঃ আদ্‌ল ইন্‌সাফ ও শূরা পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ . (النساء : ٥٨)

"আর জনগণের মধ্যে যখন ফায়সালা করবে তখন ইন্‌সাফের সাথে ফায়সালা করবে।" (নিসা-৫৮)

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ . -(الشورى : ٣٨)

"তাদের কাজ হবে পরামর্শভিত্তিক।" (তওবা-৩৮)

অর্থাৎ, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়। এককভাবে সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই তা ত্রুটিপূর্ণ হবে-মানুষ হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি সীমিত বুদ্ধি জ্ঞানের অধিকারী একথা স্বীকার করা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার উপর ঈমানের কারণেই নিজের কমতি অনুভব করার কারণেই এই পরমর্শ করার মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি হয়। আর এর ফলেই ডিক্টেটরী মনোভাব বিদূরিত হয়।

তবে ইসলাম পরামর্শ করার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নিঃ গোত্রীয় ও বংশীয় নেতাদের মধ্যে এ পরামর্শ হবে, পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে হবে, নির্বাচিত পার্লামেন্টারী সদস্যদেরকে নিয়ে হবে বা মনোনীত সদস্যদেরকে নিয়ে, এক কক্ষবিশিষ্ট গণপরিষদে না দু; কক্ষবিশিষ্ট পরিষদে-এগুলোর কিছুই উল্লেখ করা হয়নি শুধু বলে দিয়েছে যে, পরামর্শভিত্তিক হতে হবে। বাকি অবস্থা, পরিবেশ, সময়-সুযোগ, মানুষের চাহিদা যখন যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারেই পরামর্শসভা করা হবে এবং জনগণের দাবী অনুসারে তাদের দ্বারা যে কোন বিষয়ের ফায়সাল গৃহীত হবে। আগে ভাগে এই পরামর্শ সভার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। কারণ এ গুলো বিভিন্ন অবস্থা ও মানুষের মন মেজাজের বিভিন্নতা অনুসারে পরিবর্তনশীল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআন মজীদে উল্লেখিত মূলনীতিঃ

لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۔ –(الحشر : ٧)

"সম্পদ যাতে করে তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যেই শুধু আবর্তিত না হতে থাকে।" (হাশর-৭)

তার জন্যই যাকাত ও অন্যান্য সদকার মাধ্যমে এবং মীরাস বন্টনের দ্বারা সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা ইসলাম দান করেছে।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলাম ঐ অবস্থাকে অপছন্দ করেছে যে, সীমিত কিছু লোকদের মধ্যে অর্থ সম্পদ আবর্তিত হতে থাকবে, আর অধিকাংশ মানুষ শুধু বঞ্চিতই হতে থাকবে, তাদের মধ্যে সম্পদের কোনভাগ পৌঁছুবে না। এখন সমস্যা হচ্ছে সমগ্র সম্পদের মধ্যে অংশীদারিত্ব পাবে কোন্ উপায়ে? এ প্রশ্নটিকে ইসলাম পরিবর্তনশীল বিভিন্ন অবস্থার উপর ন্যস্ত করেছে এবং প্রতিটি যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও চাহিদার উপর এই বন্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা যত বিস্তারিতই হোক না কেন মূল বুনিয়াদ থেকে যেন দূরে সরে না যায় বা জাগীরদারী বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ যেন না পায়। অথবা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত মালিকানা ছিনিয়ে নেয়ার দিকে ঝুঁকে না পড়া হয়।

উপরোল্লিখিত কারণ ও অবস্থাসমূহ আসতে পারে বিধায় ইসলাম চায় যে, মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-কানুনগুলো চিন্তা-ভাবনা করে তার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝার চেষ্টা করুক এবং ভালভাবে বুঝে নিয়ে সেগুলো পালন করতে ব্রতী হোক। যার ফলে সকল কাজ আল্লাহ্পাকের দেয়া বিধান মুতাবেক আঞ্জাম পেতে পারে এবং হক ও ইনসাফের দাবি পূরণে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে এ সত্যটিও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনুল কারীম যাবতীয় হেদায়েত ও নির্দেশাবলী দিতে গিয়ে আল্লাহ্র স্মরণ, আল্লাহ্ভীতি ও তাক্বওয়া পরহেজগারীর ব্যাপারেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং প্রতিটি কাজের পরিণতিতে সাওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহকে জাগরুক রেখেছে ও সদা-সর্বদা উৎসাহিত করেছে।

যাই হোক, ইসলামী আকীদার সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তা বিশাল এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তি-সত্তাকে ব্যবহার করার যোগ্যতা ও সুযোগ দান করে দিয়েছে এবং কোনভাবেই বুদ্ধির গতিকে বাঁধা দেয়নি বা সীমাবদ্ধও করে দেয়নি। উপরন্তু ইসলামী দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারেও ইসলাম মানুষের বুদ্ধির উপর অস্বাভাবিক কোন বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। মানুষের বুদ্ধিকে অবোধ্য ও রহস্যপূর্ণ তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্তও করেনি; বরং ইসলাম মানুষের বুদ্ধিকে সরাসরি সম্বোধন করে তাকে জাগিয়ে তুলেছে, তাকে চেতনা দান করেছে, তাকে

উৎসাহিত করেছে এবং মানব-বুদ্ধিকে ঈমানের দাবি অনুসারে বোধগম্য ও যুক্তিপূর্ণ কাজের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। সর্বোপরি মানুষকে অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টি দান করে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছে।

এতটুকুই শধু নয় যে, এসব কিছুর বোঝা ও দায়-দায়িত্ব মানুষের বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করেছে, বরং এর সাথে মানুষের বুদ্ধির গতিপথকে আলোকিত করতে পারে এমন উজ্জ্বল ও তেজোদৃপ্ত রূহানী শক্তিও দান করেছে। আর এসব কিছু মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের বাস্তব সত্তার সাথে পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ।

মানুষের বুদ্ধিগত শক্তির পথ নির্দেশনা

ইসলাম যেমন করে সৃষ্টিলোকের নিদর্শনসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা করে মানুষকে সত্যকে পাওয়ার শক্তি দান করেছে, তেমনি করে মানব বুদ্ধিকে ঐ সত্য বুঝারও তৌফিক দিয়েছে, যার দ্বারা জমীন, আকাশমণ্ডলী ও মানুষের সৃষ্টিকাজ চলছে এবং ঐসত্য বুঝারও শক্তি দান করেছে, যার কারণে মানুষ সততার সাথে জীবনযাপন করে এবং সেই সত্যের জন্য জিহাদ করে। এভাবে মানব বুদ্ধিকে ইসলাম এ সুযোগও দিয়েছে যে, আল্লাহ্পাকের মেহেরবানীক্রমে তাঁর প্রদত্ত আইন-কানুনের তাৎপর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং কার্যকারিতা জানতে ও বুঝতে পারে, সে আইন অনুসারে নিজেদেরকে ও অপরকে চালাতে পারে।

আর এইভাবে আইন, আখিরাত সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা, সদাসর্বদা আল্লাহ্র ভয় মনের মধ্যে পোষণ করা (তাকওয়া) এবং জীবন ও সংসার সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশাবলী পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে মানুষের আবেগকে এমনভাবে উজ্জ্বল ও তেজোদৃপ্ত করে যে, তার দ্বারা মানব প্রকৃতির শুধু অভ্যন্তরীণ সংশোধনই হয় না, বরং সমাজকে সুন্দর করে তোলার, তার বাহ্যিক কাজগুলো শান্তিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যও হাসিল হতে থাকে।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ইসলাম এমন শাস্তি ও সাজার ব্যবস্থা করেছে যার ফলে, আমীর-ফকীর, ধনী-গরীব, বড়-ছোট সবার উপর আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে শাস্তি-সাজা দান করাই ইসলামের আসল উদ্দেশ্য নয় এবং শাস্তি-সাজার মাধ্যমেই মানুষের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয় না। এর দ্বারা সমাজের মধ্যে বহুলাংশে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অর্জিত হয় বটে; কিন্তু এ শাস্তির দ্বারা মানুষের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবেই এর জামানত দেয়া যায় না। বরং এটা এমন একটি বিষয় যার জন্য বিবেকের অভ্যন্তরীণ এক আগ্রহ আবশ্যক এবং এমন আন্তরিক চাহিদা প্রয়োজন যা বাস্তবায়িত করার জন্য আইনের বন্ধনের প্রয়োজন হয় না। বরং তা নিজ প্রাকৃতিক

ও স্বাভাবিক উন্নতির জন্য উর্দ্ধাকাশের দিকে উঠতে থাকে; আর তার জন্য বিশেষ কোন আইনের প্রয়োজন হয় না, বরং পথ নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। আর আল্লাহ্‌র দিকে মনকে রুজু করারও প্রয়োজন হয়, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর রেজামন্দি হাসিল করার বাসনাও প্রয়োজন।

যেহেতু এদু'টি জিনিস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ আইনের কম-সে-কম হস্তক্ষেপ এবং মানুষের প্রকৃতিগত উন্নতির স্বাভাবিক ও চরম চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক। এজন্য একদিকে কুরআনপাক যেমন আইন দিয়েছে, অপর দিকে মহামূল্যবান উপদেশ দান করে এ দুয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

ইসলাম এভাবে মানব-বুদ্ধিকে পথপ্রদর্শন করে একথার গ্যারান্টি দিয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত মানুষ কুরআনের এ নির্দেশনা মুতাবিক চলতে থাকবে ততদিন তাদের সামাজিক যাবতীয় কাজ সঠিক গতিপথ পেতে থাকবে। কারণ সমাজকে শান্তি দিতে হলে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। আর এ শক্তির প্রয়োগ শাসক ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বের অনুভূতি সহকারে হতে হবে।

"তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দায়িত্বের অধীনে যারা আছে তাদের উপর কি দায়িত্ব পালন করা হয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

যদি দেশ ও জাতির রাজনীতি বিবেক-সিদ্ধ (মানুষের মন ও বুঝমত) না হয় তবে সে রাজনীতি শান্তির পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং এই বিশৃঙ্খলার পরিণতিতে সমাজে আসবে অশান্তি এবং দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। এজন্য জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব, সমাজের প্রতিটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা এবং যে সকল কাজ সরাসরি তার ইখতিয়ারাধীন আছে সেগুলো সম্পর্কে জওয়াবদিহির অনুভূতি নিয়ে চিন্তা করা এবং এ বিষয়ে উদাসীনতা, বাড়াবাড়ি ও কোন প্রকার জুলুম এবং বে-ইনসাফী যাতে না হয়ে যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। কারণ, সমাজের কতিপয় ব্যক্তির গাফলতী এবং কিছু সংখ্যক লোকের আম্‌র-বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার-এর (ভাল ও সর্ববিদিত কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দান ও মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার) দায়িত্ব পালন না করার মন্দ পরিণতি গোটা সমাজকেই ভুগতে হয়।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً . (الانفال:٢٥)

"আর ঐ ফিৎনা ও বিশৃঙ্খলাকে ভয় কর এবং তার মন্দ পরিণতি থেকে বেচেঁ থাক যা তোমাদের মধ্যকার জালিমদেরকেই শুধু স্পর্শ করবে না।"

(আনফাল-২৫)

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ط كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ج لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ. -(المائدة : ٧٨ - ٧٩)

"বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে যারা কুফরীর পথ গ্রহণ করল তাদের উপর দাউদ ও মূসার জবানীতে লা'নত বর্ষণ করা হয়েছে, কারণ তারা অহংকারী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিল। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল; বড়ই নিকৃষ্ট ধরনের কাজ তারা করেছিল।" (মায়েদা ৭৮-৭৯)

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় কাজ দেখলে সে তা যেন প্রতিরোধ করে নিজ হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে), এতটুকু করবার শক্তি সাহস না থাকলে সে যেন মুখের ভাষা দ্বারা তার প্রতিরোধ করে, তাও যদি না পারে তবে অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা যেন গ্রহণ করে। এতটুকু কাজ করলেও বুঝা যাবে তার মধ্যে ঈমানের ক্ষীণতম অংশ বর্তমান আছে।" (বুখরী-মুসলিম)।

"আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজগুলো থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখবে। একাজ না করে আমার কাছে যদি দোয়া কর সে দোয়া আমি কবুল করবো না; তোমরা চাইবে কিন্তু আমি দেবো না, আর তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু আমি সাহায্য করবো না।" (ইবনে মাজা, ইবনে হাববান)

এটাতো স্পষ্ট কথা যে, সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা, দায়িত্বের অনুভূতি এবং সফল কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য সঠিক চেতনা এবং পরিপক্ক বুদ্ধির প্রয়োজন। আবার এ বুদ্ধি শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনও আছে এবং এ ভাবেই সকল কাজকে বুদ্ধিবলে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে।

কুরআনুল কারীম বিভিন্ন আয়াত ও উপদেশাবলী দ্বারা বুদ্ধির ব্যবহার ও তদনুযায়ী কাজ করতে শিখিয়েছে। কখনো মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন সম্পর্কে অ্যহিত করেছে, যেন তারা সদা-সর্বদা তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তাদের কু-পরামর্শ থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকে। কখনো গুজব ছড়িয়ে পড়লে কি করতে হবে তা জানায় এবং কোন খবর এলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করে। কখনো মুসলমানদেরকে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেয়ার জন্য বলে এবং পূর্ণ সতর্কতার সাথে মানুষের কীর্তিকলাপ ও বিভিন্ন অবস্থার উপর নজর রাখে। আবার কখনো দেখা যায় যে, কুরআনুল কারীম মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সীমার মধ্যে উলিল-আমর

(পরহেজগার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হুকুমদাতা বা দায়িত্বশীল)-এর আনুগত্য করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً ج وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ط قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتُ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. هَا اَنْتُمْ اُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ . قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. هَا اَنْتُمْ اُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ لَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ج قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا . وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ .

(اٰل عمران : ١١٨ - ١٢٠)-

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের দলীয় লোকদের ব্যতীত অন্য কাউকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিয়ো না। তোমাদের ক্ষতি করতে ওরা কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না। তোমরা কষ্ট পাও এটাই ওরা পছন্দ করে। ওদের (অন্তরের) ঘৃণা ওদের মুখের উপর ফুটে উঠেছে, আর বুকের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে তা সব থেকে বেশি মারাত্মক। অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ্ তোমাদের নিকট আমার আয়াতগুলো (শক্তির নিদর্শন) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যাতে করে তোমরা সঠিকভাবে বুঝতে পার (আর সঠিকভাবে বুঝলেই তোমরা সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে।) হাঁ, তোমরা ওদেরকে মুহাব্বত কর, কিন্তু ওরা তোমাদেরকে মুহাব্বত করে না। অথচ, তোমরা তো সমস্ত আসমানী কিতাবকে (আল্লাহ্র কিতাব হিসেবে) বিশ্বাস কর। আবার তোমাদের সঙ্গে ওদের সাক্ষাত হলে ওরা বলে উঠে আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, ঈমান এনেছি। আর যখন তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে দূরে সরে যায় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে রাগে নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। হে রাসূল বল! মরো তোমরা নিজ রাগের আগুনে জ্বলে-পুড়ে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরের মধ্যে লুকানো গোপন কথাগুলো জানেন। তোমাদের কোন কল্যাণ হলে ওদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের অকল্যাণ হলে

তাতে ওরা খুশী হয়। কিন্তু জেনে রেখো তোমাদের মধ্যে অবিচলতা থাকলেও তোমরা সবর করলে তাদের এই ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ওরা যা কিছু করছে নিশ্চয়ই সেগুলো আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" (আলে-ইমরান-১১৮-১২০)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذَالِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

-(النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদারেরা! আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার হুকুমদাতাদেরও (মুমিনদের হুকুমদাতা বা শাসক- পরিচালক ঈমানী ও পরহেজগারীর নিরিখে তাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি হবে।) তারপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ দেখা দেয় তবে সে বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীস অনুসারে ফায়সালা করে নাও।) যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল।" (নিসা-৫৯)

وَ اِذَا جَائَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ج وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ وَ رَحْمَتُهٗ لاَ تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً. -(النساء: ٨٣)

"আর ওদের কাছে নিরাপত্তা অথবা ভয়ের কোন খবর যখন আসে তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। এটা না করে তারা যদি ঐ খবর রসূলের নিকট পৌঁছায় বা তাদের দায়িত্বশীলের গোচরীভূত করে তাহলে তা এমন লোকজন জানতে পারবে যারা এর থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হবে। আসলে (তোমাদের দুর্বলতা এমন ছিল যে) যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র মেহেরবানী এবং রহমত না থাকতো তাহলে অল্প কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুকরণ করা শুরু করতে।" (নিসা-৮৩)

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ. (النساء : ٨٨)

"কি হলো তোমাদের, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দু'টি দল হয়ে গেল কেন?" (নিসা-৮৮)

قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. -(المائدة : ١٠٠)

"হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, পাক ও নাপাক কখনো সমান হয় কি? নিশ্চয়ই না। তা অপবিত্র জিনিসের আধিক্য তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা! আল্লাহকেই ভয় কর, তাহলে হয়তো তোমরা সফলতা লাভ করবে।" (মায়েদা-১০০)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا ج اَنْ تُصِيْبُوْا

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ . -(الحجرات : ٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে কোন ফাসেক ব্যক্তি (যে গুনাহে কাবীরা করে, অথচ অনুতপ্ত হয় না, বা সংশোধনও হয় না) যদি কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে সে খবরকে যাঁচাই করে দেখো (যে তা সত্য না মিথ্যা)। এমনও হতে পারে যে, সে খবরের উপর ভিত্তি করে এমন কোন কঠিন ব্যবহার করে বসবে যা সংশোধনের যোগ্য থাকবে না এবং (পরে ঐ খবরটির উপর ভিত্তি করে) কৃত কাজের জন্য লাঞ্ছিত হয়ে যাবে।" (হুজরাত-৬)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মত কুরআনুল কারীমে বর্ণিত অন্যান্য আরও বহু আয়াত থেকে জানা যায় যে, জীবনের বাস্তব ব্যবহারিক দিকের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা সদা-সর্বদা তাক্বওয়া (আল্লাহ্ভীতি) ও পরহেজগারী গ্রহণ করতেও আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ্ভীতির কারণেই মানুষ কুরআনের কথা মানতে পারে। আর এর সাথে সাথে বিভিন্ন আয়াতে একান্তভাবে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত হেদায়েত দান করা হয়েছে এবং সকল সামষ্টিক ব্যাপারগুলোকে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ জীবনের ঐ সকল মূল্যবোধকে মূল্যহীন কানাকড়ির ভিত্তিতে যেন মাপা না হয়, বরং ঐ সবের মূল্য ঈমানের পাল্লা দিয়েই মাপা দরকার এবং ঐ মূল্যবোধগুলোর বস্তুগত এবং পার্থিব মূল্য অহংকারপূর্ণ কর্তৃত্ব অথবা মিথ্যা মর্যাদাবোধ অথবা ঈমান বিধ্বংসী ফিৎনা বা ইচ্ছা শক্তিকে টলমলায়মান করে দেয়ার মত সাজ-সজ্জা অথবা দুনিয়ার কোন শক্তিকে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক কিংবা মনোবৃত্তি সম্পন্ন হোক না কেন। যাই হোক, কুরআনুল কারীম উপদেশ দান করার জন্য সব রকমের পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেঃ ভাল কাজের নির্দেশ মন্দকাজ নিষেধ করার সাথে সাথে, উদাহরণের জন্য ব্যবহৃত কেসসা-কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও উল্লেখ করে নসীহত করেছে। ঐ সকল জিনিস একই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে

ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা হলোঃ মানুষের অন্তরকে এমন সত্য জিনিসের মূল্যায়ন করার দিকে আকৃষ্ট করতে হবে যার মর্যাদা দেয়া জরুরী ও যা সঙ্গতভাবেই অনুসরণযোগ্য এবং যাতে করে মানব বুদ্ধিকে সেই সকল জিনিসের আসল মূল্য ও সঠিক পাল্লা দিয়েই মাপা যায়। এর ফল সমস্ত সামাজিক কাজগুলো এই হেদায়েতরূপ নূরের জ্যোতিতে আলোকিত হতে পারবে এবং কোন ব্যক্তি এমন কোন ত্রুটিপূর্ণ জিনিস দ্বারা ধোঁকা খাবে না, যা তাকে সত্যপথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে বা অলীক মর্যাদা, বিভ্রান্তিকর সম্পদ, ক্ষয়িষ্ণু শক্তি এবং উদগ্র চাহিদা তাকে ঐ সামগ্রিক কল্যাণ থেকে বিচ্যুত করবে যা আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েত এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র পথেই বর্তমান।

আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-পদ্ধতি বুঝার চেষ্টা সাধনা

কুরআনুল কারীম বুদ্ধি-শক্তিকে ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাজমান আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলো পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ط هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ .

(آل عمران : ١٣٨)-

"তোমাদের পূর্বে বহু যুগ অতীত হয়ে গেছে, এখন তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে দেখো, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র হেদায়েত ও হুকুম আহকামকে ভুল এবং নবীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। এ সকল কথা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী, পথনির্দেশিকা এবং মুত্তাকী পরহেজগারদের (যারা সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে) জন্য উপদেশ।" (আলে ইমরান-১৩৭-১৩৮)

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ.

(الانعام : ٦)-

"ওরা কি দেখেনি ওদের পূর্বে কত যুগবাসীদেরকে আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্) ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতাবান করেছিলাম এবং এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকেও দেয়া হয়নি। তাদের উপর তাদের চাহিদামত প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের (বাড়িঘরের পাশ এবং) নীচু

দিয়ে প্রবাহমান নদ-নদী বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তাদের নানা প্রকার অপরাধের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের যায়গায় অন্য জাতিসমূহকে জাগিয়ে তুলেছি।" (আন আম-৬)

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

-(الانعام : ١١)

"হে রাসূল তাদেরকে বল! পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে দেখো মিথ্যা প্রতিপন্ন-কারীদের কি (ভীষণ) পরিণতি হয়েছে।" (আনয়াম-১১)

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ. وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِى بَارَكْنَا فِيْهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ. -(الاعراف : ١٣٦ - ١٣٧)

"তারপর তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম। কারণ, তারা আমার আয়াতগুলোকে (শক্তির নিদর্শনগুলোকে) মিথ্যা বলে প্রচার করেছিল এবং তাদের ওয়ারিশ হিসেবে আমি (মহান আল্লাহ) সে সকল জাতিকে সেখানে আবদ্ধ করলাম যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের বরকতপূর্ণ এলাকাগুলোতে বসিয়ে দিলাম। এই বনী ইসরাঈল জাতির ব্যাপারে, (হে রাসূল) তোমার নিকট প্রদত্ত কল্যাণের ওয়াদা পূরণ হলো, যেহেতু তারা সবুর করেছিল (অস্থির হয়ে তোমাকে ছেড়ে যায়নি)। আর ধ্বংস করে দিলাম ফিরাউন ও তার জাতির ঐ ষড়যন্ত্রমূলক কার্যাবলীকে যা তোমাদের বিরুদ্ধে তারা গড়ে তুলেছিল।" (আরাফ-১৩৬-১৩৮)

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ . -(الاعراف: ٩٦)

"জনবসতির অধিবাসীগণ যদি ঈমান আনতো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলতো তাহলে আমি (মহান আল্লাহ) তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দরজাগুলো খুলে দিতাম; কিন্তু তারা (নবীর কথাকে) মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছে। এরপর আমি তাদের কাজের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে পাকড়াও করেছি।" (আরাফ-৯৬)

لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ط كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِيْ الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

-(يونس ك ١٣ -١٤)

"অবশ্যই আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্)ধ্বংস করে দিয়েছি তোমাদের পূর্বেকার বহু জনপদকে যখন তারা জুলুম করেছিল। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ সহকারে; কিন্তু তাদেরকে ওরা বিশ্বাস করেনি। এমনি করেই আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) আপরাধ জাতিকে শাস্তি দিয়ে থাকি। তারপর তোমাদেরকে তাদের পরবর্তীকালে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানালাম যাতে করে আমি (মহান আল্লাহ) দেখতে পারি তোমরা কেমন কাজ কর।" (ইউনুস-১৩-১৪)

اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ. اُولٰئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ج مَا كَانُوا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَ مَاكَانُوْا يُبْصِرُوْنَ.

-(هود : ١٨ - ٢٠)

"শোন, আল্লাহর লা'নত জালিমদের উপর যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাঁধা দেয়, আর তারা মানুষদের জন্য বাঁকা পথ তালাশ করে, আসলে আখিরাতকেই তারা অস্বীকার করে। তারা পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অক্ষমকারী বানানেওয়ালা ছিল না, আর আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য কোন বন্ধুও কেউ ছিল না। তাদের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, তারা কারো কথা শুনতে পারতো না, আর সঠিকভাবে কিছু দেখতেও পারতো না। (হুদ-১৮-২০)

اَ فَلَمْ يَسِيْرُوْا فِىْ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ اتَّقُوْا ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. -(يوسف :١٠٩)

"ওরা কি পৃথিবীর বুকে একটুও ভ্রমণ করেনি? যদি করতো তাহলে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তীদের হাশর কি হয়েছে। অবশ্য যারা ভয় করে চলেছে (তাকওয়া-পরহেজগারীর জীবন যাপন করেছে) তাদের জন্য নিশ্চয়ই

আখেরাতের ঘর উত্তম। তোমরা কি তোমাদের বুদ্ধিকে একটু কাজে লাগাওনা।" (ইউসুফ-১০৯)

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ . اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ. -.الحج : ٤٠ - ٤١)

"আর অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী, মহাশক্তিমান। ওদেরকে পৃথিবীর বুকে যদি আমি (মহান আল্লাহ) ক্ষমতা দেই তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল বলে স্বীকৃত কাজগুলোর হুকুম দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর হাতেই তো নিবদ্ধ রয়েছে সকল কাজের আঞ্জাম।" (হজ্জ-৪০-৪১)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج وَ لَيُمَكِّنَنَّ بِيْنَ الَّذِيْنَ ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ج يَعْبُدُوْنَنِىْ ج لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

(نور : ٥٥)-

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজসমূহ করেছে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর বুকে তেমনিভাবে খলীফা বানাবেন যেমন করে তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। তাদের জন্য তাদের ঐ জীবন ব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেবেন যা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তাদের বর্তমানের ভয়-ভীতিজনক অবস্থাকে নিরাপত্তার অবস্থায় রূপান্তরিত করে দেবেন। তারা আমার আনুগত্য করবে, আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। এর পরেও যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করবে তারাই হবে মহা অপরাধী।" (নূর-৫৫)

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

(النمل : ٦٩)-

"বল, ভ্রমণ করো পৃথিবীর বুকে তারপর ভেবে দেখো অপরাধীদের পরিণাম কি রূপ নিয়েছে।" (নামল-৬৯)

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يُّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ وَ يَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ط اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ. -(القصص ك ٤ - ٦)

"বাস্তবিকপক্ষে ফেরাউন পৃথিবীর বুকে অহংকার করেছিল এবং সে তার দেশের বাসিন্দাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছিল। তাদের একটি দলকে দুর্বল করে রাখে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জিন্দা থাকতে দেয়, অবশ্যই সে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল। আর আমি (মহান আল্লাহ্) পৃথিবীর দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি মেহেরবানী করতে চেয়েছিলাম এবং জননেতার আসনে বসিয়ে তাদেরকে দেশের ক্ষমতা ও সম্পদের উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলাম। আরো আমি চেয়েছিলাম যেন ফেরাউন, হামান ও তাদের লোক লস্কর সেই জিনিস দেখতে পায় যাকে তারা ভয় পেতো। (কালাম ৪-৬)

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَ عَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. -(الروم : ٩)

"ওরা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কি ঘোরতর পরিণতি হয়েছিল। ওরা তাদের থেকে বেশি শক্তিশালী ছিল। তারা পৃথিবীতে বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরা পৃথিবীকে যতটা আবাদ করেছে তার থেকে অনেক বেশি আবাদ করেছিল। তাদের নিকট তাদের রাসূল উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিল। পরন্তু আল্লাহ তাদের উপর যুলুমকারী ছিলেন না, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।" (রুম-৯)

যাই হোক, এ সব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলাদি অথবা মানুষের ব্যক্তিসত্তার বাইরের কোন জিনিষের কোন গুরুত্ব নেই; বরং আসল গুরুত্ব এসব পরিবর্তনের ব্যাপারে বুঝতে হবেঃ মানুষ হেদায়েতপ্রাপ্ত কি না এবং সকল বস্তুশক্তিগুলোকে তারা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে, না অকল্যাণকর কাজে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যার (Materialistic

Interpretion of History) কোন গুরুত্ব নেই। কারণ, ঐ ব্যাখ্যা ইতিহাসের বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বহু সত্যকে উপেক্ষা করেছে এবং সাধারণ ও খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর দিকে সমস্ত মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করেছে। আর এ সব ব্যাখ্যার অনুসারীরা ভেবেছে যে, একমাত্র তারাই প্রকৃত সত্যকে পেয়ে গেছে। এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বপ্রথম যে সত্যটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে তা হচ্ছে, বস্তুগত উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপায়-উপকরণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সংঘটিত করে না, বরং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই ঐ সব উপায় উপকরণাদির ব্যবহার পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে তার কারণেই তা অস্তিত্ব লাভ করে।

কৃষি বিপ্লবের যুগে ইউরোপে জাগীরদারী প্রথা চালু হয়, কিন্তু ইসলাম জাগীরদারী প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। তার কারণ ইউরোপে সম্পদ বন্টনের কোন পথনির্দেশিকা ছিল না বা এমন কোন নৈতিক শিক্ষা ছিল না যার ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণার্থে সম্পদ বন্টন সম্ভব হতো। অথচ এ ক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট ধ্যান ধারণা পেশ করেছেঃ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . -(الحشر : ٧)

"যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হতে থাকে।" (হাশর-৭)

ইসলামের ইতিহাসে এ নজির দেখা যায় না যে, কৃষকশ্রেণী শুধুমাত্র ভূমির সাথে আবদ্ধ দাসত্ব জীবন যাপন করেছে, যাদেরকে বা জমির সাথেই বিক্রি করা হয়েছে বা জমির সাথেই ক্রয় করা হয়েছে, যে সদা-সর্বদা ভূমির সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং সে পালিয়ে গেলে, যেখানেই যাক না কেন সেখান থেকে ধরে এনে তাকে তার মালিক মন-মত যে কোন শাস্তিই দিতে পারবে।

শিল্প বিপ্লবের সময় (During The Age of Industrial Revolution) সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদীরা পৃথক পৃথক বন্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। কারণ প্রত্যেক যুগের মানুষ কোন জিনিসকে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে করতে পারে অথবা তাকে সত্য মনে করতে পারে।

ইতিহাসের বস্তু-সর্বস্ব ব্যাখ্যা

(Materialistic Interpretation of History)

ইতিহাসের বস্তুসর্বস্ব ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্তর (Historical Stages)-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মানুষের ইতিহাসের বা মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা নয়, বরং তা হচ্ছে বস্তুগত সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা। কারণ, মানুষ ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে যেমন সঠিক পথের পথিক ছিল তেমনি ভুল পথের

পথিকও ছিল এটাই বাস্তব সত্য। কোন বস্তু-শক্তি হঠাৎ করে এবং আকস্মিকভাবে তার চলার পথ এমনভাবে নির্দ্ধারণ করে দেয়নি যে ঐ বস্তু-শক্তির প্রভাবেই সে সঠিক পথ পেয়েছে বা গুমরাহ হয়েছে। অথবা এমনও হয়নি যে, বস্তুগত উন্নতি মানুষের জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ স্থির করে দিয়েছে। একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বর্তমান যুগ যার মধ্যে আমরা বেঁচে আছি এবং যখন বৈজ্ঞানিক ও বস্তু-শক্তির উন্নতি চরমে পৌছেছে এতদসত্ত্বেও মানুষের মানবতা বা নৈতিকতার চরম অবনতি ঘটেছে এবং হিংস্র জন্তুর মত মানুষ মানুষের শত্রু হয়ে মানব ভ্রাতৃত্বের গলা টিপে হত্যা করেছে। এভাবে গোটা মানবতা নিরন্তর ভয়ভীতি এবং সার্বক্ষণিক ধ্বংসযজ্ঞের তীরে পৌছে গিয়েছে। এই বস্তুগত উন্নতি জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে বদলিয়ে দিয়েছে। মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্যকে ধ্বংস করে দিয়ে তাকে শিখিয়েছে যে, তার অস্তিত্ব একমাত্র বস্তুগত ধন-সম্পদ লাভের জন্যই, তা যেভাবেই হোক না কেন এবং এগুলোর যথেচ্ছা ভোগ ব্যবহার তার একমাত্র কাম্য। এর ফলে মানুষের চরিত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং সে মানবতার সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার এমন নিম্নপর্যায়ে পৌছে গিয়েছে যার থেকে হিংস্র জীব জানোয়ারও পানাহ্ চাচ্ছে।

আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জীবন-বিধানের ফল

যে সকল কারণে মানব সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য এবং নিজেদের সচেতনতা ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তার কারণ ও ফলাফর নির্ণয় করার জন্য ইসলাম মানুষের অন্তরের নিকট আবেদন জানায়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ঐ সকল দৃষ্টান্তগুলো পর্যালোচনা করতেও উদ্বুদ্ধ করে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্র অমোঘ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি তাঁর মুমিন বান্দাহ্দেরকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং কাফের, অহংকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্ তায়ালার স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় এক নিয়ম যে, তিনি ঈমানদারদেরকে সাহায্য করেন এবং কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এবং প্রথম দিকে এর বিপরীত মনে হয়।

কুরআনুল কারীমের ঘোষণাঃ আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার চিরস্থায়ী নিয়মের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু সে ফল সর্বদা যে এ জীবনেই পেতে হবে এমন নয়, বা সে ফল প্রকাশের জন্য একটি ঐতিহাসিক স্তরই যথেষ্ট নয়; কারণ, এমন হতে পারে যে, বাতিল শক্তি সাময়িকভাবে পৃথিবীর মধ্যে একটি বিজয়ী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করবে। কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়ী নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার বিধি ব্যবস্থা চালু হওয়ার জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য

অংশ। অবশ্য এ অবস্থার প্রয়োজন আছে, আল্লাহ্ তায়ালা দেখতে চান এই অবস্থায় তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাগণ তাঁর ব্যবস্থা চালু করার জন্য কতটা সজাগ; কতটা নিবেদিতপ্রাণ এবং এর জন্য সক্রিয় সংগ্রামে যোগ দান করে মাল ও জানের কুরবানী দিতে তারা কতটা প্রস্তুত।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. -(الرعد :١١)

"বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করে।" (রাদ-১১)

অপশক্তির প্রাবল্য কখনো কখনো এজন্যও হয় যে, মানুষ অনেক সময় বাতিল শক্তিকে সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বরং এমনো হয় যে, সেটাই তাদের কাছে ভাল লাগে। এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর উক্তিতে জানা যায়ঃ

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . -(النمل : ٢٥)

"তোমরা যেমন হবে তোমাদের শাসকগণও তেমনই হবে।" (হাকিম-২০)

"(বাতিল শক্তিকে তারা এ জন্য সহ্য করে) যেন কিয়ামতের দিন তারা তাদের বোঝাকে পুরাপুরি বহন করতে পারে।" (নাহ্ল-২৫)

কোন কোন সময় এ জুলুম নির্যাতনের অধ্যায় এজন্যও আসে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মুমিন দলকে ছেঁটে পৃথক করে ফেলতে চান (বিপদ-আপদে ফেলে এবং সে অবস্থায় তাদের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে) যাতে করে তারা দায়িত্ববোধ, কর্তব্য চেতনা ও শক্তি সাহসের মাধ্যমে তাদের কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ
النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِيْنَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ.

-(آل عمران : ١٣٩ - ١٤١)

"মন-ভাঙ্গা হয়ো না, দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। আঘাত যদি পেয়ে থাক, তোমরাও তবে এর আগে তোমাদের বিরোধীদলকে আঘাত দিয়েছো। এমনি করেই তো আমি (মহান আল্লাহ্) জামানাকে আবর্তিত করি মানুষের মধ্যে। তোমাদের উপর এ অবস্থা এজন্য আনা হয়েছে যাতে করে ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্যে থেকে সত্যের সাক্ষী

কিছু লোককে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা জালিমদেরকে ভালবাসেন না। এ কঠিন অবস্থা দান করার আর একটি কারণ এও ছিল, যেন আল্লাহ্ তায়ালা (মুনাফিকদের মধ্যে থেকে) খাঁটি ঈমানদারদের বেছে নেন এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেন।" (আলে ইমরান ১৩৯-১৪১)

যাই হোক, এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে বাতিল শক্তি বিজয়ী হলেও মূলতঃ আল্লাহর চিরস্থায়ী নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং বাতিল শক্তির এ সাময়িক প্রাবল্য , এও আল্লাহরই নিয়মের অধীনে সংগঠিত হয়, এটা তার নিয়মেরই একটি অংশ। এজন্যই কুরআনুল কারীম মুসলমানদেরকে ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ইতিহাসকে সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের গন্তব্য পথে পৌঁছানোর জন্য সঠিক পথে চলতে নির্দেশ দিয়েছে।

এটাই পার্থক্য-সৃষ্টিকারী সেই সীমানা যেখান থেকে ইসলামী ইতিহাসের পথ ও ইসলামের সমাজ-বিদ্যা পাশ্চাত্য ইতিহাসের রাস্তা ও পাশ্চাত্য সমাজ-বিদ্যা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক হয়ে যায়। আর ইসলামী জীবনের মধ্যে সত্য সঠিক পথের অনুসরণ এবং সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির আলোকেই ইতিহাসের গতিপথ ও সমাজ বিদ্যা অধ্যয়ন এবং সরল ও মজবুত (কুরআনী) পথ থেকে বিচ্যুতির কারণে বাস্তব জীবনে কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কারণ এইটিই সেই বিষয় যাকে ইউরোপ সব সময় এড়িয়ে চলেছে এবং বরাবর বস্তুগত ও বাহ্যিক দিককে আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে পৃথক করে দেখেছে এবং ইতিহাসের অধ্যয়নও করেছে বাস্তবতার আলোকের বাইরে থেকে।

বস্তুগত শক্তির ব্যবহার

কুরআনুল কারীম বস্তু-শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য মানব বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করেছেঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . -(الاعراف : ١٢٠)

"আমি (মহাদয়াময় আল্লাহ) তোমাদেরকে যা কিছু রিজিক দান করেছে সে সকল পবিত্র জিনিসগুলো থেকে আহার কর।" (আরাফ-১০)

وَلَقَدْ مَكَّنَّا كُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَائِشَ .

"আমি মহাশক্তিমান আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি।

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ .

"আমি মহাশক্তিমান আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকে (লোহার) পোষাক বানানোর কারিগরি বিদ্যা শিখিয়েছি যাতে এ পোষাক তোমাদেরকে অস্ত্রের আঘাত থেকে বাঁচাতে পারে।" (আম্বিয়া-৮০)

কুরআনুল করীম একদিকে যেমন গোটা সৃষ্টি ও আসমান-যমীনের মধ্যে অবস্থিত ও কার্যরত সকল সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়, অপর দিকে আইন-কানুন রচনার হিকমাত এবং পৃথিবীতে প্রচলিত যে সকল হক ইনসাফপূর্ণ আইন আদালত রয়েছে সে সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দায়িত্বশীল এবং হুকুমদাতা যারা আছে তাদের আনুগত্য করে একটি কল্যাণমুখী সুন্দর ও সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ কায়েম করে। কুরআনুল কারীম আরো উদ্বুদ্ধ করে যাতে মানুষ ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে জারীকৃত আল্লাহ্‌পাকের চিরস্থায়ী ঐ নিয়মের দিকেও দৃষ্টি দেয় যার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌পাক ঐ সকল মুমিনদেরকে প্রাধান্য ও শক্তি দান করেন, ওরা আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ও নেয়ামতসমূহকে কল্যাণের পথে ব্যয় করে।

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. -(الحج : ٤٠ - ٤١)

"যে মানুষ! আল্লাহকে সাহায্য করবে তাকে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা শক্তিমান-মহাক্ষমতাবান। এ (মুসলিম) জনতা হচ্ছে, ঐ সব লোক যাদেরকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দান করলে নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভাল কাজগুলোকে করার নির্দেশ দেয় ও মন্দকাজসমূহ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে।" (হজ্জ ৪০-৪১)

অপরদিকে, আল্লাহ্ তায়ালা কাফের ও নাফরমানদেরকে লাঞ্ছিত করেন যেহেতু তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত লাভ করার পর দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ছড়ায়। তিনি তার আয়াতগুলোকে অস্বীকারকারী হওয়ায় ও তার নেয়ামতের প্রতি অভিজ্ঞতা প্রকাশের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَ عَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. -(الروم : ٩)

"ওরা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে দেখে না ও খেয়াল করে না যে, কি মন্দ পরিণতি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের হয়েছে। তারা তো ওদের থেকে অনেক বেশি দিন (দাপট নিয়ে) টিকে ছিল, তারপর তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সত্যের পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ এসেছিল। আসলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে।"

কুরআনুল কারীম বস্তুগত শক্তি-নিচয়কে ব্যবহার করার সাথে সাথে আল্লাহর দিকেও মানুষের মনকে রুজু করেছে এবং আল্লাহর ভয় ও তাঁর ভয়ের ভিত্তিতে পরহেজগারী করার দিকে তাকে এগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে মানুষ বস্তুগত শক্তিগুলো ব্যবহার করার দরুন সত্য সঠিক পথকে ভুলে না যায় এবং বস্তুগত শক্তিকেই সব কিছু না ভেবে বসে আর একথা চিন্তাও না করে যে, জীবনের সারবস্তু এবং জিন্দেগীর মূল সম্পদই হচ্ছে এই বস্তুবাদ ও বস্তুগত সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এটাই সেই ভালমন্দ মাপার মাপকাঠি যাদ্বারা ইসলাম ও অনৈসলামী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও মতবাদসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

ইসলামই ইউরোপে পুনর্জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করেছে

ইতিহাস সাক্ষী যে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বস্তুগত দুনিয়া ও তাঁর ভোগ-বিলাসকে একেবারে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়নি। আরব বিয়াবানের চতুর্দিকে যখন ইসলামের মধ্যাহ্ন সূর্য প্রভা বিকীর্ণ করছিল সে সময় আরববাসী বস্তুগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিকল সেই স্বাদ গ্রহণ করছিল যা বহির্জগত থেকে আগত কাফেলাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা সফর করে এসে তাদের কাছে বর্ণনা করতো। এর পূর্বে তারা তো শুধু কাব্য-চর্চা, কবিতা-প্রতিযোগিতা এবং গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে সময় কাটাতো। তারা না কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতো, না আবিষ্কার উদ্ভাবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতো, না অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন পরীক্ষ-নিরীক্ষা করার কোন অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। না তাদের কাছে জ্ঞান ও গবেষণার কোন মূল্য ছিল। কিন্তু এ সময় ইসলাম সেই সকল মরু বেদুইন, যারা অধিকাংশ সময় যাযাবর হয়ে পাহাড় পর্বতের এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকাতে ভ্রমণ করে বেড়াতো। ইসলাম সেই তাদেরকে জাগিয়ে তুলল, বিশ্বসভ্যতার সাথে পরিচিত করাল, বরং সারা বিশ্বের শিক্ষাদাতার পর্যায়ে উন্নীত করল এবং জ্ঞান ও কাজের সকল ময়দানে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করে দিল। যুদ্ধ ও রাজনীতিতে তার হল পথপ্রদর্শক ও নিশান বরদার এবং জ্ঞান-সাধনা ও আইন রচনায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। তারপর, যখন মুসলমানদের হাতে মিসর সভ্যতার, ইউনানী দর্শনের এবং হিন্দুদের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি এসে গেল। তাদের চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রকৃতি-বিদ্যা, রসায়ন ও অংক শাস্ত্রও যখন

মুসলমানদের করায়ত্ত হলো তখন এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে মুসলমানগণ আকণ্ঠ পান করল এবং এগুলোর অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করে দিকে দিকে এগুলোর সম্মোহনী আলোকধারা পরিব্যাপ্ত করে দিল। অনতিকালের মধ্যেই তাদের জ্ঞান সাধনার প্রবল বন্যা গোটা পৃথিবীকে প্লাবিত করে দিল। বিশেষ করে সব থেকে বেশি ইউরোপ এর থেকে ফয়দা হাসিল করল। সত্যিকারে বলতে কি পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ আন্দোলন ইসলামী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গড়ে উঠেছিল; কিন্তু সংকীর্ণমনা ইউরোপবাসী এ অবদানের স্বীকৃতি দেয়নি বরং যে সকল মুসলমান উস্তাদদের থেকে তারা এ সকল শিক্ষার আলো ও সভ্যতা সংস্কৃতির রূপরেখা পেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধেই আন্দালুসিয়াতে যুদ্ধাভিযান চালাল। এতটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, বরং গোটা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী করাল গ্রাসের মধ্যে আবদ্ধ করে তাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করল।

আজকের সর্বাধুনিক যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাধনা গড়ে উঠেছে, তার সবটুকু পাশ্চাত্যবাসীদের স্বীকারোক্তি মতে মুসলমানদেরই অবদান। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক গীবন (H. R: Gibb) তাঁর রচিত Modern Trends in Islam গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"আমি মনে করি একমাত্র মুসলমান গবেষকদের অক্লান্ত জ্ঞান-সাধনা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও নিরীক্ষা আধুনিককালের জ্ঞান বিজ্ঞানের গতিপথ নির্ণয় করেছে। আর তাদেরই সময় গবেষণার সাহায্যে আজকের ইউরোপ আবিষ্কার উদ্ভাবনীর শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি মুসলমানদের এ উন্নতি তখন করেছিল যখন তারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান ছিল, এ সকল বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও যখন তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশিত পথে পুরোপুরি এবং মজবুতির সাথে দাঁড়িয়েছিল, তখন তারা মানবতাকে উপেক্ষা করে শুধু বস্তুর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়নি, বরং আত্মার উর্দ্ধজগতের সাথে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। ঐ সময় তারা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুগত বিভিন্ন উন্নতির কারণে মানুষকে গোলামীর শিকলে আবদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে বস্তুসভ্যতা এমনভাবে বশীভূত করেনি যেমনভাবে আজ ইউরোপবাসী হয়েছে। সে সময় তারা নিজেদেরকে আজকের পাশ্চাত্যবাসীদের মত উন্নয়নপ্রিয় ও উন্নয়নশীল আখ্যা দিয়ে নৈতিকতার সীমালংঘন করেনি। বরং মুসলমানদের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এবং ইসলামের মৌলিক মতাদর্শের ছায়াতলে থেকেই গড়ে উঠেছে এবং তা গোটা মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যেই পথ-রচনা করেছে ও মানবতার বিকাশ সাধনে নিয়োজিত থেকেছে।

পাশ্চাত্যবাসীদের ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়ার আসল কারণ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা কোন দ্বন্দ্ব কলহের সম্পর্ক নয় এবং কোন দিন তা ছিলো না। আর না ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য জগতে আল্লাহ্ বিমুখতা (ধর্ম নিরপেক্ষতা) সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হলো, প্রোমিথিউসে-এর অপ্রিয় গ্রীক দেবতামালা। গ্রীকদের অবচেতন মনে আগুনের চোর দেবতা হিসেবে এমন কু-প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল যে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা পয়দা হতে পারেনি, যেহেতু পরমেশ্বরের ভিত্তিই তাদের কাছে নড়বড়ে ছিল। এই কাহিনীর কারণেই মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং নিরন্তর সংঘর্ষের সম্পর্ক বিরাজ করতো। এ বৈরীতা কখনো মুহাব্বাত-এর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি, বরং দিনে দিনে দুশমনীর আগুন আরো বেড়েছে। কারণ, সৃষ্টিরহস্য উদঘাটনের চেষ্টায় নিজেই দেবতায় পরিণত হওয়ার উপায় হিসেবে ঐ পবিত্র আগুন হাসিল করার চেষ্টা করতে থাকে । কিন্তু দেবতারাও প্রাধান্য বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এই পবিত্র আগুন সর্বদাই রক্ষা করেছে এবং মানুষের থেকে দূরে রেখেছে।

এ হচ্ছে পাশ্চাত্যবাসীদের মন-মগজে ও তাদের অবচেতন মনে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্কের চেহারা। অবচেতন মনে তাদের এ বিশ্বাস আছে যে, তারা স্রষ্টার ইচ্ছা ও ক্ষমতার নিকট ক্ষমতাহীন, তবুও তাদের এই অসহায়ত্বকে তারা সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করেনি, বরং শক্তি সঞ্চয় ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তারা এই অক্ষমতা দূর করার জন্য নিন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো করায়ত্ত করে গোটা সৃষ্টির উপর প্রাধান্য বিস্তার করা যায়। তারা সৃষ্টি রহস্যের জ্ঞান জোরে সোরেই এবং নিজেদের চেষ্টা বলেই হাসিল করে নিতে চায়, যেমন করে প্রোমিথেস প্রাচীন দেবতার পবিত্র আগুনকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল।

পাশ্চাত্য জগতের লোকদের অন্তরের মধ্যে লুকানো এই সেই ভাবাবেগ যার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যবাসী মনে করে যে, মানুষ যে কোন বৈজ্ঞানিক উন্নতি করুক না কেন তাতে তাদের অগ্রগতির এক একটি স্তর অতিক্রম করার সাথে সাথে তাদের (কল্পিত) স্রষ্টা এক ধাপ নীচে নেমে যায়।

পাশ্চাত্য জগতে ধর্মের এই অনুভূতি বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে চলে এসেছে এবং সেখানে স্রষ্টার মান-সম্ভ্রম ও কর্তৃত্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে সাথে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা এতটাও ভাবতে শুরু করেছে যে, মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজেই হয়ে যাবে এবং নিজের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক সে নিজে ছাড়া আর কেউ থাকবে না। আর সেই সময়ের জন্য পাশ্চাত্যবাসী উন্মুক হয়ে আছে তার উপর।

মানুষের মন-মানকিতার উপর আল্লাহ বিমুখ বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রতিক্রিয়া

ইউরোপের আল্লাহবিমুখ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং আত্মার সাথে সম্পর্কহীন বস্তুগত উন্নতির এক ধ্বংসাত্মক পরিণতি এটাও হয়েছে যে, মানুষ যন্ত্রের একটি অংশে এবং একটি নিকৃষ্ট জন্তুতে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের এক দীর্ঘ অধ্যায়-ব্যাপী যন্ত্র মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। এর কারণ কয়েকটি। একঃ মানুষ যন্ত্র চালাতে থাকে এবং মনে করতে থাকে সত্যিকার কার্যকরী শক্তিও সে নিজেই এবং যন্ত্র তার মুখাপেক্ষী মাত্র; কিন্তু এ পর্যায় অতিক্রম হলে এবং যন্ত্রের আরও অগ্রগতি হলে সে মনে করতে থাকে যন্ত্র মানুষের হস্তচালিত একটি বস্তুই আর রইলনা। যখন চাইবে চালাবে এবং যখন চাইবে থামাবে, বরং যান্ত্রিক উন্নতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যখন সে স্বয়ংক্রিয় এক দৈত্য শক্তিতে পরিণত হলো, তার অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই সে চলতে শুরু করল এবং তখন মানুষ ইচ্ছা করলেই তাকে থামাতে পারবে এমন অবস্থা আর রইল না। এমনিভাবে একটি কারখানায় যন্ত্রের কাছে মানুষের মর্যাদা আগের মত আর রইল না। অর্থাৎ, আগে তো কল-কারখানা-কর্মচারী ও মজুরগণ নিজেদের হাতেই যন্ত্র চালু করত ও চালু রাখত। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই সেই দৈত্যদানবের যন্ত্রাংশে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখন কর্মচারী ও মজুরদের কাজ শুধুমাত্র কারখানার বোতম টিপে দেয়া বা খুলে দেয়া অথবা জ্বালানী (তেল বা কয়লা) ভরে দেয়া। এর পর চোখের পলকে যন্ত্র-দানব এগুলো উদরস্থ করার পর পুনরায় আরও জ্বালানী দাবি করবে।

এ নতুন পরিবর্তন মানুষের মনের উপর এক নতুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে যার ফলে মানুষের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ কম হতে লাগল এবং মানবতাবোধও হ্রাস পেতে লাগল। এখন তার মনমানসিকতার উপর যন্ত্র-দানব কর্তৃত্বশীল হয়ে গেল এবং মেশিনই এমন ভীষণ শক্তিতে পরিণত হলো যে তাকেই কেন্দ্র করে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করল এবং তার মর্জি-মত জীবনযাপন করতে শুরু করল। এই দৈত্য-দানব মেশিনের নিকট মানুষের সজীব অনুভূতিগুলো ম্লান হয়ে গেল, তার উজ্জ্বল চিন্তা ধারাগুলো হয়ে গেল নিষ্প্রভ এবং তার কোমল হৃদয়ানুভূতি দলিত-মথিত হয়ে গিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হয়ে গেল মেশিনের মত শক্ত ও প্রাণহীন এবং তার গোটা জীবন যন্ত্রাংশে পরিণত হয়ে তাকে বানিয়ে ফেলল অনুভূতিহীন ও প্রাণহীন। সে তখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই গতিতে চলতে অভ্যস্থ হয়ে গেল। কোন কল-কারখানার বোতম টিপে দিলে যেমন সে সচল হয়ে যায় এইভাবে মানুষের শক্তিকে কাজে লাগানো শুরু হলো, সকালে বোতাম টেপা হলে সে চলতে

শুরু করলো এবং চলতেই থাকল এবং সন্ধ্যায় ঘন্টা বাজার সাথে সাথে তার হাত মেশিনের মতই থেমে যেতে থাকল।

এরপর মেশিনে দ্বিতীয় অংশও কর্মতৎপর হতে শুরু করলো। পাশবিক যে শক্তির ভাণ্ডার সারাদিন ধরে শরীরের মধ্যে বেকার পড়ে থাকে এবং নির্জীব মেশিনে কাজ করার সময় কোন ব্যবহারেই আসেনি, দিন শেষে সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে সেই উগ্রশক্তি বাঁধাবন্ধনহীন অনুরূপ উগ্র-শক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সে পাশবশক্তির বলবীর্য যখন নির্গত হয়ে যায় তখন দেহ ঠাণ্ডা ও নিশ্চল হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত নীরব হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বীর্য পুনরায় তৈরি না হয়।

এভাবে মানব-জীবন এমন এক শুষ্ক ও প্রাণহীন এক মেশিনে পরিণত হল যে, তার কোমল হৃদয়াবেগ, মনোরম অনুভূতি ও উজ্জ্বল চিন্তাধারা থেকে সে একেবারে মুক্ত হয়ে গেল। এ এমন এক হীন পশুত্বের জীবন যা মানুষের যাবতীয় যোগ্যতা ও শারীরিক শক্তিনিচয়কে ঘুন ধরিয়ে দিল। আর এই স্তরে এসেই মানবতা আত্মগোপন করল এবং তার স্থান দখল করল প্রাণহীন যন্ত্র-দানব।

ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ্ থেকে মানুষের দূরত্বের ফল এ দাঁড়াল যে, মানুষ বস্তুবাদী হওয়ার জন্য ভীষণভাবে প্রতিযোগিতা শুরু করল আর এই অর্থে পূজা তার জীবনে একমাত্র কাম্যবস্তু হয়ে রয়ে গেল। অধুনা পাশ্চাত্য জগৎ পুরাপুরি বস্তুবাদিতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় সেসব দেশে মানবতা আজ দ্বারে-দ্বারে কেঁদে ফিরছে। আল্লাহ্র সাথে বান্দাহ্র সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার এই হচ্ছে সব থেকে মন্দ ফল। আর এই জন্যই একথার উপর সব থেকে বেশি জোর দেয়া প্রয়োজন যে, মানুষের অন্তরকে সদা-সর্বদা আল্লাহ্র দিকে রুজু করে রাখতে হবে এবং পৃথিবীর বস্তু-শক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মৌলিক উদ্দেশ্যকে সমুজ্জ্বল রাখতে হবে, এর সাথে মানুষ নিজ প্রভু প্রতিপালকের সাথে মুহাব্বত, দয়া-মমতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

জ্ঞান আল্লাহপাকের এক অমূল্য দান

ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তুজ্ঞান ও মারেফাতি জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহর সঙ্গে (নাউজুবিল্লাহ) অর্থাৎ শরীয়তের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য পাশ্চাত্যবাসী ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকের অবচেতন মনে এ ধারণা বহুলাংশে বিদ্যমান। বরং প্রকৃত সত্য হচ্ছে আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা বড় মেহেরবানী করেই মানুষকে এবং শুধু মানুষকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়েছেন ও জ্ঞানের মূল উৎস বুঝ শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধি দান করেছেন এবং যে কোন জিনিসের গভীরে প্রবেশ করার জন্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিও দান করেছেন। তিনিই মানুষের রুজি

রোজগারীর সংস্থানের জন্য পৃথিবীর পথগুলো তাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। মানুষকে দান করেছেন তিনি নানা প্রকার দ্রব্য ও বিভিন্ন খুশবু ও স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য-খাবার ও ফলমূল, যাদের মধ্যে একটি থেকে আর একটি উত্তম। আসমান যমীনের সব কিছুকে মানুষের অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর সব কিছুর উপরে মানুষকে কলম দ্বারা জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। আরো জানিয়েছেন তাদের এমন কিছু যা তারা জানত না। এসব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্পাক শুধুমাত্র চান যে মানুষ এগুলো তাঁরই দান একথা স্বীকার করে তাঁর শুকুরগুজারি করুক, তাঁর বিধি নিষেধ মেনে চলে তাঁর মুহাব্বত ও সম্পর্ক লাভ করুক।

ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা যার মধ্যে শিখানো হয়েছে যে, মানুষের বুদ্ধি ও তার আত্মার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এই সম্পর্কের কারণেই বুদ্ধি মুসলিমকে ভুল পথে বা সত্য সঠিক পথ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে না, অথবা জ্ঞানকে খারাপ কাজে ব্যবহৃত হতে দেয় না।

এভাবে ইসলামী জীবন-পদ্ধতিতেও দেখা যায় আত্মা ও বস্তুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং সেখানে মানুষ মেশিনের গোলাম নয়, বরং মেশিন মানুষের গোলাম। সেখানে মানুষ নিজ ব্যক্তি সত্তাকে পুরাপুরিভাবে সংরক্ষণ করে এবং নিজ যোগ্যতা ও শক্তিনিচয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হয়, একটি সচল শক্তি হিসেবে সে বস্তুবাদিতার মূল জিনিসগুলোর উপর প্রভাবশীল হয়ে থাকে এ ভাবেই ইসলাম মানুষের বুদ্ধিকে সঠিক শিক্ষক দিয়ে যথার্থভাবে পরিচালনা করে।

আল্লাহর বাণীঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

"আল্লাহর রংয়ে রঞ্জিত হও, আর আল্লাহর রং থেকে ভাল রং আর কার হতে পারে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাস্থ্য-পালন

স্বাস্থ্য-পালন বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শরীরের অনুভূতি ইন্দ্রিয় (Senses) এবং মাংসপেশী (muscles) গুলো সুস্থ ও সবল রাখার প্রচেষ্টা সম্পর্কেই শুধু আলোচনার উদ্দেশ্য নয় বরং গোটা শরীর এবং শারীরিক শক্তি, যোগ্যতা এবং সকল প্রকার স্বাভাবিক ঝোঁক-প্রবণতা ও আবেগ অনুভূতি (Natural urges and Emotions) এ গুলোর সবকিছুকে লালন করা বুঝায়।

আমরা এখানে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছিনে, কারণ এগুলো মানুষের চিন্তা শক্তি ও ইবাদত-বন্দেগীর কাজগুলোকে শরীরের রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রতিফলন বলে জানায়। আবার দার্শনিক মতবাদসমূহও আমাদের কাছে তেমন কোন মূল্য রাখে না। কারণ, ঐ সব মতবাদ অনুসারে প্রবৃত্তির দাবি অনুযায়ী শরীর কর্মক্ষম হয়, বরং ঐ সবল চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে শরীর ও মন একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তারকারী দুইটি জিনিস। স্বাভাবিকভাবে এ দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, একটি বাদ দিলে, মানবতার সাথে সঠিক কোন পরিচয় অপরটির থাকে না।

অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করেছি যে, মানুষের অস্তিত্ব হচ্ছে সব কিছু নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। এ সত্তা থেকে পৃথক কোন শাখা প্রশাখার চিন্তা করা যায় না এবং মূলসত্তা থেকে পৃথক করে কোন শাখর অস্তিত্বও সম্ভব নয়। পৃথকভাবে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনা যদি কোন সময় করা হয় তবে তা শুধু বুঝবার জন্যই, আসলে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এর কোন অংশেরই পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। এ কারণেই মন ও দেহকে পৃথক রাখার কোন চিন্তা করা যায় না। আর শারীরিক কোন কাজ এমন হতে পারে না যার সাথে মনের কোন যোগ নেই। বরং এটা বাস্তব সত্য যে, শ্রবণেন্দ্রীয়, বাকযন্ত্র, স্পর্শ ইন্দ্রীয়, ঘ্রাণেন্দ্রীয়, দর্শনেন্দ্রীয় ও স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রীয় এগুলো সবই শরীরের অনুভূতি নিচয়, এগুলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে কোন কাজ সংগঠিত করতে পারে না। অর্থাৎ যখন আমরা এই অনুভূতিগুলোর সামষ্টিক অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলি তখন এমন একটি অনুভূতির অস্তিত্বের সম্পর্কে কথা বলা হয় যার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য আছে এবং যার একটি নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আছে। চেতনাহীন দৃষ্টি শ্রবণশক্তি এবং এমন ঘ্রাণেন্দ্রীয়, সম্পর্শ ইন্দ্রীয় এবং জিহ্বা যেগুলোর মনের উপর কোন প্রতিফল নেই, বাস্তব কর্মজীবনে তার কোন মূল্যও নেই। এসকল অনুভূতিকে অনুভূতি বললেও যেহেতু এ গুলো মনস্তাত্ত্বিক কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে

না এই জন্য এগুলোর কোন ফলও পাওয়া যায় না এবং এগুলোর কোন লক্ষ্যও বুঝা যায় না।

وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ. (الاعراف : ١٧٩)

"তাদের চোখ আছে। কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখতে পায় না এবং তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শুনে না । তারা জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তার থেকে আরও অধম, তারাই (সত্য থেকে) গাফেল।" (আরাফ-১৭৯)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা-উপশিরা এবং মাংস ও চর্বি সব কিছু নিয়েই শরীর। কিন্তু এসব কিছু একত্র হলে একটি জীবন্ত শক্তি (বা একটি জীব) অস্তিত্বে আসে যা সম্মিলিতভাবে মানসিকভাবে স্থিরীকৃত কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করে।

দু'টি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য

ইসলাম শরীর এবং এর মধ্যস্থিত প্রাণশক্তিকে পোষণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে দু'টি জিনিস খেয়াল রাখে, অর্থাৎ শরীরকে শরীর হওয়ার কারণে তার সুস্থতা ও পরিপুষ্টির খেয়াল রাখে যাতে করে মানুষ তার অস্তিত্বের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এ শরীর মনস্তাত্ত্বিক ও জীবনের পরিণতি পর্যন্ত পৌছুতে পারে। এ বিষয়ে নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেনঃ "তোমাদের শরীরের তোমাদের উপর হক (পাওনা) রয়েছে।"

অর্থাৎ মানুষকে গোটা শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, তাকে জায়েয, হালাল এবং পবিত্র খাদ্য-খাবার সরবরাহ করতে হবে, তাকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে এবং তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এভাবে, আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা শরীর সম্পর্কে যে সব নির্দেশ দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরের জন্য সেই সকল খাদ্য-খাবার সরবরাহ করা যা তার জীবনী-শক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য, যাতে করে মানুষ তার জীবন-লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ও তার অস্তিত্বকে পূর্ণত্ব দান করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেতে পারে এবং শরীরের মধ্য থেকে উদগত মনের বাসনাকে পূর্ণ করতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহপাকের বাণীঃ

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا – (القصص : ٧٧)

"আর দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ গ্রহণ করতে ভুলে যেয়ো না।" (কাসাস-৭৭)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۔

(الاعراف : ٣٢)-

"হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, কে হারাম করেছে দুনিয়ার আল্লাহ্ প্রদত্ত সুখ সৌন্দর্য যা তিনি তাঁর বান্দাহ্দের জন্য বের করেছেন এবং পবিত্র খাদ্য-খাবার ও জীবন ধারণ সামগ্রী?" (আরাফ-৩২)

যাই হোক, এভাবে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আল্লাহপাক শরীরকে সুস্থ রাখার ও শরীর পালন করার জন্য হেদায়েত দিয়েছেন এবং শারীরিক ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করেছেন। যেমন হাদীসের মাধ্যমে তীর-ধনুক প্রশিক্ষণ নিতে ও ঘোড়া পরিচালনা করার শিক্ষা নেয়ার কথা জানা যায়। এ সকল হেদায়াত শরীর পালন বা শরীরকে সুস্থ রাখার পথে এক বিশেষ দিক-নির্দেশনা। এ নির্দেশের লক্ষ্য হলো শরীরকে শক্তিশালী করা ও যে কোন কঠিন কাজের জন্য শরীরকে উপযোগী ও কষ্ট-সহিষ্ণু করে গড়ে তোলা। সাথে সাথে এ লক্ষ্যও অবশ্যই আছে যে, শরীর যেন এতটা শক্তি, সামর্থ লাভ করে যার ফলে সে যেন জীবনের স্বাদও পুরাপুরি পেতে পারে কারণ দুর্বল ও অসুস্থ শরীর না জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে। আর না তার মধ্যে বিরাজিত মন তার জীবন, লক্ষ্য হাসিল করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সেই শক্তি পেতে পারে যা অপরিহার্য কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজন। তাছাড়া, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে এবং সম্মানজনক জীবন যাপন করতে হলে যে জীবন-সংগ্রাম করতে হয় তার জন্যও একটি মজবুত ও সুস্থ দেহের প্রয়োজন।

দু'জাহানের সর্দার নূর নবী (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন, কখনো আয়শা অগ্রগামী হতেন। কখনো রাসূলুল্লাহ (সঃ) এগিয়ে যেতেন এবং তিনি কখনো কখনো তাঁর উটনী কুস্ওয়ার উপর উঠেও দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতেন। হজ্জের ফরজগুলো আদায় করতে গিয়েও দ্রুত গতিতে চলা ও দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই সকল কাজের মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থ ও মজবুত বানানোর প্রশিক্ষণই দান করা হয়েছে।

জৈবিক শক্তিবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

যদিও ইসলাম শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সবল ও সুঠামভাবে গড়ে তোলারও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র সে বিষয়েই আলোচনা করবো না বরং ঐ বিষয়েও আলোচনা রাখবো যা মানুষের অস্তিত্বের ঝর্ণাধারা থেকে নির্গত হয় এবং মানুষের প্রবৃত্তির সকল প্রকার চাহিদাকে পূরণ করে।

ইসলাম এ জৈবিক শক্তিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলাম মানুষের জৈবিক শক্তিকে নাপাক ও খারাপ জিনিস বলেনি অথবা তাকে ঘৃণার জিনিস বা তাচ্ছিল্যের জিনিস বলে আখ্যা দেয়নি (যেমন খৃষ্টান পাদ্রীরা বলেন) বরং ইসলাম তাকে খোলাখুলি এবং প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করার পর তাকে প্রশিক্ষণ দান করার, তাকে পবিত্র রাখার এবং সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ইসলাম এই শক্তির স্বাদ গ্রহণ করার জন্যও মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে, বলেছেঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ.

(الاعراف : ٣٢)-

"বলো, হে রাসূল! আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের বস্তুগুলো কে হারাম করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাহ্দের জন্য বের করেছেন এবং পবিত্র জীবন সামগ্রীগুলোও কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এগুলো তো দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের জন্য বিশেষভাবে কেয়ামাতের দিনেও কেবলমাত্র মুমিনগণই এগুলো পাবে (ও ভোগ-দখল করবে)।" (আরাফ-৩২)

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ – (السباء : ١٥)

"তোমাদের প্রতিপালকের রিজিক থেকে তোমরা খাও এবং তাঁর শুকুরগুজারি কর।" (সাবা-১৫)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

(الكهف : ٧)-

"বাস্তবিকপক্ষে আমি (মহান আল্লাহ) পৃথিবীর বুকে যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা তো এর শ্রীবৃদ্ধির জন্যই এবং এর দ্বারা আমি দেখতে চাই কে এর যথাযোগ্য ব্যবহার করে সুন্দর আমলের পরিচয় দেয়।" (কাহাফ-৭)

يٰبَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ – (الاعراف : ٣١)

"হে আদম-সন্তানগণ! প্রতিটি সিজদার স্থানে (মসজিদে) গমনকালে সৌন্দর্য গ্রহণ কর (সাধ্য মত)ঃ।" (আরাফ-৩১)

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ . (البقرة : ٢٢٣)

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত, তোমাদের ক্ষেতে তোমরা যাও, যেভাবে তোমাদের খুশী।" (বাকারা-২২৩)

বরং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তো নিজ স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলনের জন্যও (আল্লাহর কাছ থেকে) প্রতিদান পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন। হাদীস শরীফে কথাটি এইভাবে বলা হয়েছে যে, "তোমাদের ঐ সম্পর্কের বিনিময় স্বরূপ সওয়াব দান করা হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবে সে জন্যও কি সওয়াব আছে? এরশাদ হলো, এই সম্পর্ক হারামভাবে স্থাপন করলে কি সাজা হত না? সহাবাগণ বললেন জি হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করলেন, এই ভাবেই হালাল সম্পর্কের খেয়াল রেখেছে এবং (মুসলিম) অজুগোসল-এর নিয়ম-কানুন জানিয়েছে, তেমনিভাবে যৌনশক্তি ও তার প্রয়োজনের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে এবং তার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত মূলনীতিও জানিয়ে দিয়েছেঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ . قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ . -(البقرة : ٢٢٢)

"ওরা তোমাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বল, ইহা একটি অপবিত্রতার অবস্থা। অতএব, হায়েজ চলাকালে মেয়েদের (স্ত্রীদের) থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে ঘেঁষ না (যৌন মিলনে লিপ্ত হয়ো না)। তারপর পাক পবিত্র হয়ে গেলে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন সেভাবেই তাদের নিকট গমন কর।" (বাকারা-২২২)

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ اِلٰى نِسَائِكُمْ . -(البقرة : ١٨٧)

"রোজার রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের নিকট গমন করাকে হালাল করে দেয়া হয়েছে।" (বাকারা-১৮৭)

যৌন বিষয়াদির ব্যাপারে ইসলাম শরীর ও মনের চাহিদাকে সামনে রেখেই বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছে; যেমন পুরুষ তার পুরাপুরি পৌরুষ নিয়েই যেন স্ত্রীদের মনোরঞ্জনার্থে নিজেকে প্রকাশ করে এবং স্ত্রীগণও যেন তাদের পূর্ণ সৌন্দর্য সহকারে স্বামীর নয়নাভিরাম সাজে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ স্বামীর সামনে হাজির থাকে। পুরুষের মধ্যে এর বিপরীত, মেয়েলিপনা, মেয়েলি অভ্যাস ও চাল-চলন যেন দেখা না যায়। একই ভাবে মেয়েদের মধ্যে পুরুষালি চাল-চলন পুরুষালি অভ্যাস ও আলাপ ব্যবহার যেন দেখা না যায়। আসলে প্রত্যেকের নিজ নিজ

ভূমিকা অনুযায়ী আত্মপ্রকাশই তাদের সঙ্গিণী বা সঙ্গীদের নিকট প্রিয় ও কাম্য। এ বিষয়ের স্বাভাবিক বিকাশকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। কোন নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং নারী-পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ ও স্বাভাবিকভাবে সজ্জিত অবস্থায় নিজ নিজ পজিশনে প্রত্যেকের থাকতে হবে।

মানুষের প্রকৃতিদত্ত শরীরের আকৃতি-প্রকৃতির প্রতি ঘৃণার মনোভাব

ইসলাম মানুষের শরীরকে তুচ্ছ, খারাপ ও অপবিত্র বলে মনে করেনি (যেমন খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করেন)। বরং ইসলাম মানবদেহকে পবিত্র বলে জানিয়েছে এবং তার সব থেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, ইসলামে যে সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদাত আছে তার প্রত্যেকটিতে মনের সাথে দেহ সমানভাবে জড়িত এবং কোন ইবাদতের মধ্যেই দেহকে উপেক্ষা করা হয়নি। নামায এর সুস্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নামাযের জন্য সর্বপ্রথম শরীরকে পাক-সাফ করতে গিয়ে অজু করতে হয় এবং এটি একটি শারীরিক কাজ (যদিও এর রূহানী ফায়দা ও উদ্দেশ্যও আছে)। তার পর নামায পড়ার সময় যেসব কাজ করতে হয় তার মধ্যে দেখা যায় সেখানে চিন্তাশক্তি ও আত্মাকে জাগ্রত করার সাথে সাথে শরীরকেও বিভিন্ন কায়দায় পরিচালনা করা হয়। আর এইভাবে নামাযের সময় নামাযির শরীর তার বুদ্ধি ও আত্মার সঙ্গে পুরাপুরি শরীকদার হয়ে যায়। এমনকি আল্লাহ ভীতিও বিনীতভাবে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও শরীর যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কারণ, শারীরিক পবিত্রতা না হলে তো নামাযই হবে না। রোযাও একই সময়ে মানসিক ও শারীরিক ইবাদাত। এভাবে দেখা যায় যে, ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতই কর্মপূর্ণ ইবাদাত এবং প্রতিটি ইবাদাতেই একদিকে যেমন আল্লাহর দিক মনকে রুজু করতে গেলে মনের ভূমিকা আসে তার সাথে শরীরও সমানভাবে অংশ নেয়।

ইসলাম শারীরিক শক্তির গুরুত্ব দেয় বটে; কিন্তু তাকে নিজ ইচ্ছামত চলার পুরা ইখ্‌তিয়ার দিয়ে দেয় না, বরং তাকে নিয়ন্ত্রিত করে ও শারীরিক শক্তি প্রকাশের পথকে নির্দিষ্ট করে দেয়, কারণ তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে তা মানুষের অস্তিত্বের জন্যই ধ্বংসাত্মক হয়ে যাবে।

ব্যষ্টির নিরাপত্তা ও সমষ্টির শান্তি

প্রকৃতপক্ষে মানব অস্তিত্বের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির নিরাপত্তা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া মানুষের জীবনের কল্পনাই করা যায় না। এই জন্যই আল্লাহপাক এদু'টি জিনিসকে মানুষের অস্তিত্বের গভীরে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন।

ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে তার জন্য খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান জরুরী এবং সমষ্টির অস্তিত্বের প্রয়োজনে পারস্পরিক যৌনমিলন শক্তি নিজ প্রতিরক্ষা ও নিজের মত অপরেরও জীবনের উপর আক্রমণ প্রতিহত করার মত যোগ্যতা অত্যাবশ্যক। আর এই সকল প্রকার প্রয়োজনের তাগিদেই প্রত্যেক মানুষকে নিজের নিরাপত্তার খাতিরে, সমাজের একটি অঙ্গ হিসেবে সমাজের নিরাপত্তার জন্য সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে ভালবাসতে হবে।

যাই হোক, আল্লাহ তায়ালা এ অত্যবশ্যকীয় মানবীয় তৎপরতাকে মানুষের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাংগীভাবে জড়িত করে দিয়েছেন যাতে করে প্রত্যেক মানুষ নিজের ও সমাজের নিরাপত্তা বিধানে যথাযথভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। আল্লাহপাক তার অস্তিত্বের মধ্যে এবং তার শারীরিক গঠন প্রকৃতির মধ্যে এমন যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন যে সেগুলো দ্বারা মানুষ নিজ জীবন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে ও জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে টেনে নিতে পারে। সুতরাং, ক্ষুধা ও পিপাসা লাগার কারণেই বুঝা যায় যে, তার ক্ষুৎ পিপাসা মিটানের মত প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয়ের যোগাড় করতেই হবে, আবার গরম বা শীত মৌসুমের পরিবর্তনের কারণে শরীরে যে কষ্টের বিভিন্ন অনুভূতি আসে তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ শরীরকে পোষাক দ্বারা আবৃত রাখবে এবং যে কোন বাসস্থানকে আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করবে। তারপর প্রবল যৌনক্ষুধা ও যৌন মিলনের উদগ্র বাসনা একথার প্রমাণ পেশ করে যে মানুষ এসব কিছুর প্রয়োজন মিটাতে থাকবে। এমনি করে মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা, প্রকৃতিগতভাবে তার শরীরের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে, অনুভব করার জন্য কোন চিন্তাভাবনার দরকার হয় না।

এরপর জীবনকে রক্ষা করার জন্য শরীরের মধ্যে রক্ষিত নিশ্চয়তাদানকারী কলকজাগুলো শরীরের বোঝা হয়েই শুধু নেই যে সেগুলো পোষণ করতে গিয়ে শুধু ক্ষুৎ পিপাসাই লাগবে আর তা নিবারণ করার জন্য সদা-সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। বরং তার আরও একটি দিক আছে যা তাকে আনন্দ দান করে, যেমন জীবন লক্ষ্যগুলোর প্রত্যেকটি হাসিল করার জন্য একই সাথে তাকে দু'টি প্রেরণা দান করা হয়েছে। এক, যা পাওয়ার জন্য পেছন থেকে ধাক্কা দিতে থাকবে। অর্থাৎ ব্যথা-বেদনা বা কষ্টের অনুভূতি যার থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নিজ গরজেই চেষ্টা করবে। দুই, তার জীবনে স্বাদ পাওয়ার অনুভূতি, অন্য ভাষায় চাহিদার অনুভূতি যা তাকে ঐ চাহিদা হাসিল করার জন্য প্রেরণা দেয়, খানা পিনার প্রতি আকর্ষণের অনুভূতি ও যৌনক্ষুধা মিটানোর পিপাসা। তৃতীয়, আশ্রয় পাওয়ার জন্য ঘরবাড়ি বানানোর প্রেরণা, অর্থাৎ জীবনের দাবিগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি দাবিই এমন যে তা পূরণ না হলে শরীরে কষ্টের অনুভূতি আসে এবং শরীর সেগুলো পূরণ করতে দাবি

জানায়, তারপর সে দাবিগুলো পূরণ করে শরীরে তৃপ্তি আসে এবং সে স্বাদ পায়। এই বেদনা ও স্বাদ পাওয়ার অনুভূতি মানুষের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণার উৎস।

শরীরের উত্তেজনাগুলো অপচয়পূর্ণ ব্যবহার

উপরে বর্ণিত উত্তেজনা বা প্রেরণাদায়ক শক্তি একদিকে যেমন মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য তেমনি তার একটি জরুরী দিক এটাও যে, এই উত্তেজক শক্তিকে যদি নিজ গতিতে চলতে দেয়া হয় এবং তার সামনে কোন সীমারেখা না রাখা হয় তাহলে এর ভীষণ ও তীব্র স্রোত সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং সমস্ত নীতি-নৈতিকতার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। সর্বপ্রথম ক্ষতি এই হবে যে, সীমাহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন ঐ উত্তেজনা শরীরকে নানা প্রকার ব্যাধির বাসা বানিয়ে ফেলবে এবং তাকে একেবারেই ধ্বংস করে ছাড়বে দ্বিতীয় ক্ষতি, শরীরের আরাম ও তৃপ্তিও টিকে থাকবে না, আর শরীরকে স্বাদ গ্রহণ করার যতখানি আজাদী দেয়া হবে তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা ততখানি কমতে থাকবে। বরং শেষ পর্যন্ত স্বাদ যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে যবে এবং তৃপ্তি আঁযাব হয়ে দেখা দেবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করার সময় সীমার বাইরে খায়, প্রথমে তার মনে হয় সে খুবই তৃপ্তি পাচ্ছে এবং তার ক্ষুধা দূরীভূত হচ্ছে; কিন্তু আসলে তা না হয়ে কিছুক্ষণ পরেই সে অনুভব করবে তার তৃপ্তির খানা তাকে আরাম না দিয়ে কষ্টই দিচ্ছে। নানা প্রকার পেটের পীড়া তার তৃপ্তিবোধকে বিনষ্ট করছে। এই অতিভোজের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন তার নিকট অনুভূত না হলে এবং এর ক্ষতি না বুঝলে সে কষ্ট পেতেই থাকবে। কিন্তু খাওয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে সে তৃপ্তিও পাবে না। অথচ গো-গ্রাসে সে গিলতেই থাকবে এবং অবশেষে এই খাওয়াই তার কাল হবে। এমনকি এই অতিভোজের বদ অভ্যাস এত মারাত্মক যে, তাকে কেউ এসম্পর্কে সতর্ক করলে বা তার রোগের মূল কারণ এই অতিভোজ একথা জানালেও সে তা মানতে পারবে না। এভাবে সে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে।

আবার যে ব্যক্তি শরীরকে মাত্রার বেশি আরাম দিতে শুরু করে, সে এক সময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তখন তার কাছে এ আরামের অনুভূতি এবং আরামের মজাই আর বোধ হবে না। আর তখন এ আরামই তার শরীরকে অলস ও অক্ষম বানিয়ে ফেলবে, তারপর আরও কিছু দিন পরে দেখা যাবে যে, তার শরীরের ক্ষিপ্রতা ও চটপটেভাব খতম হয়ে গিয়ে এ অলসতা ও অক্ষমতা তার জন্য আযাব হয়ে দেখা দিয়েছে।

যে ব্যক্তি যৌনসম্ভোগে সদা তৎপর এবং যৌন চিন্তায় মেতে থাকে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সে দেখতে পাবে সে এমনভাবে যৌনক্ষুধার শিকার হয়ে গিয়েছে যে, কোনভাবেই তার যৌনক্ষুধা মিটছে না এবং সারাক্ষণ সে নূতন নূতন স্বাদ-এর সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে গিয়েছে।

অপর দিকে যে ব্যক্তি ভূমি বা সম্পদ পাওয়ার জন্য সীমা ছাড়া আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে সে কোন পর্যায় গিয়ে তৃপ্তি পাবে না। এক পর্যায়ে, যথেষ্ট লাভ করার পরও তাকে هَلْ مِنْ مَزِيْد (আরও বেশি কিছু আছে কি?) এই চাহিদা অস্থির করে রাখবে। এবং সম্পদ সম্পত্তির সীমাহীন খাহেশ তার আরামকে হারাম করে দেবে, যত সম্পদই সে লাভ করুক না কেন সে তৃপ্ত হবে না, বরং পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও তার কাছে কম মনে হবে।

জীবনের অপরিহার্য দাবিসমূহ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

একথা চিরসত্য যে জীবনের মূললক্ষ্য এ নয় যে, মানুষ শুধুমাত্র জীবনধারণ সামগ্রী লাভের জন্য সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকবে, বরং জীবন ধারণ সামগ্রী থেকেও অধিক প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আর একটি বস্তু আছে, তা হল সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা। এই সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় জীবন সামগ্রীর আহরণ-পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে।

এ বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন এই বিশাল ও ব্যাপক সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দান করা, যাতে করে সৃষ্টির রূপ মাধুর্যের ব্যাপার মানুষের দৃষ্টিশক্তির প্রশস্ততা পয়দা হয়। একটু সমারোহ, সর্বপ্রকার সৌন্দর্য এবং মানুষের মনোমুগ্ধকর রূপলহরী এসব কি কেবলমাত্র কোন জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই, না এর পিছনে আর কোন মহান উদ্দেশ্য আছে?

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সুন্দর সুন্দর ফুল সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মৌমাছি তার থেকে মধু আহরণ করে মানুষের খাদ্য ও ওষুধের প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাবে এবং অন্যান্য গাছপালার সৌন্দর্য বৃদ্ধির Pollination খিদমত ও ফুল আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

কিন্তু মৌমাছির মধু সংগ্রহের জন্য এতসব সুন্দর সুন্দর ফুলের প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ ফুলের সৌন্দর্যই মধু থাকার শর্ত নয়, কারণ সে সুন্দর অসুন্দর সকল ফুল থেকেই মধু সংগ্রহ করে থাকে। সুতরাং, মৌমাছিদের বরাত দিয়ে এ দাবি করা যে, সুন্দর সুন্দর ফুল সৃষ্টিই মধু সংগ্রহের জন্য। ফুল সৃষ্টির পক্ষে এতটুকু কথা যথেষ্ট নয়।

প্রকৃতির (Nature) সৌন্দর্যের দিকে একবার গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন।

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তের লালিমা, প্রভাত সমাগমে পূর্ব গগণে উদিত সৌন্দর্য, দিগন্ত ব্যাপী মরু-মরীচিকার উপর পাহাড় পর্বতের গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থান, উত্তাল তরঙ্গ মালা শোভিত অথৈ সমুদ্র, চাঁদনী রাত, প্রভাত বেলার উজ্জ্বল প্রভাকিরণ, গোধূলি বেলার ম্লানিমা গোপন পরামর্শরত এই বিশাল সৃষ্টি এসব কিছু এ জীবনের প্রয়োজনীয় মহাসমারোহকে পূর্ণতা দানকারী সৌন্দর্যের মেলা। এসব না হলে কি সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না, সৃষ্টিটা কি অচল হয়ে যেত?

মানুষের মন-মাতানো মুখোচ্ছবি রূপ-মাধুরী দিয়ে গড়া তার আকৃতি-প্রকৃতি, তার হাসিমাখা মনোমুগ্ধকর নয়নযুগল এবং তার চেহারার উপর ফুটে উঠা আত্মার সৌন্দর্যের আভা, এসব কিছু কি একমাত্র জীবনের অস্তিত্বের প্রয়োজনে (for the sake of Biological necessity) আবার খাদ্য, পানীয় এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন ভাল-মন্দ যে কোন প্রকার পূরণ করা যায় না? সৌন্দর্যের এ মহাসমারোহ কি পুরুষ ও নারীর সৌন্দর্য ছাড়া পূর্ণত্ব পেতে পারত না? অবশ্যই এগুলো মহাসুন্দর থেকে বিচ্ছুরিত মহাসুন্দরের সৌন্দর্যের প্রতীক। এগুলো, শুধুমাত্র সৃষ্টির জীবনধারণের প্রয়োজনেই দান করা হয়নি। বরং আল্লাহ্ তায়ালা প্রকৃতিকে এ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন যেন সে জীবন ধারণের কাজগুলোকে কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই না করে, বরং তা যেন সুন্দরভাবে সৌন্দর্য সহকারে আঞ্জাম দেয়।

জীবনের ক্রমোন্নতির অব্যাহত গতি

উপরোক্ত আরও একটি কথা হলো, জীবনের নিরাপত্তাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং জীবনকে নিরাপত্তা দান করার সাথে সাথে উন্নতিকে অব্যাহত রাখা তার জীবনের আসল লক্ষ্য। মানুষ এ জিন্দেগীর কারখানাতে যতই শ্রেষ্ঠ ও যতই সুন্দর হোক না কেন, সর্বদা অত্যন্ত সতর্কের সাথে কাজ করে যেতে হবে এবং জীবনকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সদা তৎপর ও সজাগ থাকতে হবে। এর সাথে সাথে ক্রমাবনতি ও ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যও তার সমস্ত শক্তিকে সংবদ্ধ রাখতে হবে। মানুষ যদি প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে থাকে তাহলে তার শক্তি ও যোগ্যতার এই পুঁজি যা তাকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যায় ও ধ্বংস থেকে বাঁচায় তা ধীরে ধীরে খতম হয়ে যাবে। আর মানুষের স্বাদ গ্রহণের অদম্য ও সীমাহীন স্পৃহা, চিন্তা, চেতনা ও কাজকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেবে না এবং তখন মানুষ অনুভব করতে থাকবে যে, মানবতাবোধ তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার পথে এবং ভুল পথে তৃপ্তি হাসিল করার পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করছে।

মানুষকে দুনিয়ার বুকে খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং খিলাফতের এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তাকে পূর্ণ আজাদী, ইতিবাচক শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও সীমিত পর্যায়ে কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা

আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পৃথিবীকে সুশোভিত করতে পারে। এখন মানুষ যদি নিজ শক্তির অপচয় করে এবং পশুসম ব্যবহার ও পাশবিক চাহিদার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতাকে নষ্ট করে ফেলে তাহলে তার অস্তিত্ব কিভাবে টিকে থাকবে? খিলাফতের দায়িত্বই বা কেমন করে তার দ্বারা আদায় হবে? এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং চিন্তাশক্তির উন্মেষইবা কেমন করে ঘটবে? পৃথিবীতে নির্মাণ ও উন্নতি কিভাবে সংগঠিত হবে? আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে ফায়দা হাসিল করা এবং যে নিয়মের অধীন আল্লাহ্ তায়ালা আসমান যমীন এবং জীবজন্তু পয়দা করেছেন সেই অনিয়ম অনুযায়ী কেমন করে চিরন্তন সত্য ও ইনসাফ কায়েম করবে?

মানুষ তো মাটি ও আত্মা এ উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি আত্মা থেকে পুরাপুরিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে এবং শুধুমাত্র মাটি ও বস্তু-সর্বস্ব হয়ে যায় এবং বস্তুগত চাহিদার দাসে পরিণত হয় তাহলে তার পরিপূর্ণ এবং মূল অস্তিত্ব কিভাবে দুনিয়ার বুকে কাজে লাগতে পারে?

চেতনাহীন গোপনীয়তা ও সচেতন সংযম

ইসলাম মানুষকে যে শুধুমাত্র বস্তুগত চাহিদার দাস হয়ে থাকতে দেয় না তার মূল কারণ এটাই। এর উপর ইসলাম কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং কিছু সীমা আরোপ করে এবং তার সে চাহিদাগুলো পূরণের সঠিক ও ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবস্থা দেয়।

কিন্তু ইসলাম মানুষের বস্তুগত চাহিদাগুলোকে দলিত মথিত করে দিতে চায় না এবং তাদের অবচেতন মনে যে কথাগুলো রয়েছে সে গুলোকে দাবিয়ে দেয়ার পক্ষে নয়। কারণ, মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে যে আবেগ আসে তাকে দাবিয়ে দেয়া ইসলামী কর্মপদ্ধতি বিরোধী, বরং ইসলামী কর্মপদ্ধতি হচ্ছে, ইসলাম মানুষের অস্তিত্বকে, তার সব ধরনের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন শক্তিসহ তাকে তার অস্তিত্বের লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজে নিয়োগ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই উদ্দেশ্য পূরণের কাজে লেগে থাকবে ততক্ষণ তার সকল শক্তি ও যোগ্যতাকে ইসলাম স্বীকৃতি দিতে থাকবে ও ব্যবহার করতে থাকবে। এ কারণেই এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইসলাম মানুষের বস্তুগত চাহিদা, মানসিক আবেগ-অনুভূতি ও স্বাভাবিক ঝোঁক-প্রবণতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। একটু চিন্তা করলেই এ কথা বুঝা সহজ হবে যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য যেখানে সুস্থ সবল ও মজবুত দেহের অধিকারী মানুষের প্রয়োজন সেখানে শরীরকে পোষণ করার ও সবল করার মত উপযুক্ত খাদ্য-খাবার গ্রহণ করা থেকে মানুষকে ইসলাম কিভাবে নিরুৎসাহিত করবে। অপর দিকে যেখানে ইসলাম চায় যে, নেক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বীন ইসলামকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিক সেখানে মানুষের বংশ বৃদ্ধির উপায় যে যৌন-মিলন তাকে ইসলাম কি দাবিয়ে দিতে পারে? প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানোর অনুভূতি ও আত্ম-তৃপ্তির

আকাঙ্ক্ষা যেখানে মানুষকে কর্মপ্রেরণা যোগায় ও উৎপাদনশীল রূপে গড়ে তুলে এবং এই আত্মমর্যাদাবোধ থাকার কারণেই যেখানে খেলাফাতের দায়িত্ব পালনে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে সেখানে আত্মভোলা হওয়াকে কি ইসলাম সমর্থন দিতে পারে? শিরকের মূলোৎপাটন করে আল্লাহপাকের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রামই যেখানে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বলে বুঝানো হয়েছে সেখানে যুদ্ধ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিমূলক শক্তি-সাহস ও সরঞ্জাম যোগাড় করা থেকে ইসলাম মানুষকে কিভাবে গাফেল রাখতে পারে? সুতরাং, চিরসত্য কথা হল, মানুষের সহজাত যত কিছু শক্তি, সামর্থ ও অনুভূতি আছে তার কোনটাকেই ইসলাম দমন করে না, বরং সেগুলোকে সঠিকরূপে ব্যবহার করা শেখায়। আর এই কারণে ঐ সকল শক্তি ও যোগ্যতাসমূহকে বাড়ানোর জন্য ইসলাম উৎসাহ দেয়, খোরাক যোগায় এবং প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেহেতু ইসলাম স্বভাবজাত জীবন-ব্যবস্থা এবং এর মধ্যে বৈরাগ্য বা দুনিয়া থেকে উদাসীন থাকার কোন শিক্ষা নেই । ইসলাম মানুষের শক্তিনিচয় ও যোগ্যতাসমূহ বাড়ানোর স্বাভাবিক চেতনার উপর কিছু যুক্তিপূর্ণ নিয়ম-কানুন (Suppression) ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারী করেছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিরুৎসাহব্যঞ্জক (Repression) মনে হয়, কিন্তু আসলে এগুলো দমন করার কোন পরোক্ষ ব্যবস্থা নয়, বরং মানুষের উদ্দাম ও বেগময় শক্তি নিচয়কে লাগামহীনভাবে ছেড়ে না দিয়ে সেগুলোর সকল সজীবতাকে সঠিক খাতে উপযুক্তভাবে ব্যবহারের এ এক বিজ্ঞানময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Suppression) দমনমূলক ব্যবস্থা (Repression) নয়।[১]

---

১. দমন (Repression) এমন এক মানসিক কাজ যার ফলে প্রবৃত্তির চাহিদা, আবেগ ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে পুরাপুরি দাবিয়ে দেয়া হয়, কারণ সচেতনভাবে এগুলোর ব্যবহার, নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, সাধারণ (পাশ্চাত্য সমাজের) লোকদের কাছে নিন্দনীয় এবং অসামাজিক (Anti social) কাজ মনে করা হয়। প্রবৃত্তির এ চাহিদাগুলোকে জোরপূর্বক দাবিয়ে রাখার কারণে মানুষ অনেক সময় অস্থিরতার ভোগে এবং সরল ও সহজ পথে প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা নিন্দনীয় হওয়ায় বাঁকা বা গোপন পথে কখনো কখনো এর বিস্ফোরণ হয় যার ফলে নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(Frustration spreads)

সচেতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Suppression) এর মধ্যে থেকে যখন মানুষ তার কোন কোন স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করে বা যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে সাময়িকভাবে নিজেকে ফিরিয়ে রাখে, তখন তাকে পরহেজগার বিশেষ এক মর্যাদার (Suppression) অধিকারী মনে করা হয়। মানব সভ্যতার সকল মর্যাদার মূলে রয়েছে এই সচেতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Suppression)।

ইসলাম কোন সময়ে এবং কোন অবস্থাতেই মানুষের মনের মধ্যে না বুঝে কোন কিছুকে দমন করার প্রবৃত্তি পয়দা করে না। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক কোন চাহিদাকেই ইসলাম অপবিত্র বলে না, বরং স্বভাবগত যত চাহিদা আছে ইসলাম সেগুলোকে পবিত্র চাহিদা হিসেবে গণ্য করে সেগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে যেন তার সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়। এসকল চাহিদাকে পছন্দনীয়, আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তিকর ঘোষণা করে সেগুলো পূরণে সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে বলে ইসলাম আশ্বাস দিয়েছে। তবে, ইসলাম মানুষকে মানুষের মতই (মর্যাদাপূর্ণভাবে)

যৌন বিজ্ঞানী ফ্রয়েড (Fraiod) যিনি সর্বদা আত্ম-দমন নীতি (Repression) এবং মানসিক বিকৃতির ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন এবং যাঁর সম্পর্কে মনে করা হয় যে, তিনি এই নীতির প্রবক্তা যে, প্রবৃত্তির যে কোন চাহিদা পূরণ না করলে মানসিক বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি অনিবার্য (Repression must)।" তিনি, তাঁর রচিত "যৌন বিজ্ঞান" পুস্তকে তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করেছেন (Three Contributions to the Sexual Theory) এই পুস্তকের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেনঃ

"আত্মদমন(Repression) ? এবং কোন যৌনক্রিয়া থেকে (সচেতনভাবে) নিজেকে ফিরিয়ে রাখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নিজ থেকে, (কোন উদ্দেশ্যের কারণে) সংযমী হওয়া দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সেই প্রবৃত্তিকে খতম করা (Suppression)নয়, তার দ্বারা মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হয় না, বরং এটি হচ্ছে মহৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থে এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Repression) যা জেনে বুঝে এবং সচেতভাবে করা হয়। এর কারণ হলো প্রবৃত্তির চাহিদা (Repression) কে দাবিয়ে দেয়া অর্থ কোন চাহিদাকে খারাপ, অপবিত্র ও ঘৃণিত মনে করে মন-মগজে ও চেতনায় ঐ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আসার অনুমতিই না দেয়া। অথচ ইসলামে এধরনের কোন চেতনা দান করা হয়নি, বরং ইসলাম এটাকে মনোরম, প্রিয়, আনন্দদায়ক, পবিত্র এবং আকর্ষণীয় এক অনুভূতি বলে আখ্যা দিয়েছে এবং এর জন্য প্রতিদান বা সওয়াব পাওয়ার সুসংবাদও দিয়েছে।

অপর দিকে সচেতনভাবে আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি পৃথক কাজ। এর অর্থ মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ অথবা সমষ্টির নিরাপত্তার খাতিরে কোন প্রাকৃতিক চাহিদাকে পূরণ করার ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম, পরিমাণ ও সময়ের পাবন্দী করাকে নিজের উপর আরোপ করে নেয়া, কিন্তু ঐ কাজকে অপছন্দনীয় খারাপ বা অপবিত্র মনে করা নয়। যেমন কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকলে তাকে অবশ্যই খাদ্য দান করতে হবে এবং সেই খাদ্যের প্রতি চাহিদা বা আকর্ষণ থাকায় তার কোন দোষ নেই। কিন্তু ক্ষুধার সময় বা ক্ষুধা নিবৃত্তির সময় মনুষত্ব বিরোধী কোন এমন কাজ তার দ্বারা যেন সংঘটিত না হয় যার কারণে মানবতার প্রতি তার অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। এমনও যেন না হয় যে, খাওয়ার সময় এত খেল যে হজম না হয়ে বদ-হজমীর শিকার হয়ে গেল এবং অতিরিক্ত ও অনিয়ম ভোজের এই বদ-অভ্যাস তাকে পশুর মত বানিয়ে দিল, তারপর খাদ্য গ্রহণকালে এমনভাবে হাত সঞ্চালন যেন না করে যে, দেখলে মনে হয় কোন জীব-জানোয়ার খাচ্ছে।

জীবজন্তু তাদের যৌনক্রিয়া তাদের নিজ নিজ পদ্ধতি মুতাবেক সম্পাদন করে,

---

এ চাহিদাগুলো পূরণ করতে বলছে, জীব-জানোয়ারের মত নয়। আর এব্যাপারে ইসলাম কিছু সীমানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিয়েছে এবং সচেতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Suppression) মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার পথ বাতলিয়েছে। এ বিষয়ে আরও দেখুন লেখকের রচিত "ইসলাম ও আধুনিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা।"

অথচ মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে এবং খাদ্য খাবার যা-ই সে গ্রহণ করুক না কেন। সময়ের বাইরে, বিলম্বেও গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যও গ্রহণ করতে পারে। খাবার সময় আদব, সভ্যতা ও ভদ্রতা সহকারে গ্রহণ করে সৌন্দর্য আনতে পারে।

উপরন্তু মানুষ হিসেবে, মানুষের কর্তব্যঃ সে চুরি করবে না, নিজ উপার্জিত সম্পদের বিনিময়ে পাওয়া বা নিজ উৎপাদিত খাদ্য সে খাবে, অপরের খাবার জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না বা ধোঁকা প্রতারণার মাধ্যমেও তা সংগ্রহ করবে না এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ খাবারও খাবে না।

মানুষ শুধু পশুর মত খাবার খাবে এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবে এ জন্য তার জন্ম নয়, তার জীবনের আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে, যা পূরণ করা দরকার। সুতরাং খাবার গ্রহণ করাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং তার জীবনের আসল লক্ষ্য উপনীত হওয়ার জন্য শরীরটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং তার জন্য খাবার একটি উপায়। অতএব, উপায় বা মাধ্যমকে মাধ্যম হিসেবেই রাখা উচিত। এমন না হয় যে উপায় নিজেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং মানুষ দুনিয়ায় শুধু রকম-বেরকম খাদ্য খাবার সংগ্রহ ও তা নানা পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে খাওয়া নিয়েই কালাতিপাত করবে এবং এ ছাড়া তার আর কোন কাজ থাকবে না।

মানুষের কর্তব্যের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, সে একাই খাবে না, বরং মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে তাদেরকে নিয়ে খাবে। বঞ্চিতদের প্রয়োজন যথাসম্ভব মেটানোর চেষ্টা করবে, সুখ-দুঃখ তাদেরকে ভাগী করে নেবে। আর এমন যেন মনে না করে যে, সে যখন জায়েয পদ্ধতিতে সম্পদ বা খাদ্য-খাবার সংগ্রহ করেছে, তখন এতে অন্য কারো হিসসা নেই। তা তার আশে পাশে দীন-দরিদ্র যতই থাকুক না কেন, তাতে তার কিছু আসে যায় না, ভুখা-নাংগা বা বঞ্চিত কেউ থাকলে তাতে তার কি। সে কি সবার জন্য দায়ী, ইত্যাদি চিন্তা মনে স্থান দিয়ে সেই মত ব্যবহার করলে সে ইসলাম ও তার বিধানকে অস্বীকারকারী বলেই বিবেচিত হবে। বরং ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেঃ

وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"তাদের সম্পদের মধ্যে যে প্রার্থী এবং যে বঞ্চিত তার হক (পাওনা) রয়েছে।"

একজন মুসলমান কুরআনের এ দাবীকে উপেক্ষা করে ইসলামের ধারক-বাহক হতে পারে না এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়াও সম্ভব নয়।

যাই হোক, একজন মুসলিম অভ্যাসগত কারণে অথবা পূর্ণ সচেতন হওয়ার

ফলে এসকল বিধান পালন করে এবং এগুলো সবই খাদ্য চাহিদার উপর প্রযোজ্য বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি। কিন্তু এগুলোকে দমন বলা যায় না। মানুষ এসকল নিয়ম-পদ্ধতি অভ্যাসগতভাবে গ্রহণ করুক অথবা বুঝে সুঝেই গ্রহণ করুক না কেন এই নিয়ন্ত্রণের কোনটির কারণে খাদ্যের স্বাদ কিছুমাত্র কম হয় না, বরং খাদ্য-খাবারের প্রতি প্রযুক্ত এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মেনে নেয়ার ফলে তার মধ্যে মূল বস্তুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত এং রসায়নগত স্বাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তার মানসিক ও আত্মিক স্বাদও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু তার মধ্যে মানবিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়। স্বাধীন-চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং তার মধ্যে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক প্রবণতা গ্রহণ করার কারণে, নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনা পয়দা হয়, অন্য মানুষের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার মহৎ ইচ্ছা জাগে এবং পবিত্র খাবার খাওয়ার আগ্রহ পয়দা হয়। এভাবে আল্লাহ্‌র হক ও বঞ্চিত বান্দাহদের হক আদায় করার পবিত্র অনুভূতির কারণে তার আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, খাদ্য খাবারের উপর, উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি কবুল করলে মানুষের ইন্দ্রীয়গত স্বাদের মধ্যে কোন কমতি হয় না, বরং তা আরো বেড়ে যায়।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা

নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নও তদ্রূপ। এখানে মানুষ তার বিপরীত শ্রেণীর প্রতি আর্কষণ অনুভব করে, তার সংগে মিলে একাকার হয়ে যেতে প্রবল এক আকাঙ্ক্ষা সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায়। আর, সত্য বলতে কি ইসলামের দৃষ্টিতে এ ইচ্ছা অপছন্দনীয় নয় এবং এ মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয়ও নয়। বরং এটাই তো প্রকৃতির দাবী যে, সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এই প্রকৃতি দান করেছেন যে মানুষ তার বিপরীত শ্রেণীর জন্য আকর্ষণ এবং চাহিদা অনুভব করবে। এ আকাঙ্ক্ষা তাকে তার জীবন-লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করবে এবং মানব-মণ্ডলীর হেফাজতের জন্য এটা অপরিহার্যও বটে। মানুষের শারীরিক গঠন এবং তার শারীরিক (Physiological) জীবাণুঘটিত (Biological) এবং রাসায়নিক (Chemical) অস্তিত্ব তার এ আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য তাকে পুরাপুরিভাবে সাহায্য করে যাতে করে দু'টি প্রাণ পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে জীবনকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে এবং নূতন বংশধর জন্ম নেয়। আসলে পারস্পরিক এ আকর্ষণ এবং আবেগ অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে থাকে। কিন্তু বিপরীত শ্রেণীর (লিঙ্গের) প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের অর্থ তো এটা হতে পারে না। যে মানুষ সারাক্ষণ যৌন চেতনা ও চিন্তা নিয়েই মশগুল হয়ে থাকবে, এরই চর্চা করবে এবং এ চর্চা ছাড়া তার আর কোন কাজ

থাকবে না। মানুষ তো শুধু যৌনসম্ভোগের জন্য দুনিয়ায় আসেনি এবং এটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং মানুষের নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি বহু। সর্বপ্রথম একজন যুবককে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে যে সেখানে কি কি বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে এবং তার কারণগুলোই বা কি; তারপর সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার (Diversion) এর প্রবণতা রোধ করার চেষ্টা তাকে করে যেতেই হবে এবং ভাল কাজের তাবলীগ করে জনগণকে ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সব বাঁধাবিঘ্ন ও দুঃখ কষ্ট আসবে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। এভাবে সমাজের মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে তাদেরকে সেই পথে এগিয়ে আনার জন্য নিজেকে সুন্দরতম নমুনা বা আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পেশ করতে হবে, কারণ মানুষ যা বলে বা যা প্রচার করে তা যদি সে নিজে পালন না করে তাহলে তার কোন আছর (ফায়দা) তো হবে না। আর যখন সে জনগণকে যৌন আবেগের উত্তাল তরংগে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচাতে চাইবে তখন তার নিজেকে অবশ্যই, শুকনা বস্ত্র নিয়ে কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

নারী জাতির প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, তার অর্থ এ নয় যে, কেউ পথেঘাটে কোন যুবতীকে দেখবে, অমনি তাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়ে নিজের ব্যবহারে লাগিয়ে দেবে, ঐ মহিলারও ইজ্জত বলতে তো কোন জিনিস আছে এবং তা তার নিজের মর্যাদা থেকে কোন অংশে কম নয়; তার আত্মমর্যাদাকে যেমন সে নিজে ক্ষুণ্ন হতে দিতে চায়না তেমনি অপরের ইজ্জতের হেফাজত করাও তার দায়িত্ব। তারপর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই আশা করে যে, তার স্ত্রী সতী ও পাক পবিত্র হোক, তেমনি অন্য মেয়ের পবিত্রতা রক্ষা করাও তার কর্তব্য; কারণ তার নিজের মত ঐ মেয়েটির স্বামী যে হবে তারও তো আকাঙ্ক্ষা হবে যে তার স্ত্রী যেন পাক ছাফ হয়। এমনকি ঐ যুবতী যদি আবেগ তাড়িত হয় এবং নিজেই যদি তাকে যৌন ক্রিয়াকলাপের প্রতি আহবান জানায় তবুও ঐ মেয়েটি তার জন্য জায়েয হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, কোন চৌকিদার যদি কাউকে বলে যে, আমি যে মালের হেফাজত করছি এটা তুমি চুরি করে নিয়ে যাও, তাহলেই কি ঐ চুরি করাটা তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে? ঐ চৌকিদার তো ঐ মালের রক্ষক মাত্র, মালিক তো নয়। একইভাবে উক্ত যুবতীও নিজ মর্যাদার রক্ষক মাত্র। সে মালিক নয় যে, যা ইচ্ছা তাই করবে। তাকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে তার ইজ্জতকে লুন্ঠন করার জন্য যে কাউকে অনুমতি দিয়ে দেবে। এ ইজ্জত শুধু তার একার নয়, তার পিতামাতার, তার বংশের, তার সমাজের এবং গোটা মানবজাতির ইজ্জতের সাথে জড়িত। আর সত্য বলতে কি, এ ইজ্জত হচ্ছে ঐ আমানতের ইজ্জত যা আল্লাহপাক মানুষকে দান করেছেন এবং আমানতের দাবী হচ্ছে যেন তার খেয়ানত না করা হয়।

মানুষের মন-মগজে যৌন চিন্তা এমনভাবে যেন জেঁকে না বসে যেন সে ধীরে ধীরে পশুতে পরিণত হয়ে যায়, কারণ সে একমাত্র বস্তুগত ও শরীরসর্বস্ব জীব নয়। তার জীবনে এমন কোন মুহূর্ত নেই, যখন সে বুদ্ধি ও আত্মা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায় এবং একেবারে নির্বোধ জানোয়ারে পরিণত হয়। যেহেতু যৌনক্ষুধা তার পূর্ণ সত্তার একটি অংশ। অতএব এ অনুভূতিকেও তার সুস্থ এবং সুন্দর প্রকৃতির প্রতিভূ হতে হবে, অর্থাৎ শরীরের চাহিদার সাথে নারী পুরুষের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে দরদ-মুহাব্বত, বিনয়-নম্রতা, পারস্পরিক সমঝোতা এবং আত্মার নিবিড় বন্ধনও হতে হবে। রাতের আঁধারে চুরি-চামারি করে যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তার দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। অবশ্য কেউ এটা মনে করতে পারে যে এত বেশি কড়াকড়ি যদি নারী পুরুষের মধ্যে করা হয় তাহলে তাদের স্বাভাবিক পারস্পরিক আর্কষণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সাময়িক আবেগ বশতঃ যে সব চিন্তার উদ্রেক হয় তাতে এমনই মনে হয় বটে, কিন্তু সঠিক অবস্থা তা নয়; বরং আবেগপূর্ণ ঐ মুহূর্তগুলো পার হয়ে গেলেই দেখা যায় কঠিন সত্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ নিজ প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো মানবীয় পদ্ধতিতে পূরণ করে, কারণ মানুষ নিজ ইচ্ছা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে এবং মানুষ বুঝে যে তার শারীরিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক প্রয়োজনগুলো কি, এই কারণেই যখন মানুষ কোন মেয়েকে তার চরিত্র, অভ্যাস ও চেহারা ছবির সৌন্দর্যের কারণে পছন্দ করে এবং বুঝে যে তার জীবন ঐ মেয়েটিকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে এবং ভদ্রতার সাথে কাটবার সম্ভাবনা, তখন সর্বপ্রথম সে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে এবং তার কাছেই তার অন্তরের আকুতি পেশ করে জানায় যেন আল্লাহ্ তায়ালা মেহেরবানী করে তার কুদরাতের দ্বারা ঐ মেয়েটিকে তার ভাগ্যের সাথে জুড়ে দেন। তারপর পিতামাতা ও অভিভাবকদের নিকট তার পছন্দের কথা জানায়, সাথে সাথে তার গুণাবলী এবং কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে পেশ করে যেন প্রস্তাবিত কন্যার বংশের লোকজন তার বিশ্বস্ততার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং তার সুন্দর ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। এ অবস্থা না আসা পর্যন্ত সে সবর করতে থাকে এবং তার ভাল গুণাবলী ও যোগ্যতার পরিমাপক কার্যাবলী প্রকাশ করে জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য অবিরত চেষ্টা সাধনা করে যায়।[১]

---

১. "ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি আত্মিক ও নৈতিক নিয়ম কানুনের সংগে সামঞ্জস্যশীল এবং নৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং সামগ্রিকভাবে জীবনের সকল সংগঠনের এটি উদ্দেশ্য এবং তা হচ্ছে মানুষ আল্লাহ্ প্রদর্শিত সরল সঠিক পথে চলবে। উপরন্তু, ইসলাম সমাজে মানুষের বিভিন্নমুখী আবেগ উজ্জীবিত করার মত এমন কোন অস্থিরতা নেই যার কারণেই মানুষের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। (যেমন করে জাহেলী ও অনৈসলামী

এইভাবে এই মানুষটি ঐ প্রস্তাবিত মাহিলাকে বিয়ে করে নেবে, তখন তার থেকে তৃপ্তি পাওয়া তার জন্য হালাল হয়ে যাবে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা, পবিত্রতা এবং আত্মিক পরিচ্ছন্নতা ও আন্তরিক প্রেম-প্রণয় এবং দরদ মুহাব্বাতের সাথে তার সংগে শারীরিক সঙ্গ হাসিল করা সঠিক বলে বিবেচিত হয়ে যাবে। আর এভাবে তার বিবেক শান্তি পাবে, তার আত্মা নিশ্চিন্ততা লাভ করবে, সাথে সাথে সে পরিপূর্ণ স্বাদ ও সন্তোষ অর্জন করবে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ فِى صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ . وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ. وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. -(المؤمنون : ١ - ٦)

"অবশ্যই সফলতা অর্জন করেছে ঐ সকল মুমিন যারা তাদের নামাযে বিনয়-নম্রতা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে, যারা বে-ফায়দা আচার আচরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যারা জীবনকে পবিত্রকরণের কাজ করেছে, তবে তাঁদের লজ্জাস্থানগুলোকে (অবৈধ ব্যবহার থেকে) হেফাজত করেছে, তবে তাদের স্ত্রী ও যাদের উপর তাদের ডান হাত কর্তৃত্বশীল (দাসী যার প্রচলন আগে ছিল) তাদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদেরকে কোন দোষ দেয়া হবে না।" (মু'মেন-১-৬)

نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ. -(البقرة : ٢٢٣)

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ভূমি (তুল্য), অতএব তোমাদের ভূমিতে তোমরনা আগমন কর যে দিক থেকে খুশী (কর্ষণ করো ফসল পাওয়ার আশায়)।" (বাকারা-২২৭)

যাই হোক, ইসলামে নারী পুরুষের সম্পর্কের অবস্থা হচ্ছে এটাই; এর মধ্যে জবরদস্তি করে কোন আবেগ অনুভূতিকে চেপে দেয়ার ব্যবস্থা নেই, কোন অপবিত্রতা বা মন্দ বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বও এত নেই, বরং প্রাকৃতিক যাবতীয় চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থার সাথে সাথে এমন পবিত্র তৃপ্তি পাওয়ার সুযোগ এ সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান যার সাথে জীব-জানোয়ার পরিচিত নয়-এটা একমাত্র মানুষই বুঝতে পারে এবং এ আনন্দ পেতে পারে।

সমাজে সাধারণভাবে হয়ে থাকে এবং যেমন করে আজকের পাশ্চত্য ও জাহেল সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। সেখানেতো মানুষ অস্থিরতা দমন করে রাখতে পারেই না, বরং দেখা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের আবেগকে চরিতার্থ করার জন্য এমনভাবে দৌড়াচ্ছে যেমন একটি ভেড়ার পালে বাঘের আক্রমণ হলে সবাই ছুটোছুটি করে পালায়।"

ইসলাম মানুষের যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগায়

ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি ও প্রবণতাকে চেপে দেয় না (Does not repress any of his born and natural instincts) এর বিলুপ্তি সাধনও করেনা; কারণ ইসলাম চায় মানুষের স্বাধীন সত্তার সকল শক্তি ও যোগ্যতার সঠিক ব্যবহার হোক এবং মানুষের অস্তিত্ব মজবুত ও শক্তিশালী হোক এবং জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত শক্তি সামর্থে ভরপুর হোক যাতে করে সে ইসলামের পয়গাম বহন করতে ও দুনিয়াবাসীর নিকট সে পৌঁছে দেয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং একাজের প্রতিক্রিয়াসমূহ বরদাশত করতে পারে এ কাজের যাবতীয় দাবী করতে পারে এবং কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে (জিহাদে) অবতীর্ণ হতে পারে।

বাস্তবে এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, যে ব্যক্তির নিকট তাব জীবন প্রিয় নয়, সে জিহাদী কাজেও অংশ গ্রহণ করতে পারে না। যদিও বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, মুজাহিদগণ জীবনের আমোদ-প্রমোদের প্রতি তেমন আকর্ষণ রাখে না, কারণ স্বরূপ মনে করা হয় যে, যে ব্যক্তি জীবনের মুহাব্বত, তার স্বাদ-চাহিদা ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য অতিমাত্রায় মেতে উঠে সে চূড়ান্ত ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদাহরণ বা কোন আদর্শ (Ideals) পেশ করার জন্য জিহাদ করতে পারে না। যেহেতু জিহাদ করতে গেলে এ সকল আনন্দ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হয় যা সে পেরে উঠে না। একদিকে এটা যেমন সত্য, তার সাথে এটাও বড় সত্য যে, যার মধ্যে এ সকল চাহিদা পূরণের কোন প্রয়োজন আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছা বা যোগ্যতা নেই, বা থাকলেও অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় আছে, সে বাতিল শক্তির সংশোধন, সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং এর জন্য জিহাদ করতেও দৃঢ়সংকল্প হয় না। চিন্তা করলে এর কারণ বুঝা যায় যে, তার কাছে সব কিছুর গুরুত্ব একই রকম এবং সকল জিনিসের প্রতিই তার চাহিদা দুর্বল আর প্রতি সমস্যার ব্যাপারেই সে অমনোযোগী।

আসলে মুজাহিদগণ (যারা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে) তাদের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা সাধন (মন ভোলানো জিনিস ত্যাগ) এর প্রবণতা পাওয়া যায়-একে সংসার ত্যাগ এর ইচ্ছা বলা যায় না, বরং এটা স্বতন্ত্র এক মানসিক কাজ। প্রকৃতপক্ষে মুজাহিদগণ দারুণ আবেগপ্রবণ হয় এবং ভরা যৌবনের জোয়ারে টগবগ করে। এতদসত্ত্বেও তারা জীবনের স্বাদ-আহলাদ বেশি বেশি গ্রহণ করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচায় এবং মানসিক যে শক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের তীব্র আবেগ ও জীবনের বহু আর্কষণীয় বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই শক্তিকেই তারা বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের কাজে ব্যয় করে; অর্থাৎ তাদের বস্তু ত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে, এতে তাদের কোন প্রয়োজন নেই বা এসব কিছু তাদের নিকট আকর্ষণীয় নয়, বরং এ বর্জন করার মূল উৎস হচ্ছে তাদের মানসিক শক্তি।

আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর আসল জিনিস হলো মানসিক শক্তি যা ইন্দ্রিয় শক্তিকে যথেচ্ছার থেকে রক্ষা করে এবং কুপ্রবৃত্তির উপর বিবেকের অভিযানকে বিজয়ী করে। প্রতিটি জিনিসের জন্য যেমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে থাকে, এর সাথে তার মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করারও (Suppress) একটি শক্তি তার মধ্যে থাকে যার সাহায্যে একজন সাধক নিজ চাহিদাকে সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে সেই শক্তির ভিত্তিতেই সে মানুষকে নেতৃত্ব দানের মর্যাদা লাভ করে।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে (On the Basis of this interpretation) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাব। তার জীবনের আনন্দলাভ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি শক্তিমান ছিলেন এবং যে কোন ব্যাপারে বিজয়ী হওয়ার মত মানসিক দিক দিয়ে বলশালী ছিলেন এবং সর্বপ্রকার আকর্ষণকে তিনি যথাযথ মূল্য দিতেন। তিনি রাস্তা দিয়ে চলার সময় মনে হত তিনি ক্ষিপ্রতার কারণে যেন উড়ে চলেছেন, খাদ্য গ্রহণের সময় সুস্থ সবল ব্যক্তিসুলভ আগ্রহ পছন্দ সহকারে খাওয়া দাওয়া করতেন, তিনি নিজ স্ত্রীদেরকে নিয়মিত সঙ্গ দিতেন। অর্থাৎ জীবনের বরকতপূর্ণ আবেগে তার মন ভরপুর ছিল, তার পবিত্র অস্তিত্ব উৎসাহ উদ্দীপনায় বেগবান এবং মুবারক শরীরটি ছিল স্বাস্থ্য ও শক্তির ফোয়ারা। আর এই কারণে তিনি শক্তিমান যোদ্ধা ও মুজাহিদ এবং জিহাদী কাজে বাধাদানকারী প্রতিটি আস্বাদন থেকে বেপরোয়া ছিলেন।

অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ এবং শক্তিশালী মানুষের অস্তিত্ব যে দিকেই মুখ ফিরায় পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তিসহ মুখ ফিরায় এবং সে সব স্বাদ আহলাদকে পরিত্যাগ করে পূর্ণ শক্তি সহকারেই তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। এই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা যা যে কোন স্বাদকে গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে নিজ ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে।

একইভাবে এই বলদৃপ্ত ও ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তি যেন চাহিদার এমন গোলামে পরিণত না হয় যে, তার চাহিদাগুলো তাকে যেথায় খুশী সেথায় নিয়ে যাবে এবং মনমত জিনিস লাভ করতে না পারলে সে নিজেকে ব্যর্থ ও জীবন্মৃত বলে মনে করবে।

ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জ্বল পদ্ধতি

মানুষের মন মগজের প্রশিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি (Method) হচ্ছেঃ মানুষের স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতিকে ইসলাম চেপে দিয়ে বা দলিত মথিত করে দিয়ে একেবারে তার কবর দিতে (Repressed করতে) চায় না অথবা তাকে একবারে

লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিতেও চায় না, বরং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, আবেগ বা উত্তেজনাকে একেবারে দাবিয়ে (Complete repression= করে) দেয়া হলে যেমন মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক তেমনই তাকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়াও মানবতার অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক। এই জন্য প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে ইসলাম মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার এবং সচেতনভাবে তার আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

মানুষের মধ্যে অবস্থিত তার অন্তর্নিহিত শক্তি যাতে ছোটবেলা হতেই নিয়ন্ত্রিত হয় (Self control= গড়ে উঠে) তার জন্য প্রশিক্ষণ দান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং তার সুপ্ত যোগ্যতা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে তাকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে তার অভ্যাসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ (Control) করতে শিখিয়েছে, সে যেন তার অভ্যাসগুলোকে কাজে লাগাতে গিয়ে সীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু, এই প্রশিক্ষণ পর্বে ইসলাম কঠোর পন্থা অবলম্বন করে না, বরং আদর মুহাব্বত ও স্নেহ মমতার পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তুলে সেখানেই তার প্রশিক্ষণ স্বাভাবিক গতিতে চালাতে থাকে। এ পারিবারিক ব্যবস্থাপনা (Family system) এমন চমৎকার যার মধ্যকার প্রতিটি দিক সর্বক্ষণ স্নেহ মমতার ঝর্ণাধারায় সিঞ্চিত হতে থাকে, ভালবাসার মৃদুমধুর সুর ধ্বনিত হয় এবং পিতামাতা ও সন্তানদের পারস্পরিক মুহাব্বতের মাধুরী মেশানো এক বেহেশতী সুষমা বিরাজ করতে থাকে।

স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম-ভালবাসা ও বিনয়-নম্রতার পরিবেশে বাচ্চাদেরকে লালন-পালন করার সময়ে তাদেরকে এমন সব কথা শেখানো হয় যা তাদের অন্তরের মণিকোঠায় অঙ্কিত হয়ে যায়। তার পর, কোন সময় যদি দেখা যায় যে, বাস্তব উদাহরণ পেশ করে ভালবাসার মাধ্যমে কোন প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করা যাচ্ছে না তখন একটি মুনাসিব মত কিছু শাসনও করা যেতে পারে। এ কারণে নবী (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ (সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত)

"তোমাদের বাচ্চারা সাত বছর বয়সে পৌঁছুলে তাদের নামাযের জন্য হুকুম দাও এবং দশ বছর বয়সে পৌঁছেও যদি নামায না পড়ে তাহলে তার জন্য (হালকা) মারধর কর।"

নামাযের সুন্দর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য স্বাভাবিক একটা আর্কষণ সৃষ্টি হয়; এর জন্য বাড়ীতে মুরুব্বীদের ব্যবহার হবে আন্তরিকতাপূর্ণ। ভালবাসার পরিবেশ যেন পিতামাতার মধ্যে বিরাজা করে। ফলে তাদের অনুসরণে সন্তানগণ পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে এবং তাদের মধ্যে আনুগত্যবোধ জাগবে, এজন্য মুসলিম গৃহগুলোকে মিষ্টি-মধুর কথা ও স্নেহ মমতার ব্যবহার এক বেহেশত হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেলে সেখানে শাসনের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে শাসন ব্যবস্থা এত কঠোর

হবে না যাতে বাচ্চাদের শরীরে কোন দাগ লেগে যায় বা কোন অংগ-হানি হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কন্যাগণ ও কন্যাদের সন্তানগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে কখনো মারধোর করেননি। তাদেরকে আদর-মুহাব্বত,তাদের প্রতি সার্বক্ষণিক মনোযোগ ও তাদের সামনে উত্তম আদর্শ স্থাপন করে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তা শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের সকলের জন্য চিরদিনের তরে সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে রয়ে গেছে যা তাদেরকে তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পথ দেখায়। আসলে নামায চেতনাপূর্ণ এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Suppression) যার ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য অভ্যাস গড়ে ওঠা এমন নিয়ন্ত্রণ যা মানুষকে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে তার জীবনের কাজগুলোকে গুছিয়ে করার প্রেরণা যোগায়। এর সাথে নামায মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে অভ্যস্ত করে তোলে, ফলে মানুষের ভিতরটাও সুন্দর হয় এবং সে তার অন্তরনিহিত আবেগ অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার এক অপূর্ব ক্ষমতা লাভ করে।

ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে রোযা একটি কঠোর সংযম-সাধনা। কারণ এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে তার চাহিদা পূরণের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত করে এবং রোযার সময়ে বৈধ (হালাল) জিনিসগুলো পর্যন্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত হয়ে যায়। আল্লাহর হুকুম মানার অনুভূতি নিয়ে এ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তার আত্মাকে বলীয়ান ও মর্যাদাপূর্ণ করে।

এভাবে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ইসলামী ইবাদাত বলতে যা আছে তার প্রত্যেকটি দ্বারা কোন না কোনভাবে মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, তার মনকে ঝোঁক প্রবণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তার কাজকে নিয়ম মাফিক করা হয়েছে এবং তাকে সঠিকভাবে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

কিন্তু, এ নিয়ন্ত্রণ (Control) এবং সচেতনভাবে নিজেকে পরিচালনার যে কাজ তা করতে গিয়ে ইসলাম কোন জবরদস্তিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করেনি, বরং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে ইসলাম কাজে লাগিয়েছে।

জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley) নামক একজন অমুসলিম লেখক ছিলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর লেখাতে ধর্মের কোন কথা স্থান না পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তবুও তার রচিত "আধুনিক জগতের মানুষ" (Man in Modern World) নামক গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখছেনঃ

"মানুষ ও তার বুদ্ধির মধ্যে বিরাট এক পার্থক্য আছে, যদিও আমরা জানি পোকামাকড়ের প্রকৃতি কতটা দুর্বল বা শক্তিশালী এবং দুগ্ধ-স্তন্যপায়ী জীব (Mammals) তাদের থেকে তেমন কোন উন্নত নয়, কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি থাকার কারণে তার জীবন দারুণ গুরুত্ববহ। শুধু তাই নয়, বরং যখন সে অভ্যাসের দাসত্ব করে কোন অপরাধ করে বা কোন চেষ্টা সাধনা করে, তখনও তার চিন্তা শক্তি সব কিছুর উপর প্রভাবশালী থাকে। নিশ্চিতভাবেই একথা সত্য যে জীব-জন্তুর কাজ সীমাবদ্ধ অর্থাৎ তার ফল সুদূর প্রসারী হয় না, যেহেতু তারা চিন্তা-ভাবনা করেও কোন পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে না। অপর দিকে মানুষ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে, তার কারণেই সে কোন কোন কাজ করে এবং কোন কোন কাজ পরিহার করে, ভাল-মন্দ বুঝে সে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন। মানুষের এই গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতার ফলে তার মধ্যে মানসিক কিছু প্রতিক্রিয়া হয়, যা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকগণ অস্বীকার করেন ও ভুলিয়ে দিতে চান ঐ সব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিগত বুদ্ধিকে বড় মনে করাও একটি। যেমন, মানুষের পদস্খলনের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে মানুষই একমাত্র অক্ষয়, তার কীর্তি অক্ষয়। আর সে মনে করে এই অবস্থা লাভ করতে হলে তাকে মানসিক বিভিন্ন টানাপোড়নের ভেতর দিয়ে চলতেই হবে। এতদত্ত্বেও আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী, মানসিক বিকৃতিকে সংযত করারও যথেষ্ট শক্তি মানুষের আছে। মনস্তত্ত্ববিদরা এ শক্তিকে অবচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ (Repression) ও সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ (Supperssion) বলে আখ্যা দেন।

হাক্সলে (Huxley)- র মতে মানুষের মধ্যে এমন প্রাণপ্রবাহ বর্তমান আছে যার কারণে সে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে শ্রেষ্ঠ। এ প্রাণপ্রবাহ তাকে গতিশীল করে এবং তার কর্ম স্বাধীনতার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলাম তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে মর্যাদার শিখরে তুলে দেয়। এই প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে সে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করে, যেমনঃ

সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয়

ইসলাম মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পয়দা করার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটি যোগসূত্র কায়েম করে দেয়, আর মানুষের সকল কাজ চিন্তাও চেতনার মধ্যে মুরাক্বাবা (আল্লাহ্র ধ্যানে মশগুল হয়ে তাঁর সবকিছু প্রত্যক্ষ করার প্রত্যয় লাভ) করার এবং তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। আল্লাহ্র সম্পর্কে এই চেতনা, তাঁর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি ও তাঁর ভয় মনের মধ্যকার অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণ (Control) করে, কিন্তু এসব অনুভূতি নিচয়কে এমনভাবে দাবিয়ে দেয় না যে, এগুলো নির্জীব (repressed) হয়ে যাবে। কারণ, যেমহান সত্তার সাথে

তার যোগসূত্র কায়েম হয় তিনি নিজেই তো তাঁর প্রদত্ত সকল প্রকার স্বাদকে জায়েয করে দিয়েছেন এবং মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যেন সে পূত-পবিত্রভাবে এসব স্বাদ হাসিল করে।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

(الاعراف : ٣٢)–

'হে নবী! কে হারাম করেছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য এবং পবিত্র জীবন ধারণ সামগ্রীগুলো যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন? বল, এগুলোত দুনিয়ার জীবনে তার মুমিন বান্দাহদের জন্য বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে তো একমাত্র তারাই এগুলো পাবে।" (আরাফ-৩২)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. –(البقرة : ٢٢٢)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সব ব্যক্তিদের ভালবাসেন যারা অন্যায় করার পর তওবা করে এবং যারা জীবনকে বিভিন্ন খারাবী থেকে পবিত্র রাখে।" (বাকারা-২২২)

এভাবে ইসলাম মানুষের অন্তরের মধ্যে আখেরাতের বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে দেয়। যার কারণে মানুষের মনের মধ্যে অপরূপ ভাবাবেগের (Phenomena) উদয় হয় এবং মানুষ স্বাদ গ্রহণের বিভিন্ন উপকরণ জায়েয থাকা সত্ত্বেও জন্তু-জানোয়ারের মত লাফিয়ে পড়ে সেগুলো ভোগ করতে চায় না। কারণ, আখেরাতের ধ্যান ধারণা না থাকলে এবং আখেরাতের দৃঢ় বিশ্বাস-এর অভাব হলেই তবে সে এই দুনিয়ার জীবনকে সব কিছু মনে করত এবং এর ভোগসামগ্রীকে গ্রহণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে চাইত যে এই সীমাবদ্ধ এবং নশ্বর জীনের মুহূর্তগুলোতে যতটা সে ভোগ করে নিতে পারে নিক, কিন্তু প্রকৃত মুমিন যে, তার সামনে জিন্দেগীর আর একটি স্তর আছে, সে এই দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু জ্ঞান করে না, বরং আখেরাতের চিন্তায় দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ-সৌন্দর্য তার কাছে তুচ্ছ এবং গৌণ হয়ে যায়। সেজন্য সে এসব ভোগ-সামগ্রী লাভ করার জন্য খুব বেশি ব্যস্ত এবং অস্থির না হয়ে, ধীর-স্থিরভাবে ও হালালভাবে এবং যতটা না হলে নয়, ততটাই গ্রহণ করে। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফলে সে দু'টি ফায়দা হাসিল করে। এক, সে দুনিয়ার স্বাদআহলাদের জিনিসগুলো থেকে পূর্ণ তৃপ্তি পায়। দুই, সে পরিপূর্ণভাবে মানসিক প্রশান্তি, পূর্ণভাবে শারীরিক আরামবোধ এবং অন্তরের মধ্যে অনাবিল এক শান্তি লাভ করে।

এরপর, ইসলাম মানুষকে সদা-সর্বদা সতর্ক করতে থাকে যে এ পার্থিব

জীবনের স্বাদ-আহ্লাদের বস্তুগুলো ও যাবতীয় বস্তুগত ভোগসামগ্রী হাসিল করা মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য নয় যে, সে সর্বক্ষণ জান-প্রাণ দিয়ে এগুলো অন্বেষায় লেগে থাকবে অথবা এগুলো হাসিল করার জন্য তার মন-মগজকে নিয়োজিত রাখবে। বরং, এসব ভোগ-সামগ্রীর আস্বাদন ও এগুলো হাসিল করার তৃপ্তি অন্যান্য আরও উন্নততর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় ও মাধ্যম।

খাদ্য-খাবার পাওয়া ও খাওয়া মানুষের জীবনের মূললক্ষ্য নয়। বরং জীবনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার একটি উপায় বিশেষ। মহানবী (সঃ) এরশাদ করেন, 'পেট থেকে নিকৃষ্ট আর কোন পাত্র নেই যা মানুষ ভরতে থাকে, আদম সন্তানকে (তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ও কর্মক্ষম রাখার জন্য) কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট।' (আহ্মদ তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম)।

যৌন সম্পর্কের মূললক্ষ্য মানব সত্তার সংরক্ষণ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً. -(النساء : ١)

"হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি ব্যক্তি থেকে আর তার থেকে তার জোড়া পয়দা করেছেন এবং এ দু'য়ের থেকে তিনি বহু নরনারী (পৃথিবীর বুকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (নিসা-১)

আল্লাহ্ তায়ালার আর একটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছেঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত বান্দাহগণ অধিক সংখ্যায় পয়দা হোক। রসূল (সঃ) এর জবানীতে আল্লাহ্র এই উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত হয়েছেঃ

"বিয়ে কর এবং বেশি বেশি বাচ্চা পয়দা কর, কারণ কেয়ামতের দিনে আমি অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের আধিক্যের কারণে গৌরব বোধ করবো।"

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً. -(الروم : ٢١)

"তাঁর দেয়া নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তার কাছে গিয়ে তোমরা শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে মায়া-মমতা ও মুহাব্বত পয়দা করে দিয়েছেন।" রুম-২১)

ধন-সম্পদ এসব নিজে কোন লক্ষ্যবস্তু নয়, বরং দলীয় জীবন যাপন করার ও দল গঠন করার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার এটা একটা উপায়।

وَ لَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. (النساء :٥)

"আল্লাহ্পাক যে মাল সম্পদ তোমাদের জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য দান করেছেন তা তোমরা অজ্ঞ মূর্খ লোকদের হাতে সোপর্দ করো না।" (নিসা-৫)

মানুষকে যুদ্ধ করার শক্তি দান করা হয়েছে যাতে করে তারা পৃথিবী থেকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করে।

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

-(التوبة :٧٣)

"হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াও এবং তাদের সাথে ব্যবহার করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন কর।" (তাওবা-৭৩)

এবং এসব কাজ এজন্য কর যাতে করে যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হেফাজত করা যায়।

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ . -(البقرة : ١٧٩)

"আর তোমাদের জন্য রয়েছে শাস্তির মধ্যে জিন্দেগী, হে বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ।" (বাকারা-১৭৯)

وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. -(البقرة : ١٩٠

"আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (বাকারা-১৯০)

এভাবে, ইসলাম মানুষের গোটা অস্তিত্বকে সামনে রেখে সকল দিক থেকে তার জীবনের কর্মগুলোকে উৎসাহিত করে যাতে করে তার যোগ্যতাসমূহ কোন একটি দিকে; শুধুমাত্র খাদ্য বা সঙ্গিনী বা ধন-সম্পদ আহরণের ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায়। এবং ঐ একটি দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে সে সীমা অতিক্রম করে না বসে। বরং ইসলাম মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মতৎপরতাকে জ্ঞান-সাধনা, কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, যুদ্ধ-জিহাদ, নির্মাণ ও উন্নতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, সামাজিক কাজ-কর্মের দেখাশুনা এবং ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে নিয়োগ করে তার যোগ্যতাকে সব দিকে থেকে কাজে লাগিয়ে দেয়, যাতে করে বিশেষ কোন একটি দিকে তার যোগ্যতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়ে সেটা ক্ষতিকর না হয়ে যায়।

মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও সর্বোচ্চ কাজসমূহ

এভাবে ইসলাম মানুষের মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে যাতে করে তর শক্তির সবটুকু শুধুমাত্র বস্তুগত জিনিসের স্বাদ পাওয়ার প্রচেষ্টায় ব্যয়িত না হয়ে যায়, বরং ইসলাম মানুষের মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের কাজে এগিয়ে দেয় এবং মনের প্রতি কোণায় কোণায় ঈমানী আকীদার মূল প্রাণশক্তিকে কাজে লাগায়। যার ফলে তার গোটা জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়ে যায়, তার জীবন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশস্ততা ও সামগ্রিকতার ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। এভাবে মানুষ, প্রকৃতপক্ষে, মহান ত্যাগ কুরবানীর দৃষ্টান্তগুলোকে (Ideals) স্থাপন করতে থাকে এবং তার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টায় লেগে যেতে পারে। পুরুষ ও নারী উভয়ের এটা সাধারণ উদ্দেশ্য, কারণ তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এবং বাইরের বাস্তব জীবনে এই আকীদার বিস্তারকল্পে এবং বাস্তবে সেই অনুসারে কাজ করতে গিয়ে উভয়ের ভূমিকা সমানভাবে রাখতে হয়।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّى لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِي سَبِيْلِى وَ قَاتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ. وَ لاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. -(ال عمران : ٢١٥)

"অতঃপর, জওয়াবে তাদের রব তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের কারো কাজকে বর্বাদ করে দেব না, পুরুষ বা নারী যে-ই হও না কেন, তোমরা একে অপরের একই শ্রেণীভুক্ত, তারপর যারা হিজরত করেছে, তাদের বাড়িঘর থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আমার পথে থাকার কারণে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের থেকে তাদের খারাবীগুলোকে মুছে দেব; আর অবশ্যই তাদেরকে বাগবাগিচায় ভরা এমন বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়ে দেব যার নীচু দিয়ে (বা পাশ দিয়ে) ছোট ছোট নদী প্রবাহিত করাব, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটা তাদের প্রতিদান এবং উত্তম প্রতিদান ত আল্লাহ্‌র নিকটেই আছে। (আলে ইমরান- ২১০)

ইসলাম মানুষের শারীরিক যোগ্যতাসমূহকে একেবারে দাবিয়ে (Repressed= করে) দিয়ে মনের গভীরে এমনভাবে গোপন (Repressed) করে দেয় না যে তা

আর বের হতে না পারে, বা একে একেবারে ধ্বংস করে দেয় না বরং তার বাস্তব কর্ম-প্রচেষ্টার অতিরিক্ত যোগ্যতাকে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর দিকে ফিরিয়ে দেয়, যথা শরীর চর্চা, ঘোড় সওয়ারী ইত্যাদি। এর দ্বারা একদিকে যেমন শরীর মজবুত হয় অন্যদিকে জিহাদের প্রস্তুতিও গ্রহণ করা হয়ে যায়। এইভাবে ইসলাম মানুষকে মানসিক শক্তি ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করে তার জীবনের পরম কাম্য জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। অপর দিকে মহিলাদেরকে ঘর-গৃহস্থালীর কাজে উৎসাহিত করে, যেহেতু এটা মানুষের জীবনের অপরিহার্য এবং স্বতন্ত্র একটি বিভাগ এবং এর জন্য মহিলাদেরকে রীতিমত চেষ্টা সাধনা করতে হয়। পারিবারিক জীবনের এই বিভাগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধ জন্ম নেয়, নারীসুলভ কমনীয়তা পয়দা হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মাতৃত্বের অনুভূতি তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। এই মহান দায়িত্ব পালন করার পর তাদের শরীরের অবশিষ্ট যোগ্যতা মানুষের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও পবিত্র কাজে ব্যয়িত হয়।

সব থেকে জরুরী কথা হচ্ছে ইসলাম যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে তার মধ্যে মানুষের সহজাত ঝোঁক প্রবণতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎসাহিত করা হয়নি। আর এ কারণেই ইসলামে সব ধরনের অপচয় নিষিদ্ধ।

وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ. -(الانعام : ١٤١)

"আর সীমালঙ্ঘন (অপচয়) করো না, নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" (আনয়াম-১৪১)

খানা-পিনার ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে অপচয় (সীমালঙ্ঘন) করতে নিষেধ করে।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا. -(الاعراف : ٣١)

"আর খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।" (আরাফ-৩১)

অর্থাৎ খানা-পিনার যে সীমার মধ্যে থাকলে তোমাদের উপকার হয় তার মধ্যেই থাক, সীমালঙ্ঘন করলে তোমাদের কষ্ট এবং ক্ষতিই হবে।

বিলাস দ্রব্য, সাজসজ্জা ও বিভিন্ন প্রকার মনের খোরাক গ্রহণ করতেও ইসলাম মানুষকে সীমার বাইরে যেতে মানা করে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -(المؤمنون : ٣٣)

"ওরা তো সেই মানুষ যারা (রসূলকে ও আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ব্যবস্থাকে) মানতে অস্বীকার করল এবং পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হওয়াকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করল; ওদেরকে আমি মহান আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে সচ্ছলতা দিয়েছি বলেই তার অসদ্ব্যবহার তারা এভাবে করছে।" (মু'মেন-৩৩)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا. -(الفرقان : ١٨)

"এবং সেই দিনেই তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা) তাদেরকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের দাসত্ব তারা করছে সেই সব মাবুদদেরকে একত্রিত করে বলবেন, 'তোমরা কি আমার ঐ বান্দাহদেরকে ভুল পথে চালিয়েছিলে, না তারা নিজেরা ভুল পথ গ্রহণ করেছিল? ওরা বলবে, মহাপবিত্র আপনি হে পরওয়ারদিগার, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বন্ধু বা অভিভাবক রূপ গ্রহণ করার কোন সাধ্যই আমাদের ছিল না, কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়েছিলেন, যার মুহাব্বতে শেষ পর্যন্ত তারা আপনার কথাই ভুলে গিয়েছিল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।" (ফুরকান-১৮)

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ. -(سباء : ٢٤)

"এমন কখনো হয়নি যে আমি যখনই কোন এলাকায় কোন রাসূলকে পাঠিয়েছি তখনই (সে এলাকার) সচ্ছল লোকগণ বলে না উঠেছেঃ 'তোমরা যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা আমরা মানি না।" (সাবা-২৪)

মালিকানাধীন সম্পদ যার যা আছে তার যথেচ্ছা ব্যবহার (অপচয়) করতে ইসলাম নিষেধ করে এবং ধন-সম্পদ লাভ করার জন্য তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন দান করেছেন। যারা সেই সীমার মধ্যে থেকে রোজগার করবে, তাদের সেই রোজগারের পয়সা হালাল বলে গণ্য হবে, এর বাইরে গিয়ে যে উপার্জন করা হবে সে উপার্জিত ধন সম্পদ হালাল হবে না। এই কারণেই চুরি করে আনা বা জবরদস্তি কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা মাল হালাল হবে না। কারো সম্পদ বিনা অনুমতিতে ভোগ করা নিষেধ আর কোন ব্যক্তির হক নষ্ট করাও নিষেধ। সুদ এবং পুঁজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল মজুদকরণকে ইসলাম নিষেধ করেছে। কারণ প্রতি যুগে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ার পেছনে এটাই কারণ বলে বুঝা গিয়েছে।

ধন-সম্পদ উপার্জনের উপর বিধি-নিষেধ জারী করার পর তা ব্যয় করাকেও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সম্পদকে হালাল পবিত্র বানানোর জন্য যাকাত ঐচ্ছিক দান খয়রাত এর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এ সমস্ত ব্যবস্থা এ জন্য গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে সমাজে সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়ে গিয়ে তাদের যথেচ্ছা ব্যবহারের সুযোগ না আসে এবং যাতে মানুষের মধ্যে কৃপণতার মনোভাব সৃষ্টি না হয়।

ইসলাম জায়েয হত্যার মধ্যেও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا . -(الاسراء : ٣٣)

"আর যে ব্যক্তিকে মজলুম অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে, তার অভিভাবককে প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছি; সুতরাং, বদলা নিতে গিয়ে উক্ত ওলী (অভিভাবক) যেন বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয়ই তাকে (নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে) সাহায্য করা হবে।" (আসরা-৩৩৩)

যৌন ব্যাপারেও ইসলাম সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে। এই কারণেই ইসলামী সমাজে যৌন অনুভূতিকে উস্কানি দেয়ার মত বিভিন্ন কাজকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মহিলাদের সাজগোজ করে চলা-ফেরা এবং যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন; নাচ-গান, সঙ্গীতচর্চা, যৌন আবেগ সৃষ্টিকারী সাহিত্য সাংস্কৃতিক কার্যাদি এবং লজ্জাজনক অন্যায় কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইসলাম এমন এক সমাজ ব্যবস্থা রচনা করে, যার মধ্যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি-শরীর পরস্পর যোগাযোগ রেখে পুরোপুরি কাজ করতে পারে এবং এভাবে পাক-পবিত্র সুন্দর এক কল্যাণকর সমাজ গড়ে উঠার সুযোগ পয়দা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

মানব অস্তিত্বের সমান্তরাল রাস্তাসমূহ

পেছনের পাতাগুলোতে আত্মা, বিবেক-বুদ্ধি এবং শরীরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য ইসলামের অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক-বিভাগ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম মানুষকে যে চলার পথ দেখিয়েছে এবং আত্মা বুদ্ধি ও শরীরের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম মানুষকে যে পথ বাতলিয়েছে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার সাথে সাথে মানুষের সকল প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসলামী বিধান বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে মানুষের মধ্যকার আর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আত্মা (রূহ্) , বিবেক-বুদ্ধি শরীর তো মানবমণ্ডলীর কিছু এমন বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক বৈশিষ্ট্য যার পরিমণ্ডলকে কোন সীমার মধ্যে মাপা খুবই দুরূহ ব্যাপার। গোটা পৃথিবীর ব্যাপকতা, অতলান্ত সাগরের গভীরতা; এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিরাজ করে। কিন্তু এগুলো ছাড়াও মানব অস্তিত্বের মধ্যে আরও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য (Characteristics) আছে যেগুলোকে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত মোটা তারের পাশাপাশি অবস্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারগুলোর সাথে তুলনা করা যায়। ইসলাম একই সাথে মানবরূপ বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার তুলে পূর্ণ মানবতার ভারসাম্যপূর্ণ এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ের পারস্পরিক যোগসূত্রের মাধ্যমে এক অপরূপ সুর-লহরী সৃষ্টি কল্পে এই সুন্দর সূক্ষ্ম তারগুলো মানুষের অস্তিত্বরূপ বাদ্যযন্ত্রে সুসামঞ্জস্যভাবে বাঁধা থাকলে বিভিন্ন সময়ে এর থেকে বিভিন্ন সুর বেরিয়ে আসে। ভয়, আশা, প্রেম ও ঘৃণা, ব্যক্তিগত চাহিদা, সামষ্টিক অনুভূতি, নৈরাশ্যবাদিতা, আশাবাদিতা, কর্তব্যানুভূতি, বাড়তি কাজ করে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, এসব গুণরাজি মানুষের মধ্যে এমনভাবে মুখোমুখি এবং পাশাপাশি সুসামঞ্জস্যভাবে বিরাজ করে যে, মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য এগুলো একান্ত জরুরী বলে বুঝা যায় এবং সেগুলো একে অপরকে এক মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। এই মুখোমুখি সমান্তরাল তন্ত্রীগুলোর পাশাপাশি এক দিগন্তব্যাপী প্রশস্ততা বিরাজ করে যার মধ্যে রঙ--বেরঙ-এর সৌন্দর্য ফুটে উঠে এবং এরই মাধুরীতে মানব জীবনের পথ-প্রান্তর প্রশস্ততর হয়ে যায়। এ সব গুণাবলীর কারণে সৃষ্টি জগতের সকল সৃষ্টি থেকে তার পার্থক্য এবং স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। আর এভাবে মাটির তৈরি এই তুচ্ছ পুতুল মহান আত্মার স্পর্শে এসে সব কিছুকে অক্ষমকারী এক অদ্ভুত শক্তির আঁধার হয়ে যায়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ইসলাম মানব প্রকৃতির যাবতীয় দাবি মেটানোর সাথে সাথে তার হৃদয় যন্ত্রের সকল তারগুলোকে সুসামঞ্জস্যভাবে এবং একই সাথে বাজায়। যার কারণে মানুষের মধ্যে পরম ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য আসে এবং তার জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ একই সাথে কাজ করতে থাকে।

নীচের অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ আমরা আলোচনা করব যে, কিভাবে ইসলাম মানুষের পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগায় এবং কিভাবে তাদেরকে জীবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অষ্টম অধ্যায়

ভয় ও আশা

মানব প্রকৃতির মধ্যে ভয় ও আশা এই পরস্পর বিরোধী দুটি বৈশিষ্ট্য একই সাথে বিরাজ করছে। এ কারণেই দেখা যায় যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে, কখনো ভয় পেয়ে যায় এবং কখনো সে আশান্বিত হয়। মানুষের জন্ম মুহূর্ত থেকেই এ দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থা পাশাপাশি জন্ম নেয়। একই সময়ে সে অন্ধকারকে ভয় করে, একাকীত্বকে ভয় করে, পড়ে যাওয়াকে, আঘাত পাওয়াকে ভয় করে; তার অপছন্দনীয় দৃশ্যাবলী এবং তার অপ্রিয় ব্যক্তিগণকে সে ভয় করে; এবং সাথে সাথে নিরাপত্তা ও আরাম পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়। তাপ পেতে চায়, মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দুধ খেতে চায়, তারপর মায়ের কোল বাপের বাহুবন্ধন এবং যাদের কাছে থেকে সে আরাম পায়, তাদের কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট করে।

ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে ভয় ও আশা আকাঙ্ক্ষার এ অবস্থা দু'টির ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত হয়, তার মধ্যে নূতনত্ব আসে এবং এই নূতনত্ব ও প্রশস্ততার কারণে তার জীবনের আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য ঝোঁক প্রবণতা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী স্থির হয়ে যায়।

শৈশবের চাঞ্চল্যপূর্ণ জীবন অতিক্রম করার পর মানুষ মৃত্যুকে ভয় করতে শুরু করে, অভাব-অভিযোগ, অসহায়ত্ব, অকৃতকার্যতাকে ভয় করতে থাকে, নিন্দনীয় ও অপমানিত হওয়াকে ভয় করে, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট পাওয়াকে ভয় করে এবং আরো জানা-অজানা জিনিসকে সে ভয় করতে থাকে।

যত দিন যায় ততই মানুষ ভয়ংকর জিনিসগুলোকে আরো বেশি ভয় করতে থাকে এবং তার ভয়ের এই অবস্থা আরও গভীর ও প্রশস্ত হয়।

এর সাথে মানুষের একটি দিক রয়েছে। তা হলো 'আশা' ও ভয়ের পাশাপাশি আশাও জাগ্রত হতে থাকে। মানুষ নিরাপত্তা, আরাম ও অস্থিরতা কাটিয়ে স্থিরতা লাভ করার জন্যও ঠিক তেমনি করে আকাঙ্ক্ষী হয়, যেমন করে ছোট বেলায় সে আকাঙ্খী ছিল। তবে যৌবনে তার আকাঙ্ক্ষা আরও একটু উন্নত মানের হয়। মানুষ এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে শক্তি লাভ করতে চায়। মান-সম্মান ও নানা প্রকার ভোগ-সামগ্রী পাওয়ার চাহিদাও রাখে এবং এমন সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা বাসনার পরিপূরণ চায় যা কোন সময়েই শেষ হয়ে যায় না। তার এই অফুরন্ত চাহিদার কোন একটি পূরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

ভয় ও আশার মধ্যে পারস্পরিক এই সম্পর্ক এবং অন্তরের মধ্যে বিরাজমান এই অবস্থাগুলো মানুষের জীবনের দিক নির্ণয় করে দেয়, তার উদ্দেশ্য ও কাজ

নির্দ্ধারণ করে এবং তার চিন্তা ও কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের ভয় ও আশার মধ্যকার অবস্থাগুলোর ব্যাপকতা এবং বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে সে নিজের জীবনের চলার পথ ঠিক করে নেয়। এ কারণে মৃত্যুকে যে ব্যক্তি ভয় করে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থাকে। আর্থিক সংকটকে যে ভয় করে সে ধন-দৌলত লাভ করার জন্য লেগে থাকে। শক্তি ক্ষমতাবানদেরকে যে ভয় করে সে জীবনের সংঘাতপূর্ণ অবস্থা থেকে দূরে থাকে। কষ্ট, পরাজয় ও অকৃতকার্যকে যে ভয় করে সে জীবনের যে কোন সংঘর্ষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে এবং জীবন-যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে মুকাবেলা করা থেকে এবং অগ্রসর হয়ে সংগ্রাম করা থেকে পরহেজ করে। আর যার মধ্যে উক্ত ভীতিজনক কোন প্রতিবন্ধক নেই সে সর্বপ্রকার চাপ থেকে মুক্ত থাকে এবং জীবন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিজয়ী মনোভাব নিয়ে ও শক্তিমত্ত হয়ে অংশ নেয়।

যে ব্যক্তি মানইজ্জত, ক্ষমতা ও ধন-দৌলত চাইবে তাকে তা লাভ করার জন্য এবং নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জীবন লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করতে হবে, আর যার মধ্যে এসকল আশা আকাঙ্ক্ষা প্রবল নয় সে এ সবের চাপ থেকে মুক্ত থাকবে এবং নিজ প্রবৃত্তির উপর জয়ী হয় এবং একমাত্র সেই ব্যক্তিই নিজ প্রবৃত্তি তাড়না থেকে মুক্ত থেকে নিজকে হীনতা থেকে বাঁচাতে পারে।

যাই হোক, ভয় ও আকাঙ্ক্ষার এ দু'টি অবস্থা মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সদা জাগরুক আছে এবং সর্বদাই মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একটি সফল ও প্রভাবপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু এ দুটি জিনিসকে সামনে রেখেই পথনির্দেশ করে না, বরং এ বিষয়েও খেয়াল রাখে যে, এ অবস্থাগুলোর মধ্যে কোন প্রত্যাহার (Diversion) বা বিশৃঙ্খলা যেন সৃষ্টি না হয়। এ দু'টি অবস্থা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই যেন মানব জীবনকে শান্তি-সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ যখন বাদ্যযন্ত্র হাতে নেয় তখন প্রথমেই তার ঢিলা তারগুলো টাইট দেয়, তারপর সমস্ত তারগুলো ঠিকঠাকমত আছে কি না তা দেখে যখন বুঝে যে, সবগুলো নিজের সঠিক অবস্থায় (Position-এ) আছে তখন তাতে মন-মাতানো সুরের ঝংকার তুলে।

ইসলামও মানুষের মনযন্ত্রের পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর তার ঢিলা তারগুলো বেঁধে নিয়ে বাকি তারগুলোকে সার্বিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার পর তাতে ঝংকার তুলে। এইভাবেই ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অবস্থাগুলোকে সঠিকভাবে সংযোজন করে প্রবৃত্তির সকল অলীক ভয়-ভীতি অযৌক্তিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে খতম করে দেয় এবং মানব প্রকৃতিকে সঠিক অবস্থানে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেয় যেন সে সেই জিনিসকে শুধু ভয় করে যাকে ভয় করা উচিত এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে আমল দেয় যে আশা আকাঙ্ক্ষা করা তার জন্য যুক্তিসংগত।

মৃত্যুভয় ও ইসলাম

ইসলাম সর্বপ্রকার মানুষের মাথা থেকে ঐ সব ভয়ভীতির বোঝা নামিয়ে দিতে চায় যা মানুষের বাহুকে দুর্বল ও আহত করে রাখে, অথচ আসলে তাতে ভয়ের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। স্বাভাবিকভাবে মানুষ সে ভয় ভীতিকে এড়াতেও পারে না বা তা থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারে না, বা তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না, যা অমোঘ তা আসবেই। যাকে আমল দিলেও তা দূর হয়ে যাবে না-সেই মৃত্যুভয় (Thanato phobia) মানুষের মন থেকে ইসলাম মুছে দেয়। অবস্থা যখন এই যে ইচ্ছা করলেই মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না এবং তা নির্দিষ্ট সময়েই আসবে, তার আগেও নয় পিছেও নয়, অবস্থা যখন এই তখন তাকে ভয় করে নিজের মন-মগজ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দুর্বল করার মাধ্যমে তার গোটা অস্তিত্বকে দুর্বল ও অক্ষম করে রাখা ছাড়া আর কিইবা ফায়দা হতে পারে। মৃত্যু সম্পর্কে ইসলাম এই ধারণাই স্পষ্টভাবে দিয়েছে যে, তা নিশ্চিতভাবেই আসবে এবং তা সুনির্দিষ্ট সময়েই আসবে, তাতে কারো চাওয়া না চাওয়ায় কোন পরিবর্তন আসতে পারে না একথা বারবার এবং বিভিন্ন ভাষা বর্ণনাভঙ্গীতে বলে মানুষকে এর বিভীষিকা থেকে বাঁচানো হয়েছে, যেহেতু মৃত্যুর আশংকা তো আর মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না।

إِنَّا نَحْنُ نُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيْرُ. (ق : ٤٣)

"আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) মৃত্যু দান করি আর আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে (সবাইকে)"। (ক্বাফ-৪৩)

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا . (المنافقون :-١١)

"মানুষকে প্রদত্ত কাজের সময় যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তায়ালা পুনরায় আর কাউকে সময় দেবেন না।" (আল মুনাফেকুন-১১)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ . (ال عمرا : ١٨٥)

"শেষ পর্যন্ত সকলকেই মরতে হবে"। (আলে ইমরান-১৮৫)

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ .

(النساء : ٧٨)–

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবেই, যদি তোমরা মজবুত কোন কেল্লার মধ্যেও থাকো সেখানেই তোমাদেরকে মৃত্যু ছাড়বে না।" (নিসা-৭৮)

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. (آل عمران : ١٥٤)

"(হে রাসূল) ওদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা নিজ নিজ বাড়িতেও থাকতে, তাহলে সেখান থেকেও অবশ্যই সেই লোকেরা বেরিয়ে এসে ঐ স্থানে পৌঁছে যেত যেখানে নিহত হওয়া তাদের ভাগ্যে লেখা রয়েছে।" (আলে ইমরান-১৫৪)

আর্থিক সংকটের ভয়

মোটকথা, ইসলাম মানুষের মন থেকে মৃত্যু সম্পর্কে অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন আশংকা বিদূরিত করেছে যাতে করে এই নিষ্প্রয়োজন ভয়ের মধ্যে থেকে মানুষের যোগ্যতার অপচয় না ঘটে অথবা বেকার না যায়। এভাবে তার জীবন ধারণ সামগ্রী (রিজিক) না পাওয়ার আশংকাকেও ইসলাম এ কথা বলে দূর করেছে যে,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ . -(يونس : ٣١)

"হে রাসূল! ওদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দিচ্ছে, এই শ্রবণক্তি ও দর্শনশক্তিই বা কার (দেয়া)? কে মুর্দা থেকে জিন্দাকে বের করে আর কেইবা জিন্দা থেকে মুর্দাকে আনে? কেইবা এই জগতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে? তখন ওরা অবশ্যই জওয়াব দিতে গিয়ে বলবেঃ আল্লাহ্" (ইউনুস-৩১)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ. -(سبا : ٢٤)

"হে নবী বল! কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে রিজিক দেয়? বল আল্লাহ।" (সাবা, -২৪)

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ . -(فاطر :٣)

আল্লাহ ব্যতীত আরো কোন সত্তা আছে নাকি যে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দেয়" (ফাতের-৩)

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ. (الملك : ٢١)

"আল্লাহ্ তায়ালা যদি রিজিক দান করা বন্ধ করে দেন তাহলে কে আছে এমন যে তোমাদেরকে রিজিক দেবে"(মুলক-২১)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ـ (الرعد : ٢٦)

"আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে প্রচুর পরিমাণে রিজিক দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তার জন্য রিজিক সংকীর্ণ করে দেন" (রা'দ-২৬)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ـ (الروم : ٣٧)

"ওরা কি দেখছে না যে, আল্লাহ তায়ালাই যার জন্য ইচ্ছা তার জন্য রিযিক-এর দরজা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য খুশী তার জন্য তা সংকীর্ণ করে দেন" (রুম-৩৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ رِزْقًا ـ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهُ ـ (العنكبوت :١٧)

"যাদের ইবাদত (পূজা অর্চনা এবং আনুগত্য) তোমরা কর তারা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রিজিক-এর মালিক নয়। অতএব আল্লাহর নিকটেই রিজিক চাও, তোমরা তাঁরই আনুগত্য কর এবং তাঁরই শোকর কর।" আনকাবুত-১৭)

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ـ (الزاريات : ٢٢)

"আকাশেই রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং ঐ সব নেয়ামত যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে" (যারিয়াত-২২)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ ـ (العنكبوت: ٦)

"কত জানোয়ার আছে যারা তাদের রিযিক নিয়ে চলে না, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে রিযিক দেন আর তোমাদেরকেও রিযিক দেন।" (আনকাবুত-৬)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ ـ (الحجر: ٢٠)

"আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যেখানে (পৃথিবীতে) জীবিকার বিভিন্ন উপায় উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি এবং অন্যান্যদের জন্যও দিয়েছে যাদেরকে তোমরা রিজিক দানকারী নও" (হিজর-২০)

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ـ (الزاريات : ٥٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা, তিনিই রিযিকদানকারী, তিনি মহাশক্তিমান এবং জবরদস্তি করার শক্তি রাখেন" (যারিয়াহ-৫৮)

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়

এইভাবে ইসলাম মানুষের এ ভয় দূর করেছে, যে কেউ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে অথবা পৃথিবীর কোন শক্তি এবং ক্ষমতাই তাকে কষ্ট দেবে।

قُلْ لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ. -(الاعراف :١٨٨)

"হে নবী! ওদেরকে বলে দাও যে, আমি আমার নিজের জন্য কোন লাভ বা ক্ষতি করার ইখতিয়ার রাখি না, আল্লাহ্ তায়ালা যা চান তাই হয়।' আরাফ-১৮৮)

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

-(التوبة : ٥١)

"ওদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন তা ছাড় অন্য কোন বিপদ মুসীবাত আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তিনি আমাদের বন্ধু অভিভাবক; অতএব মুমিনদের (তাঁর উপরেই) ভরসা করা দরকার।" (তওবা-৫১)

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ. -(النساء : ٧٨)

"তাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে ওরা বলেঃ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর যদি ওদেরকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন তোমাকে দোষ দিতে গিয়ে ওরা বলেঃ এটা তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও (ভাল মন্দ) সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।" (নিসা-৭৮)

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَيَمْلِكُ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا. -(المائدة: ٧٦)

"ওদেরকে বলে দাও, হে নবী! তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছু জিনিসের পূজা অর্চনা করছো যা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না।" (মায়েদা-৭৬)

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ «ط» مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ. -(الانعام : ٤٦)

"ওদেরকে বল, হে নবী! তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরের উপর সীল লাগিয়ে দেন তো সে অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কোন্ উপাস্য তোমাদের

এমন আছে যে এগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে।” (আল আনয়াম-৪৬)

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ. -(الانعام : ٦٣ - ٦٤)

“হে নবী! ওদের জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর স্থলভাগ ও সমুদ্রের মধ্যকার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদজনক অবস্থা থেকে কে তোমাদেরকে বাঁচাবে? তখন কার কাছে তোমরা কাকুতি মিনতি কর, চুপে চুপে ডেকে বল যে, তিনি যদি আমাদেরকে এ সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নেন তাহলে অবশ্যই আমরা (তাঁর কাছেই) কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। বল, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ঐ সব বিপদ থেকে তোমাদেরকে বাঁচাবেন এবং সমস্ত তকলীফ দূর করে দেবেন। এ কথা স্পষ্টভাবে জানা বুঝার পরেও তোমরা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে অন্যদেরকে অংশীদার বানিয়ে থাকো। (আল আনয়াম-৬৩-৬৪)

أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِ اٰلِهَةً إِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَ لَا يُنْقِذُوْنِ. -(يس : ٢٣)

“তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে আমি অন্য কাউকে কি উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করব? মহাদয়াময় পরওয়ারদিগার যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের (ঐ সকল উপাস্যদের) সুপারিশ আমার কিছুমাত্র কাজে লাগবে না আর তারা আমাকে বাঁচাতেও পারবে না।” (ইয়াছিন-২৩)

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. -(فاطر : ٢)

“আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দরজা খুলে দেন না কেন তাকে কেউই বন্ধ করতে পারে না, আর যেটা আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করে দেন সেটা তিনি বাদে আর কেউ খুলতে পারে না, আর তিনি মহাশক্তিমান বিজ্ঞানময়।” (ফাতের-২)

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُ كُمْ مِّنْ بَعْدِهِ. -(ال عمران : ١٦٠)

"আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের

উপর অন্য কেউ বিজয়ী হওয়ার নেই, আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন সে অবস্থায় তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?" (আলে ইমরান-১৬০)

অদেখা পরিণতির ভয়

ইসলাম মানুষকে এ সকল ভয়ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছে যা বর্তমান জানা কার্যকলাপের পরিণতিতে সাধারণতঃ সংঘটিত হয়।

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. -(البقرة : ٢١٦)

"আর হয়ত তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ কর। কিন্তু (আল্লাহর জানামতে) আসলে সেটা তোমাদের জন্য ভাল।" (বাকারা-২১৬)

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا. -(لقمان : ٣٤)

"কোন ব্যক্তি জানে না কাল সে কি উপার্জন করবে।" (লুকমান-৩৪)

لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ اَمْرًا. -(الطلاق : ١)

"তুমি জান না হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা এর পরে কোন একটি উপায় বের করে দেবেন।" (তালাক-১)

এইভাবে, ইসলাম এক এক করে মানুষের মন থেকে অনর্থক ও বেফায়দা ভয়-ভীতিকে দূরীভূত করে এবং এ ভয়ের কারণে তার মনের ভারাক্রান্ত অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করে, যার ফলে মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাক্বদীরের উপর 'ঈমান' তাকে পূর্ণ নিশ্চিন্ত করে তার যোগ্যতাকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে দেয়।

প্রকৃত ভয়

এর পর ইসলাম মানুষের মনের মধ্যে প্রকৃত ও সঠিক ভয় জাগায়। তাকে এ কথা অবগত করায় যে, আসলে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালারই ভয় থাকা দারকার ও তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়েই তার জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম করা প্রয়োজন। যেহেতু পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই নিবদ্ধ। তিনিই সকল লাভ-লোকসানের মালিক, তিনিই সব কিছু দান করেন আর তিনিই যা চান ত তুলে নেন। সুতরাং মানুষের শুধু আল্লাহকেই ভয় করা উচিত এবং তিনি যা ভয় দেখান সেগুলোকে ভয় করে চলা দরকার।

اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. -(آل عمران : ١٧٥)

"এ তো, সেই মরদুদ শয়তান যে তার শিষ্য-শাগরিদ বা বন্ধু-বান্ধবকে অযথা ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর।" (আলে ইমরান-১৭৫)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ. -(الزمر : ٣٢)

"(হে নবী!) আল্লাহ কি মানুষের জন্য যথেষ্ট নন। তাকে ছাড়া ওরা তোমাকে অপর জিনিসের ভয় দেখায়, অথচ কে ঐ ব্যক্তিকে পথ দেখাতে পারে যাকে আল্লাহ তায়ালা গুমরাহ করেন।" (যুমার-২৬)

قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. -(الانعام : ١٥)

"বল (হে নবী)! যদি আমি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি তাহলে অবশ্যই এক বড় দিনের শাস্তির ভয় আমি করি।" (আনয়াম-১৫)

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ. -(المائدة : ٩٤)

"যাতে করে আল্লাহ্ তায়ালা জানতে পারেন যে কোন ব্যক্তি না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে।" (মায়েদা-৯৪)

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ. -(الانعام : ٥١)

"যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকটে একত্রিত করা হবে, সেই সব লোকদের তাঁরই ভয় দেখাও।" (আনআম-৫১)

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ. -(النور : ٣٧)

"তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন হৃদপিণ্ড উল্টে যাবে এবং চোখগুলো পাথরের মত শক্ত ও স্থির হয়ে যাবে।" (নূর-৩৭)

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا. -(الدهر: ٧)

"ওরা ওদের মান্নতগুলো পূরণ করে এবং সেই দিনের বিভীষিকাকে ভয় করে যার বিপদ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হবে।" (দাহার-৭)

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا. -(الدهر : ١٠)

"আমরা আমাদের রবের থেকে আসা সেই দিনকে ভয় করি যেদিন চেহারাগুলো (ভয়ংকর বিপদের কারণে) বিগড়ে যাবে, ভীষণ ভয়ের ছাপ তাদের চেহারায় লেগে থাকবে।" (দাহার-১০)

এই মহাভয়ংকর দিন যার মধ্যে সব দিক থেকে শুধু বিপজ্জনক দৃশ্যই চোখে পড়তে থাকবে সে দিনের ভয়েই শুধু মুমিনগণ বিচলিত হয় এবং কুরআনের সতর্কীকরণের এই প্রধান অধ্যায়েই সেই ভয়ংকর দৃশ্যাবলীর উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত বহু আয়াতের সমাবেশ ঘটানো হলেও আমরা শুধু সেই সকল আয়াতগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি যা খুবই স্পষ্ট এবং যা সকল প্রকার অবস্থার জন্য প্রযোজ্য আযাবের দুঃসংবাদ দেয়। উপরন্তু ঐ সকল আয়াতগুলোও এখানে উদ্ধৃত করা হলো যে গুলো মধ্যে মানুষের বোধগম্য আযাব ছাড়াও আরও ভিন্ন ধরনের আযাবের কথার উল্লেখ আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ. -(النساء : ٥٦)

"যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে অবশ্যই আমি (সর্ব শক্তিমান আল্লাহ) খুব জলদীই এমন এক আগুনে ভরা দোযখে তাদেরকে প্রবেশ করাব যার মধ্যে তাদের শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অপর এক চামড়া এসে হাজির হবে যাতে করে শাস্তির স্বাদটা তারা বেশ ভালভাবেই উপভোগ করতে পারে।" (নিসা-৫৬)

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. -(البقرة : ٢٤)

"অতএব ঐ আগুনের ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" (বাকারা-২৪)

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ. اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ. طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ. -(الصافات:٦٢-٦٨)

"তোমরা বল, এই মেহমানদারীই ভাল না যাক্কুম গাছের (ফলের) পরিবেশনের মেহমানদারী ভাল? আমি (সর্ব শক্তিমান আল্লাহ)ঐ গাছটিকে জালিমদের জন্য একটি মূর্তিমান বিপদ হিসেবেই বানিয়েছি। ঐ গাছটি দোযখের একেবারে নীচুর অংশ থেকে বের হবে। তার অংকুরই এমন (ভয়ানক) হবে যেন সেটা শয়তানদের মাথা। ওরা এই গাছ থেকেই খাবে (এই গাছের ফল দিয়েই তাদের জঠরজ্বালা মেটাবে) এবং তাই

দিয়েই পেট ভরবে। এর পর তাদের পান করার জন্য ফুটন্ত গরম পানি দেয়া হবে। তারপর তারা আগুণে ভরা দোযখেই ফিরে আসবে।" (সফফাত- ৬২-৬৮)

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ. اِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ لاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَّ لاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ. لاَ يَاْكُلُهُ اِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ. -(الحاقه : ٣٠ - ٣٧)

"বলা হবে, "ওকে ধর এবং ওর গলায় (আগুনের) শিকল পরাও, তারপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ কর। এরপর তাকে সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বাঁধ, এ হতভাগা না মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান এনেছিল, না সে অভাবগ্রস্ত (মিসকীনদের) কে খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন উৎসাহ দিত। তএব আজকের দিনে এখানে তার কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু নেই এবং আহতদের ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ ও কষানী ছাড়া কোন খাবারও সেই যা অপরাধীরা ছাড়া আর কেউ খাবে না।" (হাক্কা ৩০-৩৭)

ভীতি প্রদর্শনের জন্য কুরআনে করীম আর একটি উপায় বের করেছে, তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশ্য আযাব এবং অভ্যন্তরীণ আযাব এ দুটি সম্পর্কে বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, তার মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাবের কথাই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

-(الحج : ١٩ - ٢٢)

"অতএব যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোষাক কেটে রাখা হয়েছে, তাদের মাথার উপরে ফুটন্ত গরম পানি ঢালা হবে, যার কারণে শুধু চামড়াই নয়, বরং পেটের মধ্যকার সব কিছু গলে যাবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য লোহার মুগুর রয়েছে। এই দুঃখজনক শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যতবারই তারা বেরুতে চাইবে ততবারই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে; জ্বলে পুড়ে ছারখার হওয়ার আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।" (হজ্জ-১৯-২২)

উপরের আয়াতগুলোতে অত্যন্ত ভয়ানক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাবের বর্ণনা দেয়া

হয়েছে এবং (মানসিক) দুঃখের উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, সেখানে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দু'ই হবে।

কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় শারীরিক ও মানসিক আযাব সমান সমানভাবে দেয়ার কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ. -(البقرة : ٨٥)

"এ ধরনের কাজ তোমাদের মধ্যকার যে সকল লোক করবে তাদের পরিণতি এ ছাড়া আর কিছুই হবে না যে দুনিয়ার বুকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হবে এবং ক্বিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সব থেকে কঠিন আযাবের দিকে।" (বাকারা-৮৫)

দুনিয়ার জীবনের হীনতা-দীনতা অপমান-গঞ্জনা এবং আখিরাতের জীবনের কঠিন আযাবের কথা বলে আল্লাহ তায়ালা আযাবের প্রথম ফিরিস্তি পেশ করেছেন। দুনিয়ার জীবনের এই লাঞ্ছনা ও অপমান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাঁর হুকুমেই আসে। যেহেতু তাঁর কুদরতী হাতের মধ্যেই মান-সম্ভ্রমহীনতা, দীনতা সব কিছু নিবদ্ধ। এমন অপমানের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে রয়েছে যা থেকে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর দেয়া এই বেইজ্জতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে ভয় করা দরকার।

কুরআন শরীফের কোন কোন জায়গায় অভ্যন্তরীণ বা মানসিক আযাবের কষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব থেকে বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ. -(الهمزة : ٦-٧)

"আল্লাহ তায়ালার প্রজ্জ্বলিত আগুন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।" (হুমাজা-৬-৭)

জী জনাব, শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব আগুন শরীরে লেগে শরীরকে পুড়িয়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং এই প্রজ্জ্বলিত আগুন হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে এবং এইভাবে অন্তরের অন্তর্নিহিত গোপন তথ্য সব প্রকাশ করে দেবে।

কুরআনে কারীমের কোন কোন জায়গায় শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বা মানসিক আযাবের কথা উল্লেখ করা আছে।

يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَّ الْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ . -.الانفطار: ١٩)

"এতো সেই দিনে যখন কারো জন্য কিছু উপকার করার ক্ষমতা কারো থাকবে

না। সেই কঠিন দিনে যাবতীয় বিষয়াদির ফায়সালা দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই থাকবে।" (ইনফিতর-১৯)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَانٌ يُّغْنِيْهِ. -(عبس : ٣٤-٢٧)

"সে দিন মানুষ নিজের ভাই, মা-বাপ, স্ত্রী, ছেলে সবার থেকে পালাতে থাকবে, সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এমন অবস্থা এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো কথা চিন্তা করার কোন চেতনাই থাকবে না।"

(আবাসা-৩৪-৩৭)

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ. -(الحج : ١-٢)

"প্রকৃতপক্ষে কেয়ামাতের ভূমিকম্প বড় (ভয়ানক) জিনিস। সে দিনের অবস্থা তুমি দেখতে পাবে, প্রত্যেক দুগ্ধদানকারিনী মা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর কথা ভুলে যাবে এবং গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর মানুষকে মাতাল অবস্থায় (টলতে) দেখবে। আসলে মদ খেয়ে সে মাতলামী করবে, এমন নয়। বরং আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন (হবে, যার কারণে তাদের এই অবস্থা হবে)।"(হজ্জ-১-২)

আযাবের এসকল বিভীষিকার বিবরণ সবই মনস্তাত্ত্বিক, এবং এগুলো মনের উপর এমন চাপের সৃষ্টি করে যে মন না গলে পারে না এবং এ কথা শুনে ভয়ে যে কোন ব্যক্তি অস্থির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতগুলোর দিকে খেয়াল করুন।

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ.

-(المعارج : ٤٣ - ٤٤)

"যে দিনে ওরা কবর থেকে দ্রুত গতিতে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে যেমন করে তারা পূঁজার বেদীর দিকে দৌড়িয়ে থাকে, সেদিন তাদের চোখ নীচের দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং সে চোখে হীনতার গ্লানি ও আত্মশ্লাঘার ছাপ লেগে থাকবে। ঐ দিনের ওয়াদাই তাদের নিকট করা হয়েছে।" (মায়ারেজ-৪৩-৪৪)

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ. (المرسلات : ٣٥ - ٣٧)

"এ হবে সেই দিন যেদিন তারা কোন কথা বলবে না এবং কোন কথা বলার অনুমতিও তারা পাবে না। যার ফলে তাদের কোন ওজর অজুহাত তারা পেশ করতে পারবে না। সেদিন (রাসূলকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।" (মুরসালাত ৩৫-৩৭)

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে অভ্যন্তরীণ ও মানসিকহীনতা অপমানকে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে মানসিক শাস্তির উল্লেখ এ ভাবে করা হয়েছে ঃ

"তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কথাও বলবেন না বা তাদেরকে পবিত্রও করবেন না।" (বাকারা-১৭৪)

وَلَا يُكَلِّمُهُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ.

(البقرة – ١٧٤)

উপরন্তু, উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে আযাবের বিভিন্ন স্তর ও ধরনের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কেননা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোগুলো একের থেকে অপরটি ভিন্ন প্রকারের। বেশির ভাগ লোকের অবস্থা এই যে, যা ধরা ছোয়া যায় এমন বস্তুগত জিনিসের ভিত্তিতেই তারা সাধারণতঃ চিন্তা-ভাবনা করে; অবশ্য, এ নিয়মের বাইরে এমন নেক লোক আছে যারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং তাদের কাছে অভ্যন্তরীণ ও মানসিক অবস্থারও বেশ মূল্য ও গুরুত্ব আছে এবং এসকল অবস্থা ও পর্যায়ের গভীর প্রভাব তাদের উপর পড়ে। উপরন্তু, এমনও দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানসিক পর্যায়ে থাকে এবং তার উপর কোন কোন অবস্থায় এবং কোন কোন পর্যায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। এ কারণে ইসলাম প্রতি পর্যায়ের ও প্রতি স্তরের ভয়কে প্রভাবপূর্ণ পদ্ধতিতে পেশ করেছে যাতে করে সকল মানুষ এবং তাদের যাবতীয় অবস্থাগুলোকে একত্রিত করা সম্ভব হয় এবং যে সীমা পর্যন্ত আল্লাহর ভয়-ভীতি মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত মজবুত পথে টিকিয়ে রাখতে পারে তা পয়দা হয়ে যায়।

ইসলাম মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করেছে

মানুষকে সত্য-সঠিক পথে কায়েম রাখার জন্য ইসলাম যেভাবে ভয়-ভীতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। একইভাবে ইসলাম মানুষের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগরিত করেছে, সাথে সাথে মিথ্যা ও মূল্যহীন এমন আশা আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে,

যার যথেষ্ট কদর আছে এবং যা পূরণ করার জন্য সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

মানব জীবনে অগণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে পূরণ করার চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কারণেই মানুষ দুনিয়ার অগণিত নেয়ামত হাসিল করার খাহেশ রাখে, ধন-দৌলত পেতে চায়, সন্তানাদির জন্য কামনা করে, পুত্র-সন্তানের জন্য লালায়িত হয়, মান-সম্ভ্রম ও শক্তি এবং শান-শওকত ও ক্ষমতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় এবং পৃথিবীর মানসিক ও শারীরিক তৃপ্তির সর্বপ্রকার দ্রব্য লাভ করার জন্য দিবারাত্র চিন্তা-ভাবনা করে।

পাক-পবিত্র ও তৃপ্তিদায়ক জিনিসগুলো হাসিল করতে ইসলাম নিষেধ করেনা, দুনিয়াত্যাগী হয়ে বৈরাগ্য গ্রহণের জন্যও ইসলাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না, বরং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইসলাম খাদ্য খাবারের মধ্যে পবিত্র ও পৃথিবীর উত্তম খাবারগুলো গ্রহণ করতে বলেছে, কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদাগুলো পূরণ করতে গিয়ে মানুষ আখিরাতকে ভুলে যাবে এবং পরকালের সঠিক ও স্থায়ী সুখ শান্তির কথার কোন মূল্য দেবে না এটা ইসলাম চাইতে পারেনা। একারণে কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে, বলা হয়েছেঃ পৃথিবীর পবিত্র জিনিসগুলো নিষিদ্ধ নয়, তবে আখিরাতের জিন্দেগীতে প্রাপ্য জিনিসগুলো যা চিরদিন স্থায়ী থাকবে তাই অধিকতর ভাল।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۔ خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ۔

—(الاعراف : ٣٢)

"হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, কে হারাম করেছে আল্লাহর দেয়া সৌন্দর্যকে যা তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য বের করেছেন এবং পবিত্র জীবন সামগ্রীগুলোকেইবা কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এগুলো তো দুনিয়ার ঐ সকল লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং কেয়ামাতের দিনে তো এগুলো একান্তভাবে তাদেরই প্রাপ্য হবে।" (আরাফ-৩২)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ۔ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ۔ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ، لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ۔

—(ال عمران : ١٤ - ١٥)

"মানুষের প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু, নারীর প্রেম, সন্তানাদির মুহাব্বাত, সোনা-চাদির স্তূপের লোভ, উন্নতমানের ঘোড়া ও গবাদি পশু এবং চাষাবাদের জমিজমা এসব কিছু তাদের নিকট বড়ই সুন্দর করে তোলা হয়েছে। এগুলো দুনিয়ার জীবনের সাময়িক এবং তুচ্ছ সম্পদ, অথচ প্রকৃত বিবেচনায় আল্লাহর নিকটেই রয়েছে উত্তম ঠিকানা। হে রাসূল বল! আমি কি তোমাদেরকে ঐগুলো থেকে ভাল জিনিস সম্পর্কে জানাব? যারা আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে জীবন জাপন করেছে তাঁদের জন্য রয়েছে ফুলে ফুলে সুশোভিত ঝর্ণাসমূহ যার নীচু ও পাশ দিয়ে ছোট ছোট নদী কুল কুল নাদে প্রবাহিত হতে থাকবে, আরো থাকবে পাক পবিত্র স্ত্রীগণ, সর্বোপরি থাকবে আল্লাহর সন্তোষ। আর আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাহদের সব কিছু দেখেছেন।" (আলে ইমরান-১৪-১৫)

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلاً. -(الكهف : ٤٦)

"এ সব ধন-দৌলত ও সন্তানাদিও শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য (যা ফুরিয়ে যাবে) একমাত্র বাকী থাকে (চিরদিন) নেক কাজগুলো যা তোমার পরওয়াদিগারের নিকট উত্তম প্রতিদানযোগ্য এবং পরিণাম হিসাবে।" (কাহাফ-৪৬)

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوٰةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَ لاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. (الكهف: ٢٨)

"তোমার অন্তরকে ঐ সকল লোকদের সাহচর্যে থেকে প্রশান্ত করো যারা সকাল সন্ধ্যা তাদের পরওয়াদিগারের নিকট দোয়া করে, তার সন্তুষ্টি তারা পেতে চায়, তাদের থেকে তোমার নজর কখনো ফিরিয়ে দিয়ো না, দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যই কি তোমার কাম্য?" (কাহাফ-২৮)

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَ الاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى - (النساء : ٧٧)

"বলে দাও ওদেরকে, দুনিয়ার জীবনের এসব মালমাত্তা এগুলো তো তুচ্ছ এবং অত্যন্ত সীমিত জিনিষ, আর আখিরাতই হচ্ছে তার জন্য উত্তম যে তাকওয়ার জীবনজাপন করে।"(নিসা-৭৭)

وَ اِنَّ الدَّارَ الاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ «ط» لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

(العنكبوت : ٦٤)-

"আর অবশ্যই আখিরাতের বাসস্থানই হচ্ছে আসল জিন্দেগী, হায় ওরা যদি জানতো!"(আনকাবুত-৬৪)

وَ اِنْ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

(الزخرف : ٣٥)-

"(ঐ সকল সুখ সম্পদের জিনিষ যা নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ে আছ) ও গুলো তো দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ জিনিষ, আসলে তোমার পরওয়ারদিগারের নিকটে রয়েছে আখেরাতের কল্যাণ এবং তা নির্ধারিত রয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য।"(যুখরোফ-৩৫)

ইসলাম মানুষের অন্তরকে দুনিয়ার ভাল ভাল জিনিসের প্রতি প্রলুব্ধ করার সাথে সাথে আল্লাহর সন্তোষ-প্রয়াসীও করে তোলে এবং জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে এবং প্রতি মুহূর্তে তাকে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করার লক্ষ্যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

কুরআনে কারীম ও আশা-আকাঙ্ক্ষা

ইতিপূর্বে আখেরাতের আযাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এ আলোচনাকে ভীতি প্রদর্শন-এর একটি অধ্যায় হিসেবেই মনে করা যেতে পারে। এখন আমরা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব, যা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ. يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ. بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ . وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ. وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ. وَ حُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ. جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

(الواقعة : ١٥-٢٤)-

"(বেহেশতে) তারা মণিমুক্তা খচিত খাটের উপর পরস্পর মুখোমুখী ঠেস দিয়ে খোশ গল্পরত অবস্থায় বসে থাকবে। তখন একদল 'অমর' বালক গ্লাস, কাপ ও জগে করে সাদা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা থেকে শরবত নিয়ে তাদেরকে পান করাতে থাকবে। এ শরবত পান করতে গিয়ে তাদের মাথাও ঘুরবে না, বুদ্ধিও নষ্ট হবে না। তাদের সামনে বিভিন্ন ফলমূল পেশ করা হবে যার থেকে তাদের পছন্দমত তারা গ্রহণ করবে, আর যে যে পাখী তারা পছন্দ করে সেগুলোর গোশত তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে; আরও থাকবে সুন্দর সুন্দর চোখওয়ালী হুর (বেহেশতী রমণী) যেন তারা লুক্কায়িত মনোরম মোতির মালা। এসব নেয়ামত তাদের ঐ সকল নেক কাজের বিনিময়ে দেয়া হবে যা তারা (দুনিয়ার বুকে) করে এসেছে।" (ওয়াকেয়া-১৫-২৪)

কুরআনে কারীমের যে সব যায়গায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে

সেখানে পাশাপাশি তাত্ত্বিক বা মানসিক প্রশান্তিদায়ক নেয়ামতের কথারও উল্লেখ আছে। এ কারণে উপরের আয়াতগুলোতেও কিছু তাত্ত্বিক নেয়ামতের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে চাক্ষুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামতের দৃশ্যের যে বিবরণ আছে তাতে বুঝা যায় মনোরম ও পবিত্র পরিবেশে সে নেয়ামতগুলো দান করা হবে। সেখানে কোন ভুল ভ্রান্তি বা ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধ সংঘটিত হবে না, কোন অশোভন উক্তি বা বিরক্তিকর আচরণ করার মত অবস্থাও সেখানে পয়দা হবে না, বরং সকল দিকে এক শান্তির দৃশ্যের অবতারণা হবে যা এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হবে।

এভাবে কুরআনে কারীমের এক যায়গায় যেমন তাত্ত্বিক নিয়ামতের বিবরণ রয়েছে। তেমনি অন্য যায়গায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا وَّ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ. وَ هُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ. -(الحج : ٢٤)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দাখিল করাবেন জান্নাতগুলোতে সেই সকল লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সমস্ত ভাল কাজ করেছে, ঐ জান্নাতগুলোর পাশ দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের ও মোতির তৈরি কাঙ্কন পরানো হবে এবং তাদের পোষাক হবে রেশমের তৈরি। তাদেরকে পাক-পবিত্র কথা কবুল করতে শেখানো হয়েছে এবং তাদেরকে চির প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথ দেখানো হয়েছে।" (হজ্জ-২৪)

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ. تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ. -(المطففين : ٢٢-٢٤)

"নিশ্চয়ই নেক লোকেরা অবশ্যই নেয়ামতের মধ্যে থাকবে, তারা খাটের উপরে বসে থেকে দেখতে থাকবে। তাদের চেহারাসমূহে নেয়ামতের সজীবতা পরিস্ফুট হয়ে থাকবে।" (মুতাফ্ফেফীন ২২-২৪)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً. فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ. فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ. وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ. وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ. -(الغاشيه : ٦ - ١٢)

"কিছু চেহারা, নেয়ামতের অধিকারী হওয়ার কারণে উজ্জ্বল থাকবে, তাদের প্রচেষ্টায় তারা খুশী থাকবে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে, সেখানে তারা কোন বাজে (নিষ্প্রয়োজনীয়) কথা শুনতে পাবে না। সেখানে প্রবাহমান ঝর্ণা ধারা থাকবে। সেখানে উঁচু উঁচু ও মর্যাদাপূর্ণ সিংহাসন থাকবে, পানপাত্রসমূহ সজ্জিত থাকবে, সারিবদ্ধভাবে থাকবে তাকিয়াসমূহ এবং বিছানো থাকবে উত্তম গালিচা।" (গাশিয়া-২-১৬)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. -(عبس : ٣٩ - ٣٨)

"কিছু চেহারা সেদিন চমকাতে থাকবে, থাকবে হাস্য মুখরিত, যেহেতু তারা হবে সুসংবাদ প্রাপ্ত।" (আবাশা-৩৮-৩৯)

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي . (الفجر: ٢٧-٣٠)

"হে প্রশান্ত মন! তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট (নিজ শুভ পরিণতির কথা বুঝতে পেরে) সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাও এবং (নিজ প্রভুর নিকট) প্রিয় হয়ে যাও। এরপর দাখিল হয়ে যাও আমার বান্দাহদের দলে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।" (আল ফাজর-২৮-৩০)

এই শেষোক্ত আয়াতটিতে নিছক রূহানী নেয়ামত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং মানুষের মনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং প্রশান্তির প্রশস্ততর ময়দানের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তারপর ঐ পবিত্র মনকে আল্লাহপাক নিজের দিকে ডেকে নিচ্ছেন এবং নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করছেন, তাঁর দিকে ঐ নেক বান্দাহ্র মন-মগজকে রুজু করে দিয়ে তার সম্মান বৃদ্ধি করছেন। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন, হে নেক বান্দাহ্গণ! আমার (অনুগত) বান্দাহ্দের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার অফুরন্ত নেয়ামতে ভরা জান্নাতসমূহের অদিবাসী হয়ে যাও।

এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ঃ 'মরিয়াম'- এ এরশাদ করেন

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا .

-(مريم : ٩٦)

"নিশ্চয়ই একথা সত্য যে, আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী হয়ে যারা (মানব-সমাজের নিকট জানা) সর্বপ্রকার ভাল কাজ করে চলেছে তাদের জন্য মহাদয়াময় প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ তায়াল (জনগণের) অন্তরসমূহে মুহাব্বাত পয়দা করে দেবেন।" (মরিয়ম-৯৬)

এ আয়াতের মূলকথা হচ্ছে যে, পবিত্র আল্লাহ ঐ সকল বান্দাহদেরকে

মুহাব্বত করতে শুরু করেন যাদের উপর ঈমান ও নেক আমলের দরুন, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ নিঃশেষে বর্ষিত হয় এবং এই মুহাব্বত-প্রাপ্তিই হচ্ছে মুমিন বান্দাহদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মানুষের মধ্যে রয়েছে বহু শ্রেণী এবং মর্যাদার দিক দিয়েও তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এ কারণেই কোন কোন ব্যক্তি জিন্দেগীর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকে বেশি গুরুত্ব দেয়, আর কিছু লোক আছে তার আধ্যাত্মিক বা মানবিক (মান সম্মানজনিত) দিকগুলোর গুরুত্ব দেয় বেশি। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা উপরোক্ত দু দলের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে এবং প্রায়ই তারা একই সময় ঐ দু অবস্থা এক সঙ্গে নিয়ে চলে। এ কারণে কুরআন মজীদে নেয়ামতসমূহের বিবরণ দিতে গিয়ে বস্তুগত ও নৈতিক উভয়ের উল্লেখ করেছে এবং নৈতিক নেয়ামতের বিবরণ এমন চমৎকার ও আকর্ষণীয় ভাষায় দান করেছে যে, যারা নৈতিক নেয়ামতকে প্রাধান্য দেয় না তারা ঐ বিবরণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের কায়দাসমূহ

ভয় ও আশা, মানুষের মনের মধ্যে বিরাজমান এ দু'টি অনুভূতি এমন সমান্তরাল ধারায় এবং এমন সুসামঞ্জস্য গতিতে প্রবাহিত হয় যে তার ফলশ্রুতিতে মানুষের মন সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। এ দু' ধারার সমান্তরাল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়নের মাধ্যমে আল্লাহপাক মানুষের মনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আশার সঞ্চার করেছেন। ভয়-ভীতি জাগরিত করেছেন, পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন এবং আযাবের ধমকি দিয়েছেন, আর এ সব কিছুর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সংশোধন করা, তার মধ্যে তাক্বওয়া সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর ভয়ের সঞ্চার করার মাধ্যমেই মানবতার উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধন করা।

কুরআনে কারীমে উল্লিখিত যত নির্দেশাবলী আছে, যত নসীহাত দান করা হয়েছে এবং যত ফরমান জারী করা হয়েছে, আর যত কিছু নিষেধাজ্ঞা (Prohibition) প্রদান করা হয়েছে সে সবগুলো উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শনের সাথে জড়িত। কুরআনে কারীম বারংবার ঐ সকল উৎসাহ ব্যাপক ও ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ সম্পর্কে উল্লেখ করে ঐগুলো মানুষের মনের অভ্যন্তরে সদা-সর্বদা জাগরুক রাখতে চায় এবং এই উপায়ে এমন সচেতন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে যার নিয়ত মানুষকে সত্যপিপাসু করে এবং মন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا «ط» خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا. -(الكهف : ١٠٧ - ١٠٨)

"ঈমান কবুল করার পর যারা সব রকম সৎকর্মগুলো আঞ্জাম দিয়েছে তাদের জন্য ফিরদাউস জান্নাতগুলো মেহমানখানা হিসেবে থাকবে। চিরদিন তারা সেখানে থাকবে, সেখান থেকে কখনই তারা সরতে চাইবে না।" (কাহাফ ১০৭-১০৮)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ. -(يونس : ٦٣-٦٤)

"যারা ঈমান আনার পর জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ভয় থাকার কারণেই বাছ-বিচার করে চলেছে তাদের জন্য সুসংবাদই সুসংবাদ, দুনিয়ার জীবন ও আখিরাত উভয়স্থানে।" (ইউনুস-৬৩-৬৪)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (غافر : ٧ - ٩)

"যে সকল ফেরেশতা (আল্লাহ্‌র) আরশকে ধারণ করে রেখেছে আর তার আশেপাশে যারা আছে তারা নিরন্তর আল্লাহর প্রশংসাগীতি গেয়ে চলেছে, তাঁর উপর আস্থা জ্ঞাপন করে যাচ্ছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য দোয়া করে চলেছে, হে আমাদের রব! আপনি তো রহমত ও ইল্‌ম্‌ জ্ঞানসহ সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন (অর্থাৎ সব কিছুর উপর আপনার রহমত ছেয়ে রয়েছে এবং সব কিছুই আপনার জানা)। অতএব, যারা তওবা করেছে (সর্বান্তকরণে এবং আপনার পথে ফিরে এসেছে) এবং নেক পথে চলতে শুরু করেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিন। হে আমাদের রব! আপনার ওয়াদাকৃত চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দিন তাদের বাপ-মা ও স্ত্রীগণ, যারা নেক পথ অবলম্বন করেছে এবং যে সকল সন্তানাদি ভাল পথ ধরেছে, তাদেরকেও জান্নাতসমূহে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্যই আপনি মহাশক্তিমান, বিজ্ঞানময় (যুক্তি বুদ্ধিসহ সকল কাজের আঞ্জাম দেনেওয়ালা)। তাদেরকে যাবতীয় মন্দ জিনিস থেকে বাঁচিয়ে নিন, আর সেই (ভয়ানক) দিনে

যাদেরকে মন্দ জিনিসগুলো থেকে বাঁচিয়ে দেবেন তাদের প্রতি অবশ্যই আপনার রহমত চিরস্থায়ী হয়ে যাবে এবং সেটাই হবে মহা সাফল্য।" (গাফের ৭-৯)

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে ঈমান ও আমলে সালেহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করা হয়েছে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ . تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ط ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ. -(الصف : ١٠ - ١٢)

"হে ইমানদারগণ! তোমাদেরকে কি আমি ঐ ব্যবসা সম্পর্কে জানাব যা (অবলম্বন করলে সে ব্যবসা) তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? সে ব্যবসা হচ্ছে এই যে, তোমরা (সর্বময় কর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং চরম ও চূড়ান্ত চেষ্টা চালাবে আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্য এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্য তোমাদের মাল ও জান দিয়ে (অর্থাৎ এ কাজ করতে গিয়ে মালের প্রয়োজন হলে তা দেবে এবং জান দেয়ার প্রয়োজন হলে তাও দেবে)। ঐ ব্যবসাই হচ্ছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর (এ কথা তোমরা বুঝবে) যদি তোমাদের জ্ঞানকে তোমরা কাজে লাগাও। (এ ব্যবসা অবলম্বন করলেই) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন সব জান্নাতে তোমাদেরকে দাখিল করিয়ে দেবেন যার পাশ দিয়ে ও (নীচ দিয়ে) ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। আরও থাকবে চিরস্থায়ী সে জান্নাতগুলোতে পাক-পবিত্র বাসস্থানসমূহ আর সেটাই হচ্ছে মহা সাফল্য। (সফ ১০-১২)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّى لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِى سَبِيْلِى وَ قَاتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّهُمْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ . ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابُ . -(ال عمران : ١٩٥)

"তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের রব জওয়াব দিলেনঃ তোমাদের মধ্যকার

কোন আমল (নেক কাজ) করনেওয়ালার আমল নষ্ট করব না, তা সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তোমরা তো সবাই একে অন্যের মধ্য থেকে আসা মানুষ (পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একই মানুষ)। এখন যারা হিজরত করেছে ও তাদের বাড়িঘর থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আমার পথে (থাকার কারণে) তাদেরকে দঃখ কষ্ট দেয়া হয়েছে, তারপর তারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে অবশ্যই আমি তাদের দোষক্রটিগুলো মুছে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে ঐ সকল বেহেশতে প্রবেশ করাব যার নীচ (ও পাশ) দিয়ে ছোট ছোট নদী প্রাহিত হতে থাকবে। (ঐ নেয়ামতসমূহ) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার) বিনিময়ে দান করা হবে; এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই তো সুন্দর প্রতিদান পাওয়া যায়।" (আলে ইমরান-১৯৫)

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ. يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ وَ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

-(ال عمران : ١٦٩ - ١٧١)

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারাই (সঠিক অর্থে) জিন্দা। তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট (থেকে) তারা রিজিক পেয়ে যাচ্ছে, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ মেহেরবানী থেকে দিয়েছেন তাতে তারা বেশ খুশি। তারা আরো নিশ্চিন্ত ঐ সব পিছনের লোকদের জন্য যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, দুনিয়াতেই (গাজী হিসেবে) রয়ে গিয়েছে, তাদের জন্যও কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নেয়ামত ও মেহেরবানীতে সন্তুষ্ট ও খুশি আছেন এবং জেনে নিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"

(আলে ইমরান-১৬৯-১৭১)

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَ اللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ . (التوبة : ٢٤)

"হে নবী বলে দাও। যদি তোমাদের বাপ, ভাই, ছেলে, স্ত্রীগণ ও তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা বাণিজ্য যা মন্দা পড়ে যাওয়া ভয় সবসময়েই লেগে আছে এবং তোমাদের প্রিয় ঘর-বাড়ি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক, আল্লাহ তায়ালা ফাসেক (গুনাহে কবীরা করে যারা সেই) লোকদের হেদায়েত দান করেন না।" (তাওবা-২৪)

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ج هِىَ حَسْبُهُمْ ج وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ .

-(التوبة : ١٨)

"মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং কাফেরদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করবেন। যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ঐ পরিণতিই তাদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। আল্লাহ তাদেরকে লানত দিয়েছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।" (তওবা-৬৮)

وَ الَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُوْنَ. وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ اَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا. اِلاَّ مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . -(الفرقان : ٦٨- ٧٠)

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক হিসেবে মনে করে না এবং তাদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদনও জানায় না, সত্য সঠিক ও ন্যায্য কারণ ছাড়া কোন এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে না যাকে হত্যা করা হারাম এবং ব্যভিচারও করে না । আর যে একাজ করবে সে এর গুনাহ্ ভোগ করবে, কিয়ামাতের দিনে তাকে বহুগুণে আযাব দেয়া হবে এবং সেই আযাবের মধ্যে চিরদিন অপমানের সাথে তারা থাকবে, তবে যে ব্যক্তি অন্যায় করার পর তওবা করবে ঈমানের দাবি পূরণ করবে এবং ভাল কাজ করবে, তারাই হবে এমন ব্যক্তি, মহান আল্লাহ যাদের খারাবীগুলো ভাল কাজে পরিবর্তিত করে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান।"

(ফুরকান-৬৮-৭০)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

(البقرة: ٢٦٢)-

"যারা তাদের মাল আল্লাহ্র রাহে খরচ করে তারপর যা খরচ করেছে সেগুলোকে খোঁটা দিয়ে অথবা অন্যভাবে কষ্ট দিয়ে বরবাদ করে দেয় না, তাদের জন্যই তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট প্রতিদান রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখও তারা পাবে না" (বাকারা-২৬২)

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰو وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ . وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

(البقرة : ٢٧٥)-

"সুদ যারা খায় তাদের অবস্থা হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তির মত যারা শয়তানের স্পর্শের কারণে বিভ্রান্ত এবং দেওয়ানা হয়ে গিয়েছে। আর তা এ কারণে যে, সে বলেছেঃ কেনা-বেচাও তো এ সুদেরই মত অথচ প্রকৃত ঘটনা তা নয়, (কি করে তা হবে?) আল্লাহ তায়ালাই তো কেনা বেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদের লেন-দেনকে করেছেন হারাম। এরপর তার প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করায় সে যদি থেমে যায় এবং সুদ আর গ্রহণ না করে তো পূর্বে যা করেছে, তার মুয়ামালা আল্লাহ্তে সোপর্দ। তবে, এর পরেও যে ব্যক্তি (সুদের লেন দেনের কাজে) ফিরে যাবে তারাই হবে দোযখবাসী, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।"

(বাকারা -২৭৫)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ . يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ . وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ . (الهمزة : ١ - ٩)

"ধ্বংস এ সকল ব্যক্তির জন্য যারা মুখের উপর মানুষকে দোষারোপ করে

এবং পিছনেও গীবাত করে। যারা ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং বার বার গুণে গুণে দেখে। তারা মনে করে যে, তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে। না, তা কিছুতেই হবে না। অবশ্যই তাদেরকে হুতামা দোযকে নিক্ষেপ করা হবে যে দোযখের আগুন তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে সেই হুতামা দোযখ কি তা কোন জিনিস তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, তা হচ্ছে আল্লাহর অনির্বাণ অগ্নিশিখা যা অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করবে, সে আগুনকে ওদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হবে। তা বাঁধা থাকবে খুঁটিতে। (হুমাজা ১-৯)

وَ سَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَفِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. -(ال عمران : ١٣٣ - ١٣٤)

"দ্রুতগতিতে ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং ঐ জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সম্মিলিত প্রশস্ততার সমান এবং তা নির্দ্ধারিত রয়েছে ঐ সকল মুত্তাকীদের জন্য যারা সুখে দুঃখে(আল্লাহর রাহে) খরচ করে, সে ক্ষমা নির্দ্ধারিত রয়েছে ক্রোধ সংবরণকারীদের জন্য এবং তাদের জন্য যারা মানুষকে মাফ করে, আর (সর্বোপরি কথা) আল্লাহ তায়ালা এহ্সানকারীদেরকে মুহব্বত করেন।" (আলে এমরান-১৩৩-১৩৪)

মোট কথা, এইভাবে ভয় ও আশা এই দুই সমান্তরাল তারের উপরেই নির্ভর করে বাদ্যযন্ত্রসম মানব-জীবনের সংগীতের মাধুরী। এভাবে ইসলা মানুষকে দুনিয়াবী জিন্দেগীর যাবতীয় ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করে এবং তাকে জীবনের বিলাস সম্ভারে ডুবে থাকার প্রবণতা থেকে বাঁচায়, তাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত এবং বাস্তব স্বাধীনতা দান করে। এইভাবে তাকে ইসলাম এমন যোগ্য করে গড়ে তুলে যে, সে রাজনৈতিক, অর্থনৈকি ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্মাণ, উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের যাবতীয় ক্ষেত্রকে তার সুন্দর চরিত্র, পবিত্র মন মানসিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার মনোভাব দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তোলে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তার মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয় এবং এই ভয়ের কারণেই এমন তাক্বওয়া-পরহেজগারীর, (অন্য কথায় বাছ-বিচার করে চলার) গুণাবলী সৃষ্টি হয় যে তাকে সামান্যতম ইশারা ইংগিত করে যদি সঠিক পথের কথা বলে দেয়া হয় তাহলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি-প্রাপ্তির উদ্দেশেই সেদিকে এগিয়ে যায়। তার মনে জেগে উঠে। একাজে আল্লাহপাক যখন খুশি তখন

যে কোন মূল্যে একাজ করতেই হবে, আবার যে কাজে আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট তার থেকে বাঁচতেই হবে। এইভাবে দেখা যায়, কুরআনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম যে ইসলামী দলটি গড়ে উঠেছিল তাদের আবেগ-অনুভূতি আল্লাহর উপর ভরসা এবং তাঁর উপর পূর্ণ আস্থার অবস্থা এই ছিল যে তারা দিনরাত আল্লাহর নিদের্শাবলী পালনের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহ্পাক তাদের এই ভূমিকায় খুশি হয়ে তাঁদের সম্পর্কে কালামেপাকে এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ. (ال عمران : ١١٠)

"তোমরাই দুনিয়ায় সব থেকে উত্তম জাতি যাদেরকে (শিক্ষাদাতা হিসেবে) গোটা মানব জাতির জন্য বের করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হচ্ছে, তোমরা ভাল কাজ বলতে যা কিছু মানুষ জানে সেগুলো হুকুম বলে চালু করবে (ক্ষমতা লাভ করে নির্দেশ দানের মাধ্যমে) এবং অন্যায় অপ্রিয় জিনিসগুলো ক্ষমতাবলেই বন্ধ করবে, আর এ সময় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর উপর ঈমান ও তার বহিঃপ্রকাশ সর্বজনবিদিত হবে।" (আলে ইমরান-১১০)

নবম অধ্যায়

প্রেম-প্রীতি ও ঘৃণাবোধ

মানব-প্রকৃতিতে প্রেম-প্রীতি ও ঘৃণাবোধ এ দু'টি এমন বৈশিষ্ট্য যা সব সময় এবং সবার মধ্যে সমান্তরালভাবে বিরাজমান এবং এদু'টি অনুভূতি মানুষের মনমগজকে ও তার বাস্তব জীবনকে সমভাবে প্রভাবিত করে যেমন 'ভয় ও আশা'র সুসামঞ্জস্য অবস্থান মানুষের জীবনের বেশিরভাগ অংশকে প্রবলভাবে প্রচারিত করে। ভয় ও আশাকে ইসলাম যেভাবে সঠিক গতিপথ দান করেছে সে একইভাবে মানুষের মধ্যে 'প্রেম ও ঘৃণা এদু'টি বৈশিষ্ট্যকেও তার প্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বৃত্তি হিসেবে দান করে তাদের অবস্থানকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্য করেছে এবং তাদের সঠিক কাজ ও প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

আত্মপ্রেম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবি। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুগত ও মানসিক তৃপ্তিকর জিনিস থেকে আনন্দ লাভ করতে চায় সে। আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশ ও শক্তিমান হওয়ার উদগ্র বাসনা, বিজয়ী ও ক্ষমতা লাভের প্রবল কামনা তার সহজাত ধর্ম। সে প্রভূত সুখ, সম্পদ ও অগণিত ভাণ্ডারের অধিকারী হতে ইচ্ছুক, দীর্ঘায়ু হওয়া এমনকি চির-অমর হয়ে থাকা সবার প্রিয়, সবার লক্ষ্য বস্তু ও কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার এক সুপ্ত বাসনা তার প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান।

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ . (العاديت : ٨)

"সে ধন দৌলতের মুহাব্বতে বড় কঠিনভাবে আবদ্ধ।" (আদিয়াত-৮)

এই কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলো হাসিল করার পথে যে কোন বস্তুগত বা আদর্শিক বাঁধাই তার কাছে অপ্রিয়। সুতরাং যারা তার চাহিদাগুলো মেটানোর পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ক্ষতিকর পদক্ষেপ নেয়, তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং যে সকল বস্তুকে তার একান্ত অধিকারের জিনিস মনে করে সেগুলো পাওয়ার পথে কেউ যদি বাধা হয় তাহলে সে মনে প্রাণে তাকে ঘৃণা করবে এটাই প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতি।

সুতরাং, এটা সর্ববাদিসম্মত সত্যকথা যে ভালবাসা ও ঘৃণার চেতনা ও অনুভূতি তার অন্তরের গভীরে বর্তমান রয়েছে। ইসলাম মানুষের এ অনুভূতিকে দলিত-মথিত না করে তাকে গঠনমূলক কাজের জন্য সুসভ্য বানাতে চায় এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে, প্রশিক্ষণ দেয় এবং সুসংগঠিত করে। কেননা, উক্ত প্রেমাবেগ ও ঘৃণার অনুভূতিকে সুসংগঠিত না করা হলে তা মানুষের প্রকৃতিদত্ত আবেগের অসদ্ব্যবহার করবে অথবা অপচয় ঘটাবে। যার ফলে

ঐ আগেবসমূহ হয়ত অপরের জন্য ক্ষতির কারণ হবে, নয়তো তার নিজ মর্যাদাকে ধূলিধূসরিত করবে।

এই জন্য ইসলাম মুহাব্বত ও ঘৃণাবোধের গুণগুলোকে নৈতিক এবং জ্ঞান ও যুক্তির কষ্টি পাথর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছে যেন এগুলো লাগাম ছেড়া ঘোড়ার মত দিশেহারা হয়ে যত্রতত্র ছুটে না বেড়ায় এবং এই নিয়ন্ত্রণের বিধানগুলো সবার স্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে।

আত্ম-প্রেম, আত্ম-মর্যাদাবোধ ও নিজ সম্পদ-সম্পত্তির প্রতি ভালবাসাকে ইসলাম দোষণীয় বলেনি। কেননা এই অনুভূতি হচ্ছে সেই মহামূল্যবান গুণ যা দিয়ে মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করা যায় এবং যার দ্বারা মানুষ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এগুণগুলোর কারণেই সে শহর, নগর-বন্দর, কল-কারখানা ও শিল্পজাত বহু মূল্যবান জিনিস গড়ে তোলে, যার দ্বারা সে নিত্য নূতন জিনিস আবিষ্কার করে চলেছে, অজানাকে জেনেছে, প্রকৃতিকে জয় করেছে এবং গোটা বিশ্বের সম্পদকে মানুষের খিদমতে নিয়োজিত করেছে।

কিন্তু ইসলাম চায়না যে, বস্তুগত এসব জিনিস লাভ করতে গিয়ে সে এগুলোর গোলাম হয়ে যাবে, নিশিদিন সে শুধু এই নশ্বর পৃথিবীর জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে চাওয়া-পাওয়ার পিছনে পাগল প্রায় হয়ে ছুটে বেড়াবে, অফুরন্ত এসব চাহিদা মেটানোর অন্ধ নেশার কারণে তার নিজের উপর জুলুম করা হয়ে যায়, আর প্রকৃতপক্ষে এটা একটি বাস্তব সত্য যে প্রতি মুহূর্তে চাওয়া-পাওয়ার মোহ তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্ম-প্রেমের সঠিক অর্থ

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্ম-প্রেম বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার সঠিক অর্থ হচ্ছে এই, সে যত দিন দুনিয়ায় বেঁচে আছে ততদিন যেন সে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে তাঁর নিয়ামতের ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই গ্রহণ করতে পারে যতটুকু শক্তিমান সামর্থবান ও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ার পরিচালক হওয়ার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু তার মূললক্ষ্য থাকবে আখেরাত। অর্থাৎ এ দুনিয়াকে সে নশ্বর জেনে ভেবে তুচ্ছ এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী সেই জিন্দেগীর জন্য হবে সে ভোগীর চেয়ে ত্যাগী বেশি। ফলে প্রকৃত মুসলিম জীবনে ত্যাগের এই মহিমা এনে দেবে আত্ম-প্রেম থেকে মানব-প্রেম অধিক এবং এইভাবে তার মানবতা হবে সমুজ্জ্বল। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে অতি স্পষ্টভাবে সে বুঝতে পারে যে, মহান ও প্রেমময় মওলাপাকের কাছে একান্তভাবে তারই জন্য রক্ষিত চিরস্থায়ী সে রূপে-রসে সুরভিতে ভরা যে প্রেম কাননগুলো রয়েছে তাকে পিছনে ফেলে ঠুনকো, ক্ষণস্থায়ী ও

এ নশ্বর পৃথিবীর আকর্ষণ ও তার বস্তুগুলো লাভ করার জন্য দিবারাত্রির অস্থিরতা এবং তার জন্য নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় বন্ধন কেটে ফেলে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা চরম নির্বুদ্ধিতা ও অমার্জনীয় অপরাধ।

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا . وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ط وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ . -(الحديد: ٢٠

"জেনে নাও হে মানুষ! এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ, সুখ-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা। নিজেদের মধ্যে এটা ওটা নিয়ে বড়াই করার প্রতিযোগিতা এবং ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তানাদির আধিক্যের নিরন্তর সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ হচ্ছে ঐ বর্ষণধারার ন্যায় যার দ্বারা উৎপাদিত শ্যামল প্রান্তরের শোভা শস্য আল্লাহকে অস্বীকারকারী চাষীকে মুগ্ধ করে, তারপর যখন মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় এ চারগাছগুলো হেলে দুলে নাচতে থাকে তখন সে আরও চমৎকৃত হয়। কিন্তু তার অস্বীকৃতির কারণে তুমি দেখতে পাবে সে সুন্দর গাছগুলো ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে এবং তারপরই দানাবিহীন ভূষিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং তারপর (এইভাবে দুনিয়ার জীবন ব্যথা হওয়ার পর) আখিরাতে তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং নিজ কর্তব্য পালনে ব্যস্ততার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা। এর ভাবধারা সৃষ্টি করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার অন্তরে প্রেমময় আল্লাহ্পাকের মুহাব্বাত জাগরিত করে যেহেতু তিনিই তো সকল কেয়ামতের আধার ও তিনিই জীবনদাতা আর মানুষ যত শক্তি যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পেয়েছে সব তাঁরই দান।

(হাদীস ২০)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ .

-(التغابن : ٣)

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন সত্য সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে। তারপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন আর সে আকৃতিকে বড় সুন্দর করেছেন।"

(তাগাবুন-৩)

اَلرَّحْمٰنُ . عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ .

-(الرحمن ك ١ - ٤)

"মহাদয়াময় বিধাতা, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, শিখিয়েছেন তাকে কুরআন, আর তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন (যা আর কোন জীবজন্তু পারে না)"

(রহমান ১-২)

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى . -(الاعلى : ١ - ٢)

"হে নবী! নিজ মহান প্রভুর নামের মহিমাকীর্তন কর, তাঁরই নাম জপ, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুসামঞ্জস্য করেছেন।" (আলা-১-২)

يَا اَيُّهَا الْاِنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ . اَلَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ . -(الانفطار : ٦ - ٧)

"হে মানুষ! কোন জিনিস মিথ্যা প্রলোভন (ধোঁকা) দিয়ে তোমাকে তোমার রব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুসামঞ্জস্য করেছেন। তারপর তিনি তোমাকে ইনসাফপূর্ণ এমন এক সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন যার কারণে তুমি সকল জীবজন্তু থেকে সুন্দর, সক্ষম ও সামর্থবান হয়েছো।" (ইনফিতর-৬-৭)

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً . (الروم:٥٤)

"আল্লাহ্ তায়ালা সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থা থেকে পয়দা করেছেন, তারপর এ দুর্বল অবস্থার পর শক্তি যুগিয়েছেন।" (রুম-৫৪)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ. -(الصافات : ٩٦)

"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কিছু বানাচ্ছ তাদেরকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সাফ-৯৬)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا. -(الاسراء:٧٠)

"আর অবশ্যই আমি (মহান আল্লাহ্) আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থল ও পানিভাগে বিভিন্ন যানবাহনে আরোহণ করিয়েছি, আর পাক-পবিত্র ও উত্তম জিনিস থেকে তাদেরকে জীবন ধারণ সামগ্রী সরবরাহ করেছি, তারপর তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (বনী ইসরাইল-৭০)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ . -(التين : ٤)

"অবশ্যই আমি (মহান আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে।" (আত্ব তীন-৪)

اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ .
-(السجدة : ٧)

"যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন সুন্দর করেই সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন কাঁদা দিয়ে।" (সাজদা-৭)

اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
-(البلد : ٨ - ١٠)

"আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা এবং দু'টি ঠোঁট দেইনি, তারপর দু'টি স্পষ্ট রাস্তা তাকে দেখাইনি?" (আল-বালাদ ৮-১০)

আল্লাহ্ তায়ালাই পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস এবং আরাম-আয়েশের সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন যাতে তার জীবন সজীব ও সচল থাকে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا . -(البقرة : ٢٩)

"তিনিই পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।" (বাকারা-২৯)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ الرَّحِيْمٌ. -(الحج : ٦٥)

"তুমি কি দেখছো না যে, আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর বস্তুগুলোকে এবং সাগরের বুকে চলমান জাহাজগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। আর তার বিনা হুকুমে পৃথিবীর বুকে আকাশ থেকে কিছুই পতিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য বড় স্নেহময় ও দয়ালু।" (হজ্জ-২৫)

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا . (الجاثية:١٣)

"তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু।" (জাছিয়া-১৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّوْرِ . -(الانعام : ١)

"যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং বানিয়েছেন আঁধার ও আলোকে।" (আল আনাম-১)

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا .

(النحل : ٨١)-

"আল্লাহ্ তায়ালা যাকিছু সৃষ্টি করেছেন তার থেকেই ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় পর্বতেও তোমাদের জন্য ঘরদুয়ার বানিয়ে দিয়েছেন।" (নাহাল-৫)

وَ مِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّ رَحْمَةً. -(الروم : ٢١)

"আর তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের নিজদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া (স্ত্রীদেরকে) পয়দা করেছেন যাতে করে তাদের নিকটে গিয়ে তোমরা প্রশান্তিলাভ কর এবং তোমাদের মধ্যে মুহাব্বাত ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন।" (রুম-২১)

وَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ. -(الزخرف : ١٢)

"আর তিনিই তো সকল জোড়া জিনিস ও জোড়াসম্পন্ন জীবজন্তু পয়দা করেছেন এবং জাহাজ ও জন্তুদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন এমন যানবাহন যাতে তোমরা আরোহণ করতে পার। (যুখরুফ-১২)

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ وَ ذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ . وَ لَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ. -(يس : ٧١ - ٧٣)

"ওরা কি দেখে না যে, আমি (মহান আল্লাহ) নিজ ক্ষমতার হাত দিয়ে যা সৃষ্টি করেছি তার মধ্যে গবাদিপশু আছে, যার মালিক তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছি, সেগুলোকে তাদের জন্য পোষ মানিয়ে দিয়েছি, তার থেকে কিছু সংখ্যককে তারা যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করে এবং কিছু সংখ্যককে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। সেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে রকম-বেরকমের খাদ্য ও পানীয়। তবুও কি ওরা শুকুরগুজারি করবে না?।" (ইয়াসিন-৭১-৭৩)

وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ . وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا . اِنَّ فِى ذَالِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ . وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ . ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً . يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ . -(النحل : ٦٦-٦٩)

"আর অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের বস্তু। আমি (মহান আল্লাহ্) তোমাদের পান করাই ঐ খাঁটি দুধ থেকে যা ঐ পশুর পেটের মধ্যে অবস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যকার এক যায়গা থেকে বের হয় যা পানকারীর জন্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। এর পর খেজুর গাছ থেকে ও আংগুর থেকে তোমাদেরকে এক রস সরবরাহ করি যা দিয়ে তোমরা নেশা আনয়নকারী পানীয় বানাও আবার উত্তম শরবতও তৈরি কর। যারা বুদ্ধির সদব্যবহার করে তাদের জন্য এই কথার মধ্যে রয়েছে এক শিক্ষার বিষয়। তারপর তোমার রব মৌমাছিকে গোপন নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, পাহাড়-পর্বতে, গাছে এবং উঁচু উঁচু যায়গায় ঘর তৈরি কর, এরপর প্রতি ফল থেকে রস খাওয়ার পর নিজ পরওয়ারদিগারের তৈরি পথে উড়ে গিয়ে ঐ ঘরে বসো। এই ঘরে (চাকে) থাকাকালীন তার পেট থেকে বেরুতে থাকে রং-বেরং-এর স্নিগ্ধ পানীয় (মধু) যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য দানকারী মহৌষধ।" (নাহাল-৬৬০৬৯)

আল্লাহপাক তাঁর বান্দাহর জন্য বড়ই মেহেরবান এবং মহাদয়াময়, তিনি তাঁর বান্দাহকে তার শক্তির বাইরে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে কষ্ট দেন না এবং যে কোন কাজের হুকুম দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে, একটু খেয়াল করলেই সে দেখতে পায়, তার নিজের কল্যাণই ঐ কাজের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . (الحج : ٧٨)

"তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং তাঁর দেয়া বিধান পালন করার ব্যাপারে তোমাদেরকে কোন অসুবিধায় ফেলেননি।" (হজ্জ-৭৮)

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . (البقرة - ١٨٥)

"আল্লাহ্পাক তোমাদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার করতে চান, কোন কষ্ট তোমাদেরকে তিনি দিতে চান না।" (বাকারা-১৮৫)

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا . -(بقرة : ٢٨٦)

"কাউকে তার সাধ্যের বাইরে তিনি কষ্ট দেন না।" (বাকারা-১৮৬)

উপরন্তু তিনি তাঁর ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত ও অপরাধী বান্দাহদেরকে ক্ষমা করে দেন।

وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ . وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ . اُولٰئِكَ جَزَائُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ج وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ . -(آل عمران : ١٣٤ - ١٣٦)

"আর, এহ্‌সান যারা করে তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা বড় ভালবাসেন এবং যারা লজ্জাস্কর কোন কাজ করেছে অথবা নিজেদের অপরাধের জন্য প্রার্থনা করেছে তাদেরকে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন (কেননা) তিনি ক্ষমা না করলে কে আছে এমন যে ক্ষমা করবে! অবশ্য এ ক্ষমা তাদের জন্য যারা গুনাহ্ খাতা করার পর তওবা করে ও ঐ অপরাধের উপর জেনে বুঝে টিকে থাকে না। এই ক্ষমা প্রার্থীদেরকে প্রতিদান স্বরূপ, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দান করা হবে ক্ষমা এবং ঐ সকল জান্নাত যার পাশ দিয়ে ছোট ছোট শ্রোতস্বীনী নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর কতই না চমৎকার নেক-আমলকারীদের প্রতিদান।"

(আলে ইমরান-১৩৪-১৩৬)

এখন নেক লোকেরা আল্লাহ্ তায়ালার বড়ই প্রিয়। মানুষের কষ্ট দেখে যাদের মনে কোন রেখাপাত করে না তারা কি করে মহান আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করেন।

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . -(الفرقان : ٧٠)

"তবে, কেউ যদি গুনাহ করার পর তওবা করে (ঐ ধরনের গুনাহ্ আর করবে না বলে সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করে) তার পরে পরিপূর্ণ ঈমান আনে ও (ঈমানের পরিচয় বহনকারী) বাস্তবে ভাল কাজ করে তো ঐ সকল তওবাকারীদের গুনাহ্‌গুলোকে আল্লাহ্‌পাক সওয়াব দ্বারা বদলে দেবেন। আল্লাহ্‌পাক চিরক্ষমাশীল, মেহেরবান।" (ফুরকান-৭০)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ . -(الزمر : ٥٣)

"হে নবী! আমার গুনাহগার বান্দাহদের কাছে বলো, হে আমার ঐ সকল বান্দাহ্গণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" (যুমার-৫৩)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

-(النساء : ٤٨)

"শক্তি, গুণ বা ক্ষমতায় কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার বা সমকক্ষ করা হলে সেই অপরাধ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করেন না, বাকি অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেন।" (নিসা-৪৮)

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا . -(الزمر : ٥٣)

"অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালা গুনাহ খাতা সবই মাফ করে দেবেন।"

(যুমার-৫৩)

ইসলাম আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির সবার সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করেছে। তিনি চান সৃষ্টির সবার মধ্যে, বিশেষ করে মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক এবং পরস্পরের মধ্যে চিন্তার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ পয়দা হোক। আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে দাসত্বের সম্পর্ক, তার মধ্যে, এই অনুভূতি পয়দা করে যে, সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস প্রতিনিয়ত আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসাগীতি করে চলেছে এবং তাকে এ কথা জানায় যে সৃষ্টির সকল বস্তুকে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের উপকার ও খিদমতের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এ অনুভূতিও তার মধ্যে পয়দা করেছেন যে, পৃথিবীর সব কিছুর জীবন মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষভাবে তার মধ্যে এ চেতনা জাগানো হয়েছে যে, গোটা মানবকুল একই ব্যক্তি থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং এ কারণেই তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও মুহাব্বতের সম্পর্ক কায়েম হওয়া দরকার। কেননা, মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেও যেমন ভাই ভাই, (অর্থাৎ একই ঔরসে তাদের জন্ম) তেমনি একই গর্ভে পয়দা হওয়ার কারণেও তারা ভাই ভাই। তাদের প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, সূত্রপাত ও পরিণাম সব দিক দিয়েই তারা ভাই ভাই। কুরআনে কারীম কি চমৎকার ভাষা ও ভঙ্গীতে এ কথাটির উল্লেখ করেছে, যা পড়তে গিয়ে মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়।

يَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً وَ اتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ. -(النساء : ١)

"হে জনগণ! তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার থেকে তার জোড়া (স্ত্রী) পয়দা করার পর তাদের দু'জনের মধ্য থেকে বহু নর ও নারীকে (দুনিয়ার বুকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরের হক পেতে চাও এবং নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধনকে ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে চাও।" (নিসা-১)

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا . -(ال عمران : ١٣)

"আর আল্লাহর নেয়ামত যার বর্ষণধারা তোমাদেরকে সদা সর্বদা সিঞ্চিত করছে, সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, আরও স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তখন তিনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে এমন মুহাব্বাত পয়দা করে দিলেন যে তাঁর মেহেরবানীতে তোমরা পরস্পর ভাইয়ে পরিণত হয়ে গেলে।" (আলে ইমরান-১০৩)

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. -(الحشر: ٩)

"আর যারা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তারা ঐ সকল মুহাজিরদেরকে মুহাব্বাত করে যারা তাদের নিকটে হিজরত করে চলে এসেছিল। তারা ঐ সকল বস্তুর প্রতিও কোন লোভ-লালসা রাখে না বা তার প্রয়োজনও অনুভব করে না, তারা নিজেদের প্রয়োজনের উপর তাদের মুহাজির ভাইদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় যদিও (প্রকৃতপক্ষে) তাদের নিজেদের ক্ষুধা সংকট ও প্রয়োজন আছে।" (হাশর-৯)

وَ لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ . -(الحجرات ك ١١)

"তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ (মুখের উপর কর্কশভাবে দোষ দেয়ার মত ঘৃণ্য কাজ) করো না।" (হুজরাত-১১)

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ. -(الحجرات: ١٢)

"তোমরা কেউ কারো গীবত (অনুপস্থিতিতে নিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি কি তার মরা ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? একটু খেয়াল করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, অবশ্যই তা তোমরা ঘৃণা কর।" (হুজরাত-১২)

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. (البقرة - ٢٣٧)

"তোমাদের পারস্পরিক লেনদেনে তোমরা মহানুভবতা দেখাতে ভুলে যেয়ো না।" (বাকারা-২৩৭)

এই অধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যেমনঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. -(البخارى)

"তোমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ না করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (বুখারী)

"যাকে তুমি চেন তাকেও সালাম কর, যাকে না চেন তাকেও সালাম কর।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ইব্‌নেমাজা)

"তোমার ভাইয়ের দিকে মুচকি হাসি দিয়ে তাকানোতেও সাদকার সওয়াব হবে।" (ইবনে হাব্বান। বায়হাকী)

"আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দাহও আছে যারা নবী নয়, কিন্তু নবী ও শহীদরাও তাদেরকে ঈর্ষা করে। সাহাবারা আরজ করলেন, তারা কারা? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তারা ঐ সকল ব্যক্তি যারা এমন সকল লোককে মুহাব্বাত করে যারা তাদের স্বগোত্রীয় বা আত্মীয়স্বজন নয়, একমাত্র তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় তাই তাদেরকে তারা ভালবাসে। তাদের চেহারা নূরানী হবে এবং তারা নূরানী আসনে সমাসীন থাকবে, অন্য মানুষ যখন ভীত সন্ত্রস্ত হবে তখন এরা নির্ভয়ে থাকবে, এদের কোন দুঃখও থাকবে না। এর পর তিনি নীচের আয়াত পড়লেনঃ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"শোনো আল্লাহ্‌র বান্দাহগণের জন্য কোন ভয় নেই, তারা দুঃখও পাবে না।"

যাই হোক, এসকল উপদেশবাণীর মূললক্ষ্য হলো মানুষ পাক-পবিত্র হওয়ার

উদ্দেশ্যে খাঁটি ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরস্পরকে মুহাব্বাত করবে এবং আত্ম-প্রেমকেও উপেক্ষা না করে নিজের হকও আদায় করবে। এভাবে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সবার হক যথাযথভাবে আদায় করবে। এমন না হয় যে নিজ স্বার্থের কারণে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি বা বে-ইনসাফী করা হবে। আর এমনও না হয় যে, নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে সব কিছু অপরকে দিয়ে দেয়া হবে।

মানব চরিত্রে ঘৃণা এমন একটি দোষ যা মন্দ প্রবণতাকে শক্তিশালী করে

ঘৃণা মানব চরিত্রের মধ্যকার একটি মন্দ শক্তি, আর ইসলাম যাবতীয় মন্দকে প্রতিহত করে। এ জন্য এ দোষটি যেরূপ বা যে অসীলায় কারো উপর ভর করতে চাইবে তা অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। কেননা, এটা একটা জুলুম। এই জুলুমকে কোন অবস্থাতেই স্থান দেয়া যেতে পারে না। যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছেঃ

"হে আমার বান্দাহগণ! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও হারাম করেছি; সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না।"

তবে, আল্লাহর দুশমন যারা তাদেরকে ঘৃণা করা সে আল্লাহ্‌রই জন্য, এজন্য সেটা ঈমানের লক্ষণ। যেমন হাদীসে জানা যায়, "ভালবাসা আল্লাহর জন্য এবং ঘৃণা করা সে আল্লাহরই জন্য, এজন্য সেটা ঈমানের লক্ষণ।"

জুলুম করা সম্পর্কে সূরায়ে বাকারার ১৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ. -(بقرة : ١٩٤)

"সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর যতটা বাড়াবাড়ি করবে তোমরা ততটাই তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে।" (আয়াত-১৯৪)

ক্ষমা করতে পারলে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, প্রতিশোধ নেওয়া অন্যায় হবে না, তবে যতটা তারা করেছে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, তার বেশি কিছু করলে সেটাই হবে জুলুম।

এমন দোষী লোককে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে যাকে শাস্তি না দিলে সে সাহসী হয়ে উঠবে এবং তার দোষ বাড়তে বাড়তে সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে বলে আশংকা হয়।

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِى الْاَلْبَابِ . -(البقرة : ١٧٩)

"হে বুদ্ধিমানেরা জেনে নাও যে, শাস্তির মধ্যেই তোমাদের জিন্দেগী (জীবনের নিরাপত্তা) আছে।" (বাকারা-১৭৯)

وَ مَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا .

-(النساء : ٧٥)

"কি হলো তোমাদের, কেন তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে (তাঁর প্রভুত্বকে তাঁর রাজ্যে কায়েম করার জন্য, এবং ঐ সকল দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুকে উদ্ধার করার জন্য যারা ঘেরাও হয়ে গিয়েছে দুর্বলতার কারণে এবং তারা অসহায় অবস্থায় থেকে আর্তনাদ করছে এই বলে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জালেম শাসক (জুলুমবাজ অধিবাসীদের) এলাকা থেকে বের করে অন্য কোথাও নিয়ে যান এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন বন্ধু অভিভাবক এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।" (নিসা-৭৫)

নিজের ব্যক্তিসত্তার সাথে বে-ইনসাফী করলেও জুলুম হয়, কুরআনে কারীম এটাও প্রতিহত করতে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِى اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا. اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا. -(النساء : ٩٧ - ٩٩)

"যারা নিজেদের ওপর জুলুম করছিল তাদের রূহ কবজ্ করার সময় তাদেরকে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করছিলেন, তোমরা কোন অবস্থার মধ্যে পতিত ছিলে? তারা জওয়াব দিল, আমরা পৃথিবীতে দুর্বল অবস্থায় থেকে ঘেরাও হয়ে ছিলাম, মজবুর ছিলাম, ফেরেশতাগণ বললেন, আল্লাহ্র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না, সেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে পারনি? (যারা গেলে যেতে পারত কিন্তু পার্থিব নানা অসুবিধায় পড়তে হবে মনে করে হিজরত করেনি) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং নিকৃষ্ট সে ফিরে যাওয়ার যায়গা। তবে, ঐ সকল পুরুষ, নারী ও শিশু যারা অসহায় অবস্থায় রয়েছে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তাও চেনে না, বেরিয়ে

যাওয়ার মত কোন সহায়-সম্বলও নেই, তাদেরকে হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দোষত্রুটি উপেক্ষাকারী এবং নেয়ামত বর্ষণকারী।" (নিসা-৯৭-৯৯)

দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থাকার চেষ্টা যারা করছে তাদেরকে বাঁধা দিয়ে তাদেরকে অসহায় করে তোলাও জুলুম এবং নিকৃষ্ট কাজ, এই অন্যায়কে মন্দ জেনে একে প্রতিহত করতে হবে।

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি (সত্য পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা) এটা হত্যা থেকেও শক্ত জিনিস।"

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ . –(البقرة : ١٩٣)

"ফিৎনা (বিশৃঙ্খলা) দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে লড়তে থাক ততদিন যতদিন না পৃথিবীতে আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্র (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান আনুগত্য) চালু না হয়ে যায়।" (বাকারা-১৯৩)

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ – (المائدة : ٣٣)

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি, বে-ইনসাফীজনিত অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা হাত পা কেটে দেয়া হবে বিপরীত দিক থেকে অথবা তাদেরকে দেশান্তরিত করা হবে।" (মায়েদা-৩৩)

সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন কদর্যতা ঘৃণাই এবং সেগুলো এমন সামাজিক অপরাধ যা প্রতিহত করতেই হবে।

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَاتَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

–(النور: ٢)

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মার; যদি তোমরা আল্লাহ্র শক্তি-ক্ষমতার উপরে এবং আখিরাতের জীবনের উপর

বিশ্বাসী হয়ে থাক তাহলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আইনকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার অনুকম্পা, বা দয়া-মায়া-মমতা যেন দেখা না দেয়।" (আন নূর-২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ. -(النور : ۹)

"যারা ঈমানদারদের মধ্যে কোন লজ্জাকর ব্যাপার ছড়াতে চায় অথবা চায় যে লজ্জাকর জিনিস ছড়িয়ে পড়ুক এমন সব লোকদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (নূর-৯)

সঠিক পথ (আল্লাহ্ ও রাসূল-এর পথ) থেকে সরে দাঁড়ানো অন্যায় ও মন্দ কাজ

মহা-পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালার প্রদর্শিত সঠিক, মজবুত ও সরল পথ থেকে সরে দাঁড়ানো (পরিহার ও পরিত্যাগ করা-Diversion) প্রতিরোধযোগ্য অন্যায় ও মন্দ কাজ।

مَنْ رَاٰى مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِيْعِ فَبِلِسَانِه فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ . -(بخارى ومسلم)

"তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি কোন অন্যায় কাজ দেখে তখন তার কর্তব্য হবে সে অন্যায়কে হাত দ্বারা প্রতিহত করা, না পারলে জিহ্বার দ্বারা (প্রতিহত করা) তাও যদি না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করাই তার কর্তব্য হবে। এই শেষের কাজটা করাই হবে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।"

(বুখারী ও মুসলিম)

প্রতিহত করতেই হবে, হাত দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে করা যেতে পারে, জিহবার ব্যবহার করার মাধ্যমে, করতে গেলে কিছু বিলম্বে প্রতিহত হতে পারে, আর অন্তর দ্বারা প্রতিহত করার কাজ করতে গেলে ঐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অন্তরের বিক্ষোভ সম্পর্কে জানাজানি করতে সময় লাগবে এবং এই আন্দোলন গড়ে তুলে ধীরে ধীরে কাজ করার কারণে বেশ কিছু সময় লাগবে, তবুও প্রতিহত করার প্রোগাম নিয়েই সময়, সুযোগ ও শক্তি হিসেবে যখন যেমন সম্ভব তেমনি প্রতিহত কাজ চালিয়ে যেতে হবে; তাহলেই ঈমানের ক্ষীণতম পরিচয় দান করা হবে।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَلاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ . وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ . وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ . -(يس : ٦٢)

"হে আদম সন্তানেরা! তোমাদেরকে কি আমি বলেছিলাম না যে শয়তানের গোলামী করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? আরো বলেছিলাম যে, আমার গোলামী করবে। এটাই সঠিক ও সরল পথ। এতদসত্ত্বেও অবশ্যই সে বহু লোককে গুমরাহ্ করেছে, তোমরা কি এগুলো বুঝবে না?" (ইয়াসিন-৬২)

মুমিন নিজের সমগ্র শক্তি ও যোগ্যতা নিয়ে দিনভর অসত্যপন্থী ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকে এবং অন্যায় শক্তির উপর ন্যায্য শক্তিকে বিজয়ী করার জন্য তার এ অবিরাম জিহাদ আমরণ চলতে থাকে। এই সত্যের পথে সংগ্রামের কারণে তার জীবনে মুহাব্বাত ও ঘৃণার মধ্যে ইনসাফ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশম অধ্যায়

বাস্তবতা ও কল্পনা

মানব জীবনে বাস্তবতা ও কল্পনা, এ দু'টি জিনিসই পাশাপাশিভাবে বর্তমান আছে। মানব জীবনের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য এ দুটি জিনিসেরই প্রয়োজন। কিন্তু, পৃথিবী সকল সময়েই এদুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বরং কখনো একদিকে চরম পন্থা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ অতি বাস্তব বা বস্তুবাদী হয়েছে আবার কখনো অতি কল্পনাবিলাস বা দার্শনিকতার মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছে। আজকে মানুষ যেমন অতি বস্তুবাদী তেমনি এক সময় ছিল যখন মানুষ রোমীয় সভ্যতার মধ্যে থেকে দর্শন সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল।

রোমান সভ্যতার মধ্যে বস্তুর প্রতি উদাসীন থেকে শুধু কল্পনা ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাকে সব মনে করা হত। আর এখন বস্তুবাদী সভ্যতার যুগে মনে করা হয় বস্তুই সব এবং শুধু বস্তুর উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানুষ অস্থির হয়ে পড়েছে। আজকে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সর্বস্ব মনে করে পার্থিব এ জীবনের বস্তুগত প্রয়োজনকে এত প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে যে, এ জীবনের ঊর্ধ্বে আর একটি জগত আছে এবং তার জন্য চিন্তা ভাবনা করা দরকার এটা আর মানুষ বুঝতে চাচ্ছে না। ফলে মানুষ পশুর স্তরে নেমে গিয়েছে। যেমন পশু পেটসর্বস্ব তেমনি আজ মানুষও পেটসর্বস্ব হয়ে পেটের প্রয়োজন তথা শারীরিক প্রয়োজনের জন্য তার সমস্ত মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছে। কি করে বেশি পাব বেশি খাব-নিশিদিনের সারাক্ষণের চিন্তা তার এই একটাই হয়ে পড়েছে।

এই বস্তুবাদী সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ডারউইনের দর্শনের উপরে, তার শিক্ষার ফলে মানুষ ক্ষণস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ এ জীবনকেই যথেষ্ট মনে করে। এ জীবনকে বস্তু সর্বস্ব করে তোলার জন্য সমস্ত মনোযোগ সংযোগ করেছে, এ জীবনের ঊর্ধ্বে এক পূর্ণ ও স্থায়ী জীবন আছে যার জন্য তার চিন্তা ও চেষ্টা চালানো দরকার এ মনকে পর্যন্ত বস্তুবাদী চিন্তা খতম করে দিয়েছে। এভাবে বস্তুবাদ মানুষকে জীবজন্তু বা মেশিনে পরিণত করে ফেলেছে। অপর দিকে ইসলাম মানুষের মধ্যে পূর্ণ মানবতার চেতনা জাগরিত করে তুলেছে। তার যাবতীয় যোগ্যতা ও সম্ভাবনার বীজকে উৎকর্ষ দান করে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে কাজে লাগানোর সাথে সাথে পরকালের জীবনের সাফল্যের লক্ষ্যে তার সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলে তাকে করেছে মহান। তাকে পরিণত করেছে পরোপকারী বন্ধুতে। এইভাবে বস্তুগত প্রয়োজন ও মানবতার উৎকর্ষ সাধন দু'টির ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপে মানুষ হয়েছে সুন্দর, হয়েছে মহান উদ্দেশ্য সাধনকারী।

এ কারণেই ইসলাম বস্তুশক্তি ও মনের শক্তি এ দু-এর মধ্যে ভারসাম্য ও সহাবস্থান পয়দা করেছে এবং এ দু' শক্তিকে বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। মানুষকেও সুযোগ করে দিয়েছে যে, সে পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকাকালীন তার প্রয়োজনীয় সবকিছু আহরণ করুক, ব্যবহার করুক এবং ব্যবহারিক এসব প্রয়োজনীয় খাতিরে বিভিন্ন আবিষ্কারে মনঃসংযোগ করে মানুষের জীবনকে আরো উন্নত এবং সমৃদ্ধ করুক। তাকে রাষ্ট্র-পরিচালনা করতে, সমাজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের খনিজ সম্পদ, পাহাড়-পর্বতের মধ্য থেকে আহরিত উদ্ভিদ এবং সাগর-মহাসাগরের তলদেশ থেকে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে মানুষের খিদমতে পেশ করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আন্তদেশীয় মানুষকে পরস্পর আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ ইসলাম করে দিয়েছে।

কিন্তু তাই বলে ইসলাম এ অনুমতি দেয় না যে, মানুষ বস্তু বা তার প্রয়োজনকে এত বেশি গুরুত্ব দেবে যে, তার মনের আবেগ-অনুভূতি, ভালবাসা, শুভেচ্ছা-বিনিময় পারস্পরিক মেলামেশা এবং পরকালীন জীবনের সুখ শান্তির কামনা মন থেকে তুলে দিয়ে শুধু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং তা পাওয়ার প্রতিযোগিতায় পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসবে। দয়া-মায়া-মমতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পরোপকারের মনোভাব দূরীভূত হয়ে গড়ে উঠবে বস্তুলাভের হিংস্র প্রতিযোগিতা। চিরদিন বেঁচে থাকার অলীক অভিলাষে যোগ্যতমের উজ্জীবন (Survival of the Fittest)-এর অনুভূতিকে উস্কিয়ে দেয়া হবে এবং মানবতা প্রদর্শন ও সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সহানুভূতির স্থান দখল করে নেবে হিংসা বিদ্বেষ ও অপরকে বঞ্চিত করে, প্রয়োজনে হত্যা করে সব কিছু নিজে ভোগ করার কদর্যতাকে, এটা ইসলাম কিছুতেই বরদাশত করে না।

প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মানুষকে যত বিষয়ে ইসলাম হেদায়েত দিয়েছে তা সবই তার স্বভাব বা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে যেমন একদিকে রয়েছে এক কঠিন বাস্তবতা যা মানুষের জন্য (সাধারণ দৃষ্টিতে) একটু কষ্টকর বলে মনে হয় তেমনি রয়েছে পরম সৌন্দর্য যা তাকে পৃথিবীর প্রেমে আকৃষ্ট রাখে। পাহাড়ের দিকে তাকালে এক দিকে যেমন মনে হবে যে, এটা কঠিন শিলার এক একটি বিশাল স্তূপ, অপর দিকে এর গঠন প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য রয়েছে যা মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে এবং এ কারণেই পর্যটকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এগুলোতে আরোহণ করে থাকেন। আপনি পবর্তমালার যে কোন উঁচু শৃঙ্গে আরোহণ করলে দেখবেন কোথাও স্বচ্ছ শুভ্র বরফে ঢাকা গিরিশ্রেণী। আবার কোথাও দেখবেন সবুজের বিপুল

সমারোহ; নীচের দিকে তাকালে দেখবেন থরে থরে নেমে গিয়েছে নিম্নভূমির দিকে কোন এক সুনিপুণ শিল্পীর সযত্ন হাতে গড়া সুবিশাল সিঁড়িগুলো। আবার আপনি দেখতে পাবেন উচ্চতম শৃঙ্গের পাশে পাশে অসংখ্য পর্বত-মালা পানিতে ভর্তি মেঘে আবৃত, আরও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকান, দেখবেন দিগন্তব্যাপী রং-বেরং-এর বৃক্ষ-লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুল ও ফলের মহামেলা, যার সুরভিতে গোটা পরিবেশ মৌ মৌ করছে। এমন মনোরম পরিবেশে আপনি যদি একাকী থাকেন তাহলে আপনার উদাস মনে জেগে উঠবে ঐ মহামহিমের অস্তিত্বের এক অনুপম স্নিগ্ধ ঝলক যিনি এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন বিশ্বজোড়া এই মনমোহিনী বাগিচাকে। এই বাগিচার বৃক্ষগুলো যেমন বিভিন্ন তেমনি তাদের পত্ররাজির বৈচিত্র্য ও রকম-বেরকম পুষ্পরাজির হাতছানি আপনাকে নিয়ে যাবে সেই মহাসত্যের সন্ধানে, যাঁর সম্মিলনের আশায় আপনি হবেন এক দিওয়ানা। এ পরিবেশ নিশ্চল ও নির্জীব নয়। এ নির্জন পরিবেশের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন নানা জাতের, নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির পক্ষীকুল ও জীব-জন্তুর বিপুল সমাবেশ এদের সন্নিধানে আপনার নিজেকে আর একাকী মনে হবে না। আপনার অজ্ঞাতে কখন এদের সবার সাথে আপনি একাকার হয়ে যাবেন, নেচে গেয়ে তারা জানাবে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ।

মোট কথা, প্রকৃতির যে দিকেই আপনি তাকান না কেন, সেখানে একদিকে যেমন আপনার নজরে পড়ে প্রাণহীন কিছু জড়পদার্থ, আবার তারই মধ্যে আপনি অনুভব করবেন চির-যৌবনময় প্রাণের মনোরম স্পন্দন। সৌন্দর্যের এ বিশ্বমেলায় আপনি মানুষ, সৃষ্টির সেরা, আপনি কি শুধু বস্তুসর্বস্ব, আপনার মধ্যে কি নেই সৌন্দর্যবোধ, সুন্দরের এই মেলায় আপনিই কি একমাত্র সৌন্দর্যহীন এক নিশ্চল, নিথর জড়বস্তু? না, না একথা আপনি বলতে পারেন না, কেননা আপনি তো সবকিছু থেকে সবার মধ্যে বিশিষ্ট, সবার মধ্যে সেরা সুন্দর। এ কথা তো একমাত্র সেই বলতে পারে যে আপন ভোলা, যে নিজের খবর রাখে না। রাখতে চায় না, যে নিকৃষ্ট জীবজন্তুর স্তরে নিজেকে নামিয়ে দিত বরং তার থেকেও অধম হয়ে গিয়েছে।*

---

* প্রকাশ থাকে যে, অনুবাদকের নিজের চোখে দেখা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রের এ বিপুল সমারোহ কিন্তু সুউচ্চ পর্বতরাজির বরফে ঢাকা রং বেরং-এর পাথরে গড়া এ বিশাল রাজ্যে নেই কোন হিংস্র প্রাণীর অস্তিত্ব যা আপনাকে ভীত সন্ত্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত করে। সেখানে আপনি একা আপনার প্রতিবেশী সেখানে কদাচিত পরিদৃষ্ট হবে কিছু রংবেরং-এর পক্ষীকুল যারা আপনাকে হাতছানি দিয়ে আহবান জানাবে এ সুবিশাল বাগানের মালিকের দিকে। আসুন আরও দেখুন রূপ-মাধুরীর আর এক রঙ্গমঞ্চ। মহাসাগরের বুকে ভেসে রয়েছে ফুলে ফলে সুশোভিত, রূপে-রসে গন্ধে ভরা তরঙ্গভিঘাতে স্নাত মহাসুন্দরের হাতে গড়া অনুপম বাগ-বাগিচাগুলো। এগুলো দেখে অবশ্যই আপনি মুগ্ধ হবেন।

কিন্তু তাই বলে এই মহাশিল্পমেলার মহাশিল্পী তাঁর সুন্দরতম শিল্পের অবমূল্যায়নে তুষ্ট থাকতে পারেন কি! না, কখনো নয়। যুগে যুগে, দেশে দেশে, তিনি আপন ভোলা এ মানুষকে তার উপযুক্ত মর্যাদার আসনে সমাসীন করাতে পাঠিয়েছেন শিক্ষাদাতা প্রতিনিধিদেরকে মানুষ বানিয়ে মানুষের আসল চেহারা ফুটিয়ে তুলতে। সেই শিক্ষাদাতাগণ ইসলাম-রূপ সেই শিক্ষার আলোকে টেনে তুলেছেন তাকে সংকীর্ণতার গহীন গহবর থেকে মর্যাদার সুবিশাল প্রান্তরে। তাই ইসলামের সেই মহান স্পর্শ তাকে করেছে মহান। করেছে উদার, করেছে সবকিছুর ব্যাপারে সুন্দর। তাকে বস্তুর সংকীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্ত করে পূর্ণ সৌন্দর্যের ময়দানে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে; ভুল-ভ্রান্তির নাগপাশ কাটিয়ে, দোষ ত্রুটির আবর্জনাকে ঝেড়ে মুছে ফেলে তাকে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছে, তার চিন্তাকে করেছে পরিশুদ্ধ। তার আবেগ আকাঙ্ক্ষাকে করেছে মর্যাদাপূর্ণ এবং এইভাবে মহান স্রষ্টার পরিকল্পনা মাফিক أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (সুন্দরতম সৃষ্টিতে) সে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলেছে, তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তার সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের জন্য প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক জিনিষের এমন বিবরণ ইসলাম পেশ করেছে যা চেতনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বেহেশতের বিবরণ দিতে গিয়ে নবী (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ

"সেখানে এমন মূল্যবান নেয়ামত দান করা হবে যা না কোন দিন কোন চোখ দেখেছে, না কোন দিন কোন কান শুনেছে আর না কোন অন্তর সে সম্পর্কে কোন কল্পনা করতে পেরেছে।"

এই পবিত্র হাদীসটি মহা সুন্দরের তৈরি সৌন্দর্যের যে ধ্যান-ধারণা দিয়েছে তা চিরদিন বিশ্ব মানবতার নিকট চরম আকর্ষণ ও পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তুরূপে বিবেচিত হবে। আর সৌন্দর্যের প্রতি এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই লক্ষ্যহীন নয়। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার সৃষ্টির কোন কিছুকেই উদ্দেশ্যহীনভাবে পয়দা করেন নি।

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔ (ال عمران : ١٩١)

"হে পরওয়ারদিগার! কোন কিছুকেই আপনি বেফায়দা পয়দা করেননি, নিষ্প্রয়োজনে কোন কাজ করা আপনার মর্যাদার বহির্ভূত, অতএব আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিন।' (আলে ইমরান-১৯১)

বরং পূর্ণত্ব ও সৌন্দর্যের যে পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে শিক্ষ দেয়া যে, দুনিয়াবাসী যেন শুধরে যায়, তাদের মন যেন আবিলতামুক্ত হয় এবং দুনিয়ায় বসবাসকালীন তার জীবন যেন এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, সে পৃথিবীর এই পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এটা

তাকে যেন এ নশ্বর জীবনসর্বস্ব সংকীর্ণ জীবে পরিণত না করে। বরং প্রশস্ত আকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যেন তার অন্তরাত্মা বিচরণ করে এবং প্রতি কাজ, কথা, চিন্তা ও ব্যবহারের ব্যাপারে তার লক্ষ্য যেন হয় আখিরাতের প্রতিদান, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে ক্ষমা পাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের ইয়াদগারীতে তার মন যেন সদা পরিপূর্ণ ও সুন্দর হয়, আর এ দু' লক্ষ্য একত্রিত হয়ে সে যেন সকল ব্যাপারে সংশোধিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ

ইন্দিয়গ্রাহ্য বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ মানুষের এ দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর সম্পূরক এবং এ দুটি একত্রিত হয়ে মানুষের গতিপথ নির্ধারণ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবাদের সম্পর্ক মানুষের অনুভূতি শক্তি শিরা-উপশিরা ও রক্তমাংসে তৈরি অংগ-প্রত্যঙ্গ এবং এগুলো সঞ্চালনে বাস্তব কাজের সাথে রয়েছে; অপর দিকে অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিতভাবে কিছুই জানে না, সে জিনিসটি কি এবং এর অবস্থান কোথায়। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, এটা একাকীভাবে অনুভবযোগ্য এক কাল্পনিক শক্তি যার দ্বারা মানুষ বিশ্বরহস্য ও আধ্যাত্মিক জগতকে বুঝতে পারে, বুঝতে পারে শ্রেষ্ঠত্ব কি এবং কিসের মধ্যে নিহিত, উন্নত গুণাবলী কি এবং সত্য ও সুবিচার কি, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য মহৎ গুণাবলীর পরিচয়ইবা কি।

জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxlay) তার রচিত'আধুনিক যুগের মানুষ' পুস্তকে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শিরোনামে লিখছেনঃ

মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান এবং অত্যন্ত স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার চিন্তা ও কাল্পনিক শক্তির অধিকারী হওয়া। এ বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্যের কারণে তার মধ্যে যে গুণগুলো প্রকাশ পায় তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা ও ঐতিহ্যসমূহের সঠিক মূল্যায়ন। মানুষের এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে বস্তুনির্ভর বলা যায় যতটা তার থেকে এগুলো মনস্তাত্ত্বিক বেশি। মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। ছোট-বড় ও সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে চিন্তাশক্তি রাখে,

২। মানুষের যুক্তিভিত্তিক কাজগুলোর সাথে চিন্তাসমূহের ঐক্য দেখা যায়; অথচ জীব-জন্তুর বুদ্ধি ও কাজের মধ্যে পার্থক্য নজরে পড়ে।

৩। মানুষের মধ্যে গোত্রীয় জাতীয় ও দলীয় ঐক্য গড়ে উঠে এবং মানুষ বিভিন্ন দল ও গোত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়ে তোলে এবং সেগুলো মেনে চলে। মানব সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা থেকে মানব সৃষ্টি পর্যন্ত যতগুলো স্তর পার হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে কয়েকটি চিনিষ বুঝা

যায়, যা জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। সেগুলোর মধ্যে অংক শাস্ত্র, গান গাওয়ার যোগ্যতা, শিল্প কারখানা গড়ে তোলার যোগ্যতা, ধর্মানুভূতি ও পারস্পরিক মুহাব্বাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু চিন্তা ও ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিকতা কম বেশি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। এ দুটি জিনিষের মধ্যে যে জিনিষটি দ্বারা মানবতা প্রকাশ পায় এবং যার দ্বারা ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র গড়ে উঠে এবং যা অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না। তাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি। এ শক্তিই সেই নূর যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি রহস্য এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয়। বিংশ শতকের বস্তুবাদ এই অনুভূতিকে খতম করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সব কাজ করছে যে সব কার্যকলাপের কারণে মানুষ ও পশুর মধ্যকার পার্থক্য দূর হয়ে যায়।

আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে বস্তুর অভ্যন্তরে যে শক্তি নিহিত রয়েছে তার ব্যবহার শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও গবেষণার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের জগৎ খুবই ব্যাপক ও প্রশস্ত এবং প্রতিদিনেই নুতন নুতন আবিষ্কার হয়ে চলেছে ও তার সাথে মানুষেরও উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। কিন্ত অভ্যন্তরিণ শক্তি, যার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাথে, তা একমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়, আকীদা বিশ্বাস, মানুষের গুণ বৈশিষ্ট্য চরিত্র ও উন্নত মূল্যবোধের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে।

যদিও আধুনিক যুগে প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য চেষ্টা বেড়েই চলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জগতে বিচরন করতে গিয়ে পশুত্ব স্বভাব ও বস্তুসর্বস্বতাই মানুষকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, এর বাইরে মানুষ আর কিছুই চিন্তা করতে পারছে না। বস্তু শক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে মানবিক মর্যাদাবোধ, সচরিত্রতা ও মানবতার বিকাশ এমনভাবে ব্যাহত হচ্ছে যে, বস্তুর এই উৎকর্ষ মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না। ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাবে যেসব উন্নতমানের বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে পয়দা হয়, চারিত্রিক যে উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং মানবতার যে মূল্যবোধ জাগরিত হয় এসব কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে আসলে এগুলো নিজ বৈশিষ্ট্যগুলোতে হারিয়ে ফেলে অতীত জাহেলী যুগের বস্তুসর্বস্বতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এভাবে মানুষ যত বেশি মানবিক গুনগুলো পরিহার করে চলেছে ততবেশি বস্তুবাদিতা ও পশুত্বের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ - (الاعراف : ١٧٥-١٧٦)

"আর হে নবী! তাদের নিকট ঐ লোকের অবস্থা বর্ণনা কর যাকে আমি (মহান আল্লাহ) আমার আয়াতসমূহের জ্ঞান দান করেছিলাম, কিন্তু সে এ আয়াতগুলোর নির্দেশ অমান্য করে পালিয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পেছনে লেগে গেল। অবশেষে সে ভুল পথের পথিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। আর, আমি চাইলে ঐ আয়াতগুলো দ্বারা তাকে সম্মানিত করতাম, কিন্তু সে তো পৃথিবীর জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরন করতেই থাকল। এ কারণে তার অবস্থা এমন কুকুরের মত হয়ে গেল যাকে আঘাত করলে জিহ্বা ঝুলিয়ে থাকে, আর আঘাত না করে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে থাকে।"

ইসলাম প্রতি ব্যাপারেই মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতার মূল্য দেয় এবং তার বুদ্ধি ও কর্মশক্তি অনুসারে তার উন্নতি করতে চায় ও যথাযথভাবে তাকে সম্মানিত করে। কোন পর্যায়ে গিয়ে ইসলাম হঠকারিতা বা যুক্তিহীনতাকে প্রশ্রয় দেয় না বরং ইসলাম জাহেলিয়াতকে মিটিয়ে দিয়ে মানবতাকে প্রকৃতি ও সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করে এবং এ প্রগতির প্রশ্নে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভূতি প্রত্যক জিনিষের প্রতি খেয়াল রাখে।

ইসলামে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় স্বাদসমূহ গ্রহণ করাকে সমম্পূর্ণভাবেই জায়েজ করা হয়েছে

ইসলামের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়জাত যত প্রকার স্বাদ আছে সবই জায়েজ। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং অন্যান্য যতপ্রকার স্বাদযুক্ত জিনিষ এবং সর্বপ্রকার ঐ আরাম আয়েষের বস্তু যা ব্যষ্টি ও সমষ্টির জন্য কোন প্রকারে ক্ষতিকর নয় তা সবই জায়েজ। যে সকল জিনিষ মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আবিষ্কার করে চলেছে সেগুলো যদি মানবতাবোধকে আহত না করে, তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও জনকল্যাণের পরিপন্থী না হয়, যদি তার মন-মানসিকতা ও অনুভূতি নিচয়কে সুশৃঙ্খল রাখার ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি না করে এবং তার মধ্যে বিরাজিত পাশবিক বৃত্তিকে উস্কিয়ে না তোলে তাহলে সে সব জিনিষকে কোনভাবেই ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। কারণ ইসলাম মনে করে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে তরান্বিত করার জন্য ঐ সব নির্দোষ আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম মানুষকে সুপ্রশস্ত এবং পূর্ণাংগ এক আকীদা বিশ্বাস দান করেছে। এই আকীদা বিশ্বাসকে মানুষের অন্তরের কাছে গ্রহনযোগ্য করে তুলেছে। এবং তার দ্বারা মানুষের সুপ্ত মানবতাবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। সে আকীদার দাবী হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একত্বকে মনে প্রাণে গ্রহন করে তার পূর্ণ আনুগত্য করা, একথা বিশ্বাস কর যে

আল্লাহ পাকপরওয়ারদিগারই গোটা বিশ্বকে সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হিসবে পয়দা করেছেন এবং সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। জমীনের বুকে সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা, তার জন্য আমরণ চেষ্টা সংগ্রাম করা এবং সংশোধনীর মন ও আল্লাহ ভীতির হৃদয় নিয়ে সত্যাশ্রয়ী একটি দল গড়ে তোলাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করার জন্য প্রতি মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছ যাতে করে এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে এমন এক সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র সমাজ গড়ে উঠে যার প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করবে এবং তার নাজিল করা নির্দশনাবলীকে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতনামা হিসেবে মেনে নেবে এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ হুকুমগুলো পালন করে ধন্য হবে।

এই চিরন্তন বিশ্বাসের ছায়াতলে গড়ে উঠা জিন্দেগী এমন শান্তিপূর্ণ এবং খুশীতে ভরা যে, দুনিয়ার অন্য কোন স্বাদ তার সমকক্ষ হতে পারে না। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আল্লাহপাকের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং মানুষের মধ্যে বেশি প্রশস্ততা ও উদারতা সৃষ্টি হয় যে, সে গোটা বিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়। এই ঈমানই তাকে নশ্বর জীবনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার পরিবর্তে এক বৃহত্তর ও উন্নততর জীবনের সুসংবাদ দেয়।

আজকের জামানায় যেভাবে সৃষ্টি রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে চলেছে তাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো এ সত্য প্রমানিত করেছে যে আনবিক শক্তির অনুসন্ধান এবং সৃষ্টির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের এ আকর্ষণই এমন এক সত্য বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর ইতিহাসে এক অনবদ্য সংযোজন। এর ফলে শীঘ্র মানুষ জানতে পারবে যে বস্তু ও তত্বের মধ্যে পার্থক্য করা বৃথা এবং প্রকৃত পক্ষে গোটা সৃষ্টি হচ্ছে সদা সঞ্চারণশীল শক্তিসমূহের সামষ্টিকরূপ। এ সমষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ খতম হয়ে গেলেই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রলয় সংঘটিত হয়ে যাবে। সৃষ্টির এ শক্তি নিচয়ের মধ্যে মানুষ একটি শক্তি যার উপর সৃষ্টির সবকিছু এবং আল্লাহর ইচ্ছা প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। আর এ কারণেই যখন দেখা যায় মানুষ আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল হয়েছে তখন প্রকৃতপক্ষে সে মহাসংবাদ বাহক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর আনীত অহীকে কার্যকরী করতেই লেগে গিয়েছে এবং যখন সে আন্তরিকতা ও মহাব্বাত নিয়ে সৃষ্টির দিকে এবং ভ্রাতৃত্বের আবেগ নিয়ে মানুষের দিকে রুজ্জু করেছ তখনও সে সেই পবিত্র অহীবাহকের অহীকে সত্যে পরিণত করেছে এবং একথা প্রমান করেছে যে, সৃষ্টির সব কিছু পরস্পর পরস্পরের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জালে আবদ্ধ এবং সবিকিছু মিলে এক সচল মহাশক্তি যার একটি অংশ হচ্ছে এ মানুষ।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সৃষ্টির একটি অপরিহার্য অংগ

মানুষ সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান মহাশক্তির একটি অংশ হওয়ার ফলে তার মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তাও সৃষ্টির অংশ, যেমন সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা ও দৃঢ়তা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক যে উন্নত মানের মূল্যবোধ রয়েছে যেমন সত্য, ইনসাফ, সৌন্দর্য এবং দক্ষতা এসবকিছুই এ বিশাল সৃষ্টি ও মানুষের অস্তিত্বের অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে। মানুষ নিজেই এ মহাসৃষ্টির এমন একটি অংশ যা প্রকৃতির সবকিছুর সাথে সমান্তরালভাবে চলছে এবং প্রকৃতির নিয়মের সাথে অংগাঙ্গিভাবে জড়িত। যখনই সে ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ঐ সকল উন্নত মূল্যবোধ থেকে দূরে চলে যায় তখন সে প্রকৃতির অমোঘ বিধান থেকেই দুরে চলে যায় এবং সৃষ্টির মূল শক্তি থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ গতীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, কুপ্রবৃত্তির বিভিন্ন চাহিদা তাকে গিলে ফেলে এবং তখন সে নানা প্রকার যৌন আবেগের মরিচীকার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

এইই হচ্ছে জীবনের ঈমানী ধ্যান-ধারণা, যাকে কালের আবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান একটি বাস্তব সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে এবং ইসলাম সেই ঈমানী চেতনাকে মূল নীতি ও কাল্পনিক শক্তির মূল খোরাক হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামে এটা শুধুমাত্র একটি সাধারণ চেতনা নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ চেতনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সংশোধন করা এবং আল্লাহ-প্রদ ও প্রকৃতির সংগে একে সামঞ্জস্যশীল করে তোলা।

ইসলাম ইন্দ্রিয়াতীত (ফেরেশতা ও আত্মা সম্পর্কিত) বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য জোরালো আহ্বান জানায়, কিন্তু এ চিন্তার ফলে তার মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও কাজের প্রেরণা বৃদ্ধি পাওয়াই কাম্য। এ নয় যে, শুধু দার্শনিক চিন্তা ভাবনায় মানুষ মেতে থাকবে, আর বাস্তব কাজকর্ম ও কর্তব্যানুভূতি বিলুপ্ত হবে। এ জ্ঞান গবেষণায় তার বুদ্ধি সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়ে তারা ঈমানকে মজবুত করবে, নেক কাজ ও জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

নীচের আয়াতগুলোতে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ط سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

(العمران: ۱۹۰ـ۱۹۱)

"নিশ্চয়ই আকামশগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পর্যায়ক্রমে

(শীত ও গ্রীষ্মের সময়ে) আগমনের পার্থক্যের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে (স্রষ্টাকে চিনবার জন্য) বহু নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। যারা উঠতে, বসতে ও বিছানায় শয়নকালে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও বলে উঠে যে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আপনি এগুলো বৃথাই সৃষ্টি করেননি, আপনি কাজ করা থেকে পবিত্র। অতএব, আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাচিয়ে নিন।" (আল ইমরাণ ১৯০-৯১)

এর জওয়াবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোয়া কবূল করতে গিয়ে বললেন ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اَنِّى لاَ اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثىٰ - بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - (آل عمران : ٩٥)

"তোমাদের মধ্যকার কোন নেক কাজ করনেওয়ালার নেক আমলকে আমি নষ্ট করি না, তা সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন। তোমরা তো একে অপরের মধ্য থেকে ও এক সৃষ্টির উপাদান থেকেই সৃষ্টি।" (আলে ইমরাণ-৯৫)

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - (الـــروم : ٣٠)

"আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মানুষের এই প্রকৃতি (এর উপরেই তোমরা টিকে আছ) আল্লাহর সৃষ্টির এই নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এ টিই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।" (রুম-৩০)

একাদশ অধ্যায়
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত (অদৃশ্য) জিনিষের প্রতি ঈমান

এ দু'টি বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে একই সাথে বিরাজ করে, কেননা, সে দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষকে যেমন বিশ্বাস করে তেমনি যা দেখে না সেগুলোকেও বিশ্বাস করে, অথচ জীবজন্তু দৃশ্য, অদৃশ্য, কোন জিনিষকেই বিশ্বাস করে না। তবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষগুলোর প্রতি বিশ্বাস—এটা মানুষের কোন বড় গুণ নয়। যেহেতু দেখা জিনিষের সাথে জীবজন্তুরও কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে; মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহর দেয়া বড় নেয়ামত হচ্ছে তার মধ্যে অদেখা জিনিষের প্রতি ঈমান থাকা।

যদিও এ সত্যকে পাওয়ার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাকে কিছু সাহায্য করে, অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাও অদেখা জিনিষকে বুঝতে ও বিশ্বাস করতে সহায়তা করে। (যেমন, ইতোমধ্যে হাক্সলের বিবৃতিতে জানা গিয়েছে)। কিন্তু আধুনিক হঠকারীগণ মানুষের এ সত্যানুভূতিকে বহুলাংশে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যার ফলে সাধারণভাবে মানুষ সত্যানুভূতি থেকে দূরে সরে গিয়ে বস্তু ও হাতে পাওয়া জিনিসগুলোর সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর মধ্যে যত পার্থক্যেই থাকুক না কেন কার্ল মার্কসের (বস্তু সর্বশ্ব) মতামতকে তারা মেনে নিয়েছে। তাদের মতো পৃথিবী ও পার্থিব জীবন একমাত্র বস্তুর উপর টিকে আছে এবং মানুষের জীবন বস্তুগত জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরদিকে ইসলাম মানুষের সকল যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ঐ সকল যোগ্যতাকে আরো প্রখর করার জন্য তার মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করে। ইসলাম মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জিনিষগুলো পাওয়ার ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করে, তার যোগ্যতাকে বাড়ানোর জন্য প্রেরণা যোগায় এবং তার সামনে দিগন্ত প্রসারিত যে বস্তু জগত রয়েছে তার প্রতিটি জিনিষকে ব্যবহারের আওতায় আনার জন্য আহ্বান জানায়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বলে এবং পৃথিবীর বক্ষমধ্যস্থিত জিনিষগুলোর সুপ্ত শক্তি ভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ব্যবহা ক বিজ্ঞান (Science) পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে একথা সত্য নয়; বরং অধ্যাপক এইচ অরগব-এর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে মুসলিম মনিষীদের হাতে এবং পরে তা ইউরোপে পাচার হয়ে যায়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের পথ উন্মুক্ত হয়।

এর দ্বারা বুঝা গেল মুসলিম পণ্ডিতগণ ইসলামী বিধানের নির্দেশিকা অনুযায়ী সৃষ্টি জগত ও মানুষের মধ্যে যে প্রচণ্ড বস্তু শক্তি আছে তা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতেন। এই কারণেই তারা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করেছেন এবং এই বস্তুর সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জন্য কল্যানকর বহু জিনিষ আবিষ্কার করেছেন; যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা যে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন তা অবিস্মরণীয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেগুলো স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Medical Science) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইবনুল হায়সাম-এর চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক পাশ্চাত্য জগতে পঠিত হতে থাকল। রসায়ন শাস্ত্র ইংরেজীতে কেমিষ্ট্রি আলকেমীর নামানুসারে পরিচিত হয়। এভাবে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত শব্দগুলোও আরবীভাষা থেকেই বেশির ভাগ গৃহীত হয়েছে।

ইসলাম ও মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ

ইসলাম মানবীয় অনুভূতিকে দুনিয়ার বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলো বুঝাবার জন্য আহ্বান জানায় এবং আল্লাহ্পাকের ক্ষমতা ও তার সৃষ্টি রহস্য অবলোকন করে তার সত্বার সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহিত করে যাতে মানুষ নিজেকে সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পারে। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনপাকে তার চোখ, কান ও জিহ্বার শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যেমন, দৃষ্টি শক্তির সাথে সম্পর্কিত কুরআনের বাণী ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ـ (الرعد : ٢)

"আল্লাহ তায়ালা সেই সত্বা যিনি আকাশমণ্ডলীকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন তোমাদের চোখে মালুম হতে পারে এমন খুঁটি ছাড়াই।" (রা'আদ-২)

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ـ (الغاشية : ١٧ ـ ٢٠)

"ওরা কি উটের দিকে তাকিয়ে দেখে না, ঐ বিরাট জন্তুকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এত বড় হওয়া সত্ত্বেও কেমন মানুষের পোষ মানে, উত্তপ্ত মরুতে কেমনে চলে, তার পেটের মধ্যে রক্ষিত পানির থলি থেকে মানুষ কেমন করে, পানি বের করে জান বাঁচায়)। ওরা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে না কেমন করে একে শূন্যে তুলে রাখা হয়েছে, তারা কি পাহাড়গুলোর দিকে দেখে না, কিভাবে এগুলোকে গেড়ে রাখা হয়েছে, আর পৃথিবীর দিকেও কি নজর দিয়ে ওরা দেখে না কেমন করে এর সমতল ভূমিতে মানুষের জন্য বাসোপযোগী করে রাখা হয়েছে। (গাশিয়া-১৭-২০)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْـوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ـ (النور : ٤٣)

"তুমি কি দেখছ না যে, আল্লাহ্ তায়ালা মেঘকে ধীরে ধীরে চালান, তারপর মেঘের টুকরাগুলোকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে ঘনীভূত মেঘে পরিণত করেন, অতঃপর তোমরা দেখ সেই মেঘ থেকে ফোটা ফোটা বৃষ্টি নেমে আসে।"(নূর-৪৩)

اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ـ (الانعام : ٩٩)

"গাছে ফল যখন ধরে তখন তা কেমন অবস্থা ধারণ করে এবং যখন তা পাকে তখন তা সুন্দর দেখায় তা একটু খেয়াল করে দেখ।"(আনয়াম-৯৯)

শুনার শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ ـ (الرعد :١٣)

"বাদলের গর্জনও তাঁর প্রশংসাগাথা গাইতে গিয়ে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে।"(রাআদ-১৩)

اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ـ (البقرة : ١٩)

"অথবা তার উদাহরণ হচ্ছেঃ আকাশ থেকে প্রবলর বর্ষণ হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘন অন্ধকার, মেঘের গর্জন এবং বিজলীর চমক।" (বাকারা-১৯)

بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ـ (الحاقة :٦)

"এবং আদ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হলো এক ভীষণ ঘুর্ণিঝড় দ্বারা।"

(রাআদ-৬)

وَنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَّ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ـ (الرعد :٤)

"ঐ খেজুরগাছগুলো একই পানির ঝর্ণাধারা থেকে সিঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক এক কাণ্ডবিশিষ্ট আছে, আর কিছু সংখ্যক রয়েছে একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট, একটির উপর অপরটির বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে দিয়েছি।" (রাআদ-৪)

نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ ـ

(النحل : ٦٦)

"তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে নির্গত খাটি দুধ তোমাদেরকে পান করাই যা সহজেই ও তৃপ্তির সাথে পানকারীদের গলার নীচে নেমে যায়।" (নাহাল-৬৬)

এইভাবে ইসলাম শারীরিক প্রত্যেক অনুভূতশীল অংগকে সঠিক সময়ে সজাগ ও সতর্ক করে এবং তাঁকে জীবিকার উপায় সম্পর্কে রাস্তা দেখায়। মানুষের উপকারার্থে যত প্রকার বস্তুগত উপায়-উপকরণ থাকতে পারে সেগুলো ব্যবহার করতে তাকে উৎসাহিত করে। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সৃষ্টির পরতে পরতে যে সকল দৃষ্টান্ত বা চিহ্ন রয়েছে সেগুলো দেখে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার অগম্য সৃষ্টি রহস্য গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীরা নিত্য ও নিকটতর সত্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-গবেষণা নিয়ে দিবারাত্র পেরেশান এবং আত্মার অস্তিত্বকেই এই অজুহাতে অস্বীকার করেছে যে, তা চর্ম চোখে দেখা যায় না বা কানে শোনা যায় না বা স্পর্শ করে অনুভব করা যায় না। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার ধ্বজাধারীরা চোখের ধরা-ছোয়ার বাইরে হওয়ার কারণে আল্লাহকেই অস্বীকার করে ফেলেছে। আর আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অনুভূতি বা কল্পনারও উর্ধ্বে, ফলে ধ্যান-ধারণারও বাইরে তার কোন গুরুত্ব তাদের নিকট নেই।

اَنْ يَقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَذِبًا ـ (الكهف : ٥)

"যে ভীষণ কথা ওরা বলে তা জলন্ত মিথ্যা" (কাহাফ-৫)

আধুনিক জাহেলিয়াত ঃ অভিশাপের জালে আবদ্ধ এক মতবাদ

আধুনিক জাহেলিয়াত এমন এক নিকৃষ্ট অভিশাপের জালে আবদ্ধ হয়ে আছে যে, মানবেতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত এই ধরনের জালে পড়েনি। কারণ, প্রাচীন জাহেলিয়াতের জনগণ তো অনুন্নত অবস্থা, অজ্ঞানতা ও বুদ্ধির কমতির শিকার ছিল, কিন্তু আজকের জাহেলিয়াতে তো জ্ঞান সমৃদ্ধ। উন্নতির শিখরে আরূঢ় এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের নিশানবর্দার বলে পরিচিত। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছেঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ـ (الروم : ٧)

"ওরা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক জিনিসগুলোই জানে, কিন্তু অন্তর্নিহিত ও পরবর্তী জিনিস সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ বে-খবর।" (রুম-৭)

আত্মাকে বিশ্বাস না করায় এবং আল্লাহ ও আখিরাতকে অস্বীকার করার দরুণ পাশ্চাত্যবাসী অবনতির সীমাহীন গভীরে পতিত হয়েছে। তারা চরিত্র, রাজনীতি এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে পুরাপুরি হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়েছে। বস্তুর লালসা বা পেট পুঁজার মনোভাব মানুষের মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে, "নগদ যা পাওয়া হাত পেতে

নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।" এর প্রবণতা তাদেরকে এমন পশুতে পরিণত করেছে যে, পৃথিবীর হিংস্রতম পশুও তা দেখে লজ্জা পায়। মানুষের অবনতি এতটা বেশি হয়েছে যে নজর ফেললেই দেখা যায় সর্বত্র মানুষ মানুষের গলায় ছুরি চালাচ্ছে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে ও তৃতীয় চরম ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধ সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। সর্বত্র লুঠ তরাজের বাজার গরম, মানুষ তার অনিরুদ্ধ চাহিদা ও বিলাসিতার দাবী মেটানোর জন্য পাগলপারা হয়ে ছুটছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও লোভ লালসা চরিতার্থ করার অদম্য প্রয়াস মানুষকে এমনভাবে পেরেশান করে ফেলেছে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরন্তর অস্থিরতার ব্যাধিতে ভুগছে। স্বার্থের টানাপোড়ন তাদেরকে এমন এক অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত করেছে যে, তাদের দিবা রাত্রির আরাম হারাম হয়ে গিয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের জন্য এ অবস্থা কত মারাত্মক ও ধ্বংসকর তা একটু চিন্তা করলেই যে কোন মানুষ বুঝতে পারে। কিন্তু আফসোস্ এ বিষয়ে সামান্যতম চিন্তার অবসরটুকুও মানুষের নেই। এসব কিছুর পেছনে মূল কারণ হলো আল্লাহর ও আখিরাতের উপর অবিশ্বাস, আত্মাকে অস্বীকার এবং যা দেখা যায় না তাকে মানতে না চাওয়ার মনোবৃত্তি।

ইসলাম স্বভাব প্রকৃতির ধর্ম এবং মানুষের সংগত জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে এটা তার পদস্খলনকে সর্বোতভাবে দমন করেছে এবং অদেখার প্রতি ঈমানকে মুমিনদের প্রথম গুন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কারণ স্বয়ং আল্লাহপাকের অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং পুরাপুরি তার সম্পর্কে অনুভব করেই তার সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

الٓمٓ ط ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - (البقرة : ١-٢)

"আলিফ, লাম, মীম ঐ কিতাব (যা তোমাদের নিকট বর্তমান) তার মধ্যে সন্দেহ বলতে কোন কিছুই নেই, তা ঐ সকল লোকদের জন্য হেদায়েত যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমি মহান আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তার থেকে তারা খরচ করে।" (বাকারা-১-৩)

কুরআনে কারীমে শয়তানের উল্লেখ

কুরআনে কারীমে ঈমান বিল গায়েব (না দেখে বিশ্বাস করাকে) ঈমানের অন্যতম মূল শর্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, ঈমানই মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি, কারণ, ঈমান না থাকলে মানুষের জীবন সোজা পথে চলতে পারে না। যেমন ঈমান না থাকার কারণে পাশ্চাত্য জাহেলী সমাজে মানুষের জীবন দুর্বিসহ পথে অগ্রসর হচ্ছে-যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

যদিও আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আখিরাতের বিশ্বাসের উপর ঈমান আনা ইসলামের মৌলিক আকীদার অন্তর্গত এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এ ঈমানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে ইসলাম শুধু ঈমান বিল গায়েবকেই যথেষ্ট মনে করেনি, বরং ফেরেশতা, জ্বিন ও শয়তানের উল্লেখ করে ঈমান বিল গায়েব হাসিল করার যোগ্যতাকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে এবং শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার ক্ষতিকারকতা থেকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ

اِنَّهٗ يَرٰاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ـ (الاعراف : ٢٧)

"নিশ্চয়ই সে এবং তার সঙ্গী সাথীরা তোমাদেরকে এমন যায়গা থেকে দেখছে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।"(আরাফ-২৭)

আরো বলা হয়েছে যে, শয়তান মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই আদম জাতির দুশমন এবং সে মানুষকে সত্য-সঠিক পথ থেকে সরিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে এবং যাতে করে মানুষ জান্নাতে যাওয়ার সরল পথ ভুলে গিয়ে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করে তার জন্য তাকে সারাক্ষণ প্ররোচনা দিয়েই চলেছে।

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّـى جَارٌ لَّكُمْ ج فَلَمَّـا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّى بَرِىْءٌ مِّنْكُـمْ اِنِّى اَرٰى مَالَا تَرَوْنَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ ط وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ (الانفال : ٤٨)

"আর স্মরণ করে দেখ ঐ সময়ের কথা যখন শয়তান তাদের কাছে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখাল, বললোঃ আজকের দিনে তোমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার মত কেউ নেই, তারপর (যুদ্ধ বেধে গেল) দু' দল যখন পরস্পর মুখোমুখী হলো তখন সে নিজের পায়ের গোড়ালী দ্বারা পিছনের দিকে যাত্রা (About turn) করল এবং বললো, আমি তোমাদের থেকে দায়িত্বমুক্ত আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখছ না, আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি, আর আল্লাহ কঠোর সাজা দানকারী।" (আনফাল-৪৮)

وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَا سْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُوْمُوْنِى وَلُوْمُـوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ـ اِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِـنْ قَبْلُ ج اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ (ابراهيم : ٢٢)

"আর (তাদের সম্পর্কে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়ার পর শয়তান বলবে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সাথে যে (বিজয়ের) ওয়াদা করে ছিলেন তা ছিল সঠিক ওয়াদা, আর আমি যে ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছিলাম তা খেলাফ করলাম। আসলে, তোমাদের উপর আমার তো কোনই ক্ষমতা ছিল না, আমি তো (আমার কথামত চলার জন্য) শুধুমাত্র দাওয়াত দিয়েছি এরপর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে 'লাব্বায়েক' বলে উঠেছে। সুতরাং, এখন আমাকে নিন্দা করো না, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর (আজকে)। এখানে আমি তোমাদেরকে কোনই সাহায্য করতে পারব না, তোমরাও আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহ্র ক্ষমতায় যে শরীকদার বানিয়েছিলে না? আমি সে বিষয়ে আজ পূর্ণ দায়িত্ব মুক্ত (অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ্র সমকক্ষ হতে চাইনি, অথবা আল্লাহ্র ক্ষমতায় আমরা কোন অংশ আছে তাও বলিনি, তোমরা যা বলেছ বা যা করেছ তার জন্য তোমরাই দায়ী)।" (ইব্রাহীম-২২)

কুরআনে পাকে জ্বিনদের উল্লেখ ঃ

قُلْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرانًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا . وَ اَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لاَ وَلَدًا . وَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا . وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا . وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُم رَهَقًا وَ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ اَحَدًا . وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَ شُهُبًا . وَاَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْلَهُ شِهَابًا رَّصَدًا . وَ اَنَّا لاَ نَدْرِيْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ مَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا . وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا . وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِيْ الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا . وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى امَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَّ لاَ رَهَقًا . وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُوْلٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . وَاَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لاَ سْقَيْنٰهُمْ مَاءً غَدَقًا .

(الجن : ١ - ١٦)

"হে নবী বল, আমার নিকট অহী পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল গভীর মনোযোগ সহকারে (আমার কুরআন পড়া) শুনল তারপর তারা বলে উঠল, আমরা (আজ) বড়ই চমৎকার এক কুরআন, শুনেছি, যা সরল সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং সেই দিকেই যেতে আহ্বান জানায়; তা শুনে আমরা সে কথাগুলোর উপর ঈমান এনেছি, এখন আমরা আমাদের রব (প্রতিপালক)-এর সাথে কিছুতেই আর কাউকে শরীক করব না।" (এ কথাও) আমরা মেনে নিয়েছি যে, আমাদের রব-এর মর্যাদা খুবই উঁচু এবং তিনি মহা সম্মানী, তিনি কাউকেই বিবি অথবা সন্তান বানাননি। আর আমাদের মধ্যকার অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে বহু মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে, আর আমরা তো এ কথা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জিন জাতি আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছুতেই মিথ্যা কথা বলতে পারে না বা বলবে না আর জিনদের মধ্যকার কিছু লোকদেরকে মানুষদের মধ্যকার কিছু লোক ভয় করার কারণে তাদের থেকে পানাহ্ চায় যার ফলে তারা (জিনরা) ওদেরকে আরও ভয় দেখিয়েছে এবং তাদের জুলুমকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আর ওরা তোমাদের মতই ধারণা করেছিল যে, আল্লাহ্তায়ালা আর কখনও রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না। আর আমরা যখন আকাশের কিনারা বেয়ে এগিয়ে গিয়ে খোঁজ করলাম, দেখলাম সেখানে পাহারাদাররা টাপে টাপে ভর্তি এবং অগ্নিপূর্ণ তারকারাজি দ্বারা গোলবৃষ্টি করা হচ্ছে। আর আমরা ইতিপূর্বে কিছু কথা শুনে নেয়ার জন্য আকাশে কিছু যায়গা করে নিতাম। কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, চুরি চামারি করে যেকেউ কিছু শুনতে চাইবে সে দেখবে তার দিকে তাক করে নিক্ষিপ্ত আগুণের গোলা এগিয়ে আসছে। আর আমাদের একথা বুঝে আসছিল না যে, আসলে পৃথিবীবাসীদের প্রতি কোন মন্দ ব্যবহার করতে চাওয়া হচ্ছে না, বরং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে কোন কল্যাণের পথই দেখাতে চাইছেন। আমাদের মধ্যে কিছু নেক লোক আছে আর অন্য ধরণের লোকও কিছু আছে আমরা বিভিন্ন পথের অনুসারী হিসেবে বিভক্ত আছি। আর অবশ্যই আমরা এটা বুঝতাম যে, কিছুতেই আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারব না, আর পালিয়ে গিয়েও যে আমরা তাঁর হাত থেকে রেহাই পাব তাও পারব না। আর আমরা যখন হেদায়েতের কথা শুনলাম তখন তা গ্রহণ করলাম ও মুমিন হয়ে গেলাম। এখন যে কোন ব্যক্তি নিজ পরওয়ারদিগারের উপর ঈমান আনবে সে তার যে কোন হক নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হবে এবং জুলুম থেকেও বেঁচে যাবে। আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র অনুগত কিছু সংখ্যক মুসলিম ব্যক্তি আছে আর কিছু সংখ্যক সত্য বিমুখ লোকও আছে। এমতাবস্থায় যারা ইসলাম কবুল করে সত্য পথের অনুগামী হয়েছে তারাই সত্য সঠিকপথ খুঁজে নিয়েছে, আর যারা হক পথকে পরিহার করেছে তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। আর হে নবী বল! আমাকে অহীর মাধ্যমে একথাও জানানো হয়েছে যে,

লোকেরা সত্য সঠিক পথে দৃঢ়তার সাথে যদি চলতো তাহলে তাদেরকে আমি প্রচুর পরিমাণ (বৃষ্টির) পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করতাম।"(জিন ১-১৬)

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ قَالُوْا يٰقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ ـ

(الاحقاف : ٢٩)

"আর ঐ ঘটনাও উল্লেখযোগ্য যে, যখন জিনদের একটি দলকে (আমি মহান আল্লাহ্) তোমার নিকট নিয়ে এসেছিলাম যাতে করে তারা কুরআন পাঠ শুনতে পায়। যখন তারা সেই স্থানে পৌছুল (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন তারা পরস্পরকে বলছিলঃ (হে আমাদের জাতি!) খামোশ হয়ে যাও (এবং মন দিয়ে শুনো) তারপর পড়া শেষ হয়ে গেলে তারা তাদের জাতির নিকেট গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করতে করতে বললঃ হে আমাদের জাতি, আমরা একটি কিতাবের বানী শুনেছি যা মূসা (আঃ)-এর পর নাজিল হয়েছে, সে কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর বিষয়াবলীকে সত্যায়নকারী, তা সত্যের দিকে মানুষকে পথ দেখায় এবং সরল-সঠিক ও মজবুত পথে মানুষকে চালায়।"(আহকাক-২৯)

গায়েব জিনিসগুলোর উপর ঈমান রাখা মানুষের স্বভাব সংগত

ইসলাম মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, এজন্য সে তার স্বভাবের ছোট বড় সকল বিষয়েই ইসলাম থেকে হেদায়েত পায়। যেহেতু গায়েব-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এজন্য ইসলাম সেই স্বাভাবিক পথেই নিজ আকীদাকে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে প্রবেশ করায় এবং তার স্বভাবপ্রকৃতিকে জাগ্রত করে, তার প্রভাব-বলয়কে প্রশস্ত করে এবং সব দিকেই তাকে বিস্তৃত করে দেয়। আর এই মহান উদ্দেশ্যেই কুরআনে কারীম জ্বিনদের উল্লেখ করেছে যাতে করে জ্বিনদের বর্ণনা দ্বারা মানুষের স্বভাব—প্রকৃতির মধ্যে অদেখা জিনিসের প্রতি ঈমান আনা সম্ভব, সহজ মজবুত হতে পারে।

উপরে যে দুটি স্থানে জিন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ঐ সম্পর্কিত আয়াতগুলোও উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঐগুলো ছাড়া হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে জিনদের প্রসংগ এসেছে, কিন্তু ঐ সকল বর্ণনার উদ্দেশ্য জিনদের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে মানুষকে ব্যস্ত করে তোলা নয়,

বা তাদের সংখ্যা এবং তাদের চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞান-গবেষণা চালানোও নয় অথবা জিনদের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলা বা তাদেরকে কি করে বশীভূত করতে হবে তার উপায় খুঁজে বের করা বা কত শক্তি ও ক্ষমতার মালিক তারা তা নির্ণয় করাও ঐ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য কোন কোন মুসলিম ঐতিহাসিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে এ বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

আসলে জিনদের আলোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনুষের মনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার শক্তির প্রশস্ততা পয়দা করা, যাতে করে মানুষ তার অনুভূতি শক্তির সংকীর্ণ গণ্ডী পার হয়ে বৃহত্তর, প্রশস্ততর ও আরও পরিপূর্ণ সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, কারণ সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্‌র যে সকল নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার সবগুলো সম্পর্কে মানুষ নিজ অনুভূতি দ্বারা সব কিছু বুঝতে পারে না, এজন্য সেগুলো সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এও হতে পারে যে, এমন কোন সময় আসবে যখন মানুষ নিজ দৃষ্টি সীমার মধ্য সেগুলোকে পেয়ে যাবে এবং এ চাওয়া ও পাওয়া তার ঈমানকে আরও মজবুত করে তুলবে।

উপরন্তু, কুরআন মজীদে বিনা উদ্দেশ্যে জ্বিনদের কথা বলা হয়নি, বরং সে আলোচনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এ অনুভূতি দান করা যে, সৃষ্টি লোকের সব কিছু (নীরব আনুগত্যের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা গীতি গেয়ে চলেছে এবং এ কথা জানাচ্ছে যে, তিনি যে, কোন জিনিষকে পয়দা বা পরিচালনার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতার উর্ধ্বে, একমাত্র ঐ লোকরাই তাঁর কথা মানে না যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। এই কারণেই সূরায়ে 'আহক্বাফে' জ্বিনদের ঈমান আনা ও ইসলামী দাওয়াত কবূল করার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তাদের তাওহীদ বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, অথচ তাদেরই স্বজাতি শয়তান ঈমানের পরিবর্তে কুফর, অহংকার এবং বিদ্রোহের পথ ধরেছে এবং নিজের সংগী-সাথী বানিয়ে বহু মানুষকে গুমরাহ্ করে ফেলেছে।

ফেরেশতাগণও আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টি এবং আল্লাহ্‌পাকের সৃজনী ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ (فاطر :١)

"আল্লাহ তায়ালারই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক হিসেবে মুতায়েনকারী। তারা দুই, তিন ও চার পাখনা বা বাহু বিশিষ্ট, তিনি তাঁর সৃষ্টির গঠন প্রকৃতির মধ্যে যা বাড়াতে চান বাড়িয়ে দেন, অবশ্যই আল্লাহ্‌পাক সব কিছু করতে সক্ষম।" (ফাতের-১)

এ সকল ফেরেশতাই আল্লাহ্‌র বান্দাহদের নিকট অহী নিয়ে আগমন করতেন।

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - (الشعراء : ١٩٣ - ١٩٤)

"ঐ জিনিষ (কুরআন) নিয়ে তোমার অন্তরের উপর বিশ্বস্ত রুহ (জিব্রীল) নেমে এসেছে যাতে করে তুমি সতর্ককারীগণের মধ্য শামিল হয়ে যাও।" (শু'আরা ১৯৩-৯৪)

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ - (غافر:١٥)

"তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে থেকে যার উপর চান তাঁর উপর রূহ (জিব্রীল)-কে পাঠান যাতে করে সে (ঐ নবী-কে) সাক্ষাতের দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে।" (গাফের-১৫)

ফেরেশতাগণ সদা সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যে নিয়োজিত থাকে।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَ سِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - (غافر : ٧)

"যে সকল ফেরেশতা আল্লাহ্‌র আরশকে তুলে ধরে রেখেছে এবং ঐ আরশের আশে পাশে যারা রয়েছে তারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসাসহ তাঁর যাবতীয় দুর্বলতা থেকে পবিত্র হওয়ার কথা ঘোষণা করছে এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে চলেছে, বলছে হে আমাদে রব! সবকিছুর উপর আপনার রহমত ছড়িয়ে আছে এবং সব কিছু আপনি জানেন। অতএব যারা তওবা করেছে এবং আপনার পথে চলেছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাঁদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিন।"(গাফের-৭)

ফেরেশতাদের এই নিখাদ এবং নিঃস্বার্থ ঈমান তাদের পবিত্রতা ও উঁচু মর্যাদার কথা জানায় এবং তাদের জন্য মুমিনদের অন্তরে মুহাব্বতের আবেগ সৃষ্টি হয়। পরিশেষে একথা প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম ঐ সকল অনুপস্থিত জিনিষের উল্লেখ করে মানুষের ঈমানের শক্তিকে তাজা করে এবং তাদের অস্তিত্বকে পূর্ণত্ব দান করে।

দ্বাদশ অধ্যায়
ব্যক্তিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

মানুষ যে দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার একটি হচ্ছে, সে নিজের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবোধও রাখে এবং অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করার খাহেশও রাখে। আর এটা মানুষের এমন একটি বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের অস্তিত্বের এমন একটি বহিঃপ্রকাশ যা মানব জীবনে অত্যন্ত গভীরভাবে রেখাপাত করে। কারণ, সমাজের গোটা অস্তিত্বই নির্ভর করে এ দ্বিমুখী নীতি রাখার উপরে। বহু সমাজব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের ভারসাম্য না থাকায়। কোন যায়গায় ব্যক্তিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তিতন্ত্র কায়েম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এত বেশি অহংকার ও ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠেছে যে, সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং সামাজিক বলিষ্ঠতা এবং মানুষের পারস্পরিক পরামর্শের শক্তি অকেজো হয়ে গিয়েছে। আবার কখনও সামাজিক দিককে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, সামাজিক সংস্থার চাপাকলে পড়ে ব্যক্তি সেখানে মুসড়ে পড়েছে এবং সমাজের সামনে ব্যক্তি এক মূল্যহীন বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

ব্যষ্টির অত্যাধিক গুরুত্ব যেখানে, সেখানে একনায়কতন্ত্র থেকে স্বেচ্ছাতন্ত্র বা রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে, আবার যেখানে ব্যস্টির সকল যোগ্যতাকে উপেক্ষা করে সমাজকেই সীমাহীন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেখানে গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্র—এই ভুল মতবাদের কারণে ও নিয়ন্ত্রনহীন ব্যক্তিমালিকানার কারণে গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী সভ্যতা যার মধ্যে ব্যক্তি মানুষ যত খুশী এবং যেভাবে খুশী আয় করতে পারে, আবার ব্যয়ের ব্যাপারে সে যেথায়, যতটা এবং যেভাবে খুশী ব্যয় করতে পারবে। পুঁজিবাদী এই ধরণের সভ্যতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের জীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন কষ্ট। এরই প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্র। ব্যস্টির যোগ্যতা নিয়ন্ত্রনাধীন অপব্যবহারের কারণে এবং যোগ্যতমের অবস্থিতি (Survival of the fittest)-এই নীতির কারণে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্রোহের আগুণ যার পরিনতিতে সমাজতন্ত্র জন্মলাভ করেছে এবং সেটাও যখন ব্যস্টির কোন মূল্য দিতে রাজি হয়নি তখন তার বিরুদ্ধে জনমত দানা বেঁধে উঠেছে। প্রথম মতবাদের নজির স্থাপন করেছে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের

ধ্বজাধারীগণ যারা অপরকে কষ্ট দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মনোরঞ্জন করেছে। তারা সকল প্রকার চারিত্রিক নিয়ম নীতি ও নৈতিকতার সীমা লংঘন করে মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নিজেদের ব্যস্টির প্রভাবে এবং সম্পদের বিনিময়ে মানুষের তুচ্ছ মূল্যে খরিদ করে নিয়েছে। প্রকারন্তরে একে ডাকাতির ভিন্নরূপ বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। ব্যস্টির আজাদীর সীমাহীনতা তাদেরকে জঘন্য পশুত্বে পরিণত করেছে; নগ্নতা, নিষ্ঠুরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার লাগামহীন গোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে তারা সমাজের বুকে।

অপর দিকে প্রাচ্যে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ, সেখানে রাষ্ট্রের প্রভাব বলয় এত বিস্তীর্ণ যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি চিন্তা ও কাজের উপর সেখানে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে চিন্তা করার আজাদীটুকুও সেখানে নেই। একমাত্র যৌন আবেদন সৃষ্টি করে হয়ত কেউ নিজ ইচ্ছার কিছু মূল্যায়ন করতে পারে। কিন্তু সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিষয়ে কোন ব্যক্তির মাথা ঘামানোর কোন অধিকার নেই। সেখানে এটা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব মনে করা হয় যে, জনগণকে এটা যে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে চাইবে, রাখবে; তাদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়াও রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এমনকি তাদের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও বুঝশক্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। সেখানে জনগণের উপর জুলুম নির্যাতন করে এবং জবরদস্তি করে শাসন চালানো রাষ্ট্রের অধিকার বলে গণ্য করা হয়। মানুষের ঘরের মধ্যে তার স্ত্রী ও ছেলে—মেয়েকে পর্যন্ত গোয়েন্দা বানিয়ে তার মনের গোপন কন্দরের খবর নেয়া হয় এবং যদি রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে সে সমালোচনা করে বা করতে পারে মন হয় তাহলে তাকে ও তার মগজকে ধোলাই করার এমন ব্যবস্থা করা হয় যে, সেখানে নিঃশ্বাস ছাড়ারও অনুমতি থাকে না। কারণ রাষ্ট্রের সমালোচনা এমন একটি অসহনীয় মগজের কাজ যার অনুমতি পবিত্র সমাজতন্ত্র (?) সাধারণ ও মূল্যহীন মানুষকে দিতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে সত্য-সঠিক কথা হচ্ছে, ব্যক্তিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এদু'টি ব্যবস্থাই আসল, স্পষ্ট ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত নয়, এবং এদু' মতবাদের সকল মন্দ পদক্ষেপের মূলে হচ্ছেঃ এদু'টি দর্শনই সত্যের মূল দর্শন থেকে দূরে রয়েছে। এর কারণ, ব্যক্তিতন্ত্রের মধ্যকার প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে স্বার্থপরতার অনুভূতি ও ব্যক্তি-মালিকানালাভের আবেগ মজ্জাগত হয়ে আছে। যার ফলে সে সমাজকে একটি বহিরাগত জিনিষ মনে করে, যাকে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেখানে কোন ব্যক্তির ইচ্ছার কোন মূল্যই নেই, শুধু তাই নয় সেখানে সমাজতন্ত্র ব্যস্টির অস্তিত্বের পরিপন্থী ও ব্যস্টির অস্তিত্ব

ও ব্যক্তিত্বকে এটা সহ্যই করতে পারে না। আর এ জন্য ব্যক্তি মানুষের এই ধরণের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলাকে প্রত্যেক ব্যক্তি অধিকার মনে করতে বাধ্য। যখন সমাজতন্ত্রের দর্শনের মধ্যে ধরেই নেয়া হয়েছে যে, সমজাই আসল এবং সমাজের জন্য মানুষ, মানুষের জন্য সমাজ নয়। যেহেতু বাচ্চা যখন অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় পয়দা হয় তখন তার অস্তিত্বের জন্য, তার বেঁচে থাকার জন্য এবং তার সুষ্ঠু লালন-পালনের জন্য সমাজের প্রয়োজন অপরিহার্য, সমাজ না থাকলে তো বাচ্চার লালন-পালনেই সম্ভব হবে না। তারপর বাচ্চা বড় হলে প্রতি পদেই তাকে সমাজের বা অন্য মানুষের মুখাপেক্ষী হতে হবে, যেহেতু তার প্রয়োজনের সব কিছু সে নিজে নিজে যোগাড় করে নিতে পারে না। এ যুক্তিতে এটা স্পষ্ট হলো যে, সমাজই আসল এবং এর প্রয়োজন মানুষের জন্য অনিবার্য। সুতরাং সমাজকে বাঁচানোর জন্য ব্যক্তি বিশেষকে নির্যাতন করা বা তার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা বিলকুল দুরস্ত এবং সঠিক।

আসল সত্য ঃ

আসল সত্য কথা হলোঃ এ দুটি দর্শনই ঐ সত্যকে জানে না বা ঐ সত্যকে নজরের সামনে রাখে না যে মানুষ এ ধরনের দু' বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা সাধারণের চোখে পরস্পর বিরোধী মনে হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যর দুটি দিক থাকে যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একের সঙ্গে অপরটি চলতে থাকে। যেমন মুহাব্বাত ও ঘৃণা, ভয় ও আকাঙ্খা, অস্বীকৃতি ও সম্মতি, যৌন অনাচার ও নৈতিকতা এবং উপস্থিত বস্ত্রসমূহের প্রতি বিশ্বাস ও দৃশ্যের বাহিরের জিনিষে বিশ্বাস, মানুষের এ দু বৈশিষ্টের একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষশীল এবং পরস্পর বিপরীতমুখী মনে হয়, কিন্তু আসলে এ দুটির মধ্যে গভীর মিল এবং নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দু'টি দিক এমনভাবে বর্তমান রয়েছে যে, তা পরিষ্কার বুঝা যায়। অবশ্য যখন এর কোন একটি মাত্রার বেশি বেড়ে যায় তখন সেটা অন্য দিকটিকে দাবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, যার ফলে মানুষের নিজের মনের মধ্যেই এক পেরেশানী এবং টানাপোড়েনের এক অবস্থা সৃষ্টি হয়; তারপর এ পেরেশানী সমাজের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যদি প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি দিক সমান সমানভাবে এবং সামঞ্জস্যের সাথে বর্তমান থাকে তাহলে মানুষের মনের মধ্যেও অস্থিরতা আসে না বা সমাজেও কোন বিশৃঙ্খলা

ঘটে না আর ব্যস্টি ও সমষ্টির মধ্যেও কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে না, অবশ্য এ সঅবস্থান ও সামঞ্জস্য সাধন করা কোন সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়। আর এটাও অনিস্বীকার্য যে, জীবনের সবখানেই কিছু না কিছু সমস্যা আছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ - (البلد : ٤)

"অবশ্যই (আমি মহান আল্লাহ্) মানুষের কষ্ট পরিশ্রমের মধ্যে (বেঁচে থাকার জন্য) পয়দা করেছি।" (বালাদ-৪)

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ - (الانشقاق : ٦)

"হে মানুষেরা অবশ্যই তুমি কষ্ট পরিশ্রম করে তোমার পরওয়ারদিগারের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে মিলিত হবে।"(ইনশিকাক-৬)

মানুষের কষ্ট এবং চেষ্টাসাধনা প্রত্যেকটি জিনিষের জন্যই করতে হয়, চিন্তা-ভাবনা, নড়াচড়া এবং কামকাজ যাই করা হোক না কেন প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে কষ্ট ও চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন এবং প্রতিটি ব্যাপারেই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু একটু পার্থক্য হচ্ছে, কোন কোন চেষ্টা তো হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এবং সঠিক হেদায়েতের অনুসরণে। আবার কোন চেষ্টা চলে উদ্দেশ্যহীনভাবে যা মানুষকে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। একটি দ্বারা দুনিয়ার সুখ সৌন্দর্য গড়ে উঠে এবং আখিরাতেরও বেসাতি হয়, আর অন্যটি দ্বারা দুনিয়ার জীবনও ধ্বংস হয় এবং আখিরাত ও বরবাদ হয়ে যায়।

ব্যস্টি ও সমাজের পারস্পরিক সমান্তরাল অবস্থান

ইসলাম ব্যস্টি ও সমাজের মধ্যে সহাবস্থান পয়দা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু এ দু'টির প্রতিই আগ্রহ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে তা নয়, বরং ঐ দু'টি প্রবণতাকে সঠিক প্রশিক্ষণ দান করা এবং ঐ দু'-এর সহাবস্থানকে মজবুত করে গড়ে তোলা অপরিহার্য। যেহেতু ইসলাম স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং স্বভাবের উপযোগী একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এজন্য এ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির সঠিক মূল্যায়ন এবং সমাজের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সুসামঞ্জস্য অবস্থা যাতে বর্তমান থাকে তার জন্য যথাযথ শিক্ষা রয়েছে। এ দু'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা একটার পর আর একটা এমনভাবে আসে যেমন কোন ঘুমন্ত মানুষ এক কাতে শোয়ার পর আর এক

কাতে শোয়া। জীবনের স্বাভাবিক গতিতে এ দু'টিরই প্রয়োজন থাকার কারণে ইসলাম এ দু' জিনিষের সঠিক প্রতিপালন করে, খোরাক যোগায়, এদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে এবং এদের মধ্যে সুসামঞ্জস্যভাবে চলার মানসিকতা সৃষ্টি করে।

ব্যস্টির ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার সুযোগ একমাত্র ইসলাম দিয়েছে, সাথে সাথে সমাজের যথাযথ গুরুত্ব ও বর্ণনা করেছে। ব্যস্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে সমাজতন্ত্র। সমাজ ও সমাজতন্ত্রের দেবতার বেদীতে যদি মানুষ এমনি করে তার জীবন বলী দিতে থাকে তাহলে তার অস্তিত্ব খতম হয়ে যাবে, তার ব্যক্তিত্ব নাস্তা-নাবুদ হয়ে যাবে এবং এমন এক-সমাজ বাকি রয়ে যাবে যা হবে চিন্তা-কর্ম, চরিত্র ও শক্তির দিক দিয়ে চরম দুর্বল, তার উপর এক জালিম ও হিংস্র শাসক জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসবে এবং এ জবরদস্ত শাসক অপসারিত হলে সেখানে নেমে আসবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। যেহেতু কোন স্বেচ্ছাচারী জালিম শাসকের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা গড়ে উঠা কোন দিনই সম্ভব হয়নি।

কিন্তু ঐ সমাজেই যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি গড়ে উঠে তাহলে দেখা যাবে যে, সে আন্দোলন করে ঐ জালিম শাসকের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব শুরু করেছে যা হয়ত সমাজে রক্তপাতপূর্ণ অব্যুত্থান ঘটিয়ে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

এ জন্য সমাজের শান্তি ও সংহতির জন্য প্রয়োজন ব্যস্টি ও সমাজের লোকদের মধ্যে সমমনা হওয়া, পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তা ভাবনার মূল্যায়ন, পারস্পরিক সহযোগিতা সমবেদনা ও সহমর্মিতা এবং একের প্রতি অপরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ, তাহলে এমন এক মজবুত ও সুন্দর সামাজিক ইমারত গড়ে উঠবে যার প্রত্যেকটি ইট হবে মজবুত পাথরে তৈরি। ইসলাম এমনই এক সমাজ গড়ে তুলতে চায় এবং তার জন্য বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করে।

ইসলাম মানুষের অন্তরের স্রষ্টা আল্লাহ্পাকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার সাথে সাথে তার ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করে পূর্ণত্ব দান করে এবং আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তার মর্যাদাকে আরও বৃদ্ধি করে। আল্লাহ্র সাথে বান্দাহ্র গভীর সম্পর্ক তার অন্তরের মধ্যে এমনভাবে স্থান করে নেয় যে, সে নিশ্চিত ও নির্লিপ্ত হয়ে যায়।

একজন মুমিনের জীবনে এমন বহু মুহূর্ত আসে যখন সে সৃষ্টির সকল কিছুকে ভুলে গিয়ে আল্লাহ্পাকের চিন্তায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে যায় যে, তার অন্তরের গভীরে আল্লাহ্র অস্তিত্বের অনুভূতি ছাড়া আর কোন জিনিষ বর্তমান

থাকে না এবং এ গবীরভাবে তন্ময় থাকা অবস্থায় তার অন্তর আল্লাহ্‌র নূরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এই সময় সুন্দর ও উজ্জ্বল মন নিয়ে নিজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে সমাজের খিদমত করার জন্য তার মন এমনভাবে উদগ্রীব হয়ে যায় যে, ঐ সময়ে কে তার বিরোধিতা করল আর না করল তার কোন পরওয়াই সে করে না এবং যে কোন ঝুঁকি নিতে তার অন্তর প্রচুর পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে যায়। এসময় তার অনুভূতিতে তীব্রভাবে একথা জাগে যে, আল্লাহ্‌পাক তাকে তাঁর খলীফা হিসেবে কাজ করার জন্য কত প্রভূত পরিমাণ শক্তি তাকে দান করেছেন এবং তার ইচ্ছার এই মজবুতী কিভাবে তাকে নির্ভীক পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে দিয়েছে। আর এ কারণেই আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো সামনে সে নত হয় না। কেউ তাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। এবং কোন বস্তুগত শক্তি বা বস্তুগত মূল্যায়নের কাছে সে বশ্যতা স্বীকার করে না। সে জানে যে, তার নিকট আল্লাহ্‌পাকের নূরের যে শক্তি আছে তা যে কোন বস্তুশক্তি থেকে অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই স্বেচ্ছচারী শাসকবর্গ ধর্মকে পছন্দ করতে চায় না (তবে অনুষ্ঠান স্বর্বস্ব ধর্মকে তারা অনেকে অপছন্দও করে না, যেহেতু সে ধর্ম তাদের স্বেচ্ছাচারী শক্তি আদৌ ঈমানী শক্তির মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারে না। অপর দিকে ঈমানী শক্তি যে কোন তাগূতী শক্তির মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, যেহেতু ঈমানী শক্তির সামনে এই মূলনীতি সর্বদা বর্তমান থাকে "যে কোন বাতিল শক্তি তোমাদের নজরে পড়বে তাকে মিটিয়ে দাও।"

এভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও যোগাযোগ তাকে এক প্রচণ্ড শক্তি যোগায় এবং তাকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ততা দান করে। তার স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত শক্তি এত বেশি বেড়ে যায় যে, সমাজের অতলান্ত সাগরে নিছক একটি বুদবুদ হিসেবে একেবারে মিলিয়ে যায় না।

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছাড়াও ইসলামে ব্যক্তিগতভাবে জওয়াবদিহি (Personal responsibility) করার অনুভূতি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সাতন্ত্রের এক সুগভীর চেতনা দান করে।

وَ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى - (فاطر : ١٨)

"কোন বোঝা বহণকারী অপরের বোঝা বহণ করবে না।" (ফাতের-১৮)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - (المدثر : ٣٨)

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামাই করা আমলের বদলাতে বাঁধা রয়েছে অর্থাৎ যেমন কাজ সে করবে তেমনি ফল সে পাবে।"(মুদ্দাসের-৩৮)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

"সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কিছু মাত্র কারো উপকারে আসবে না।"

(বাকারা-৪৮)

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۔ (القيامه : ١٤۔ ١٥)

"বরং মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে (তার প্রবৃত্তির খবর রাখার ব্যাপারে) ভাল ভাবেই ওয়াকেফহাল, তা সে যতই ওজর আপত্তি পেশ করুক না কেন, অর্থাৎ তার অপকর্মের সমর্থনে যে ওজরই খাড়া করুক না কেন সে নিশ্চিত জানে সে দোষী।"

(কিয়ামাহ ১৪-১৫)

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কাজের জন্য এবং এজন্য তাকেই দায়ী হতে হবে। নিজের কাজের জন্য যেমন সে অন্যকে দায়ী মনে করতে পারে না, তেমনি অপরের বোঝাও নিজ কাঁধে তুলে নিতে পারে না। এই ব্যক্তিগতভাবে জওয়াবদিহির সার্বক্ষণিক চেতনা মানুষের মধ্যে এক বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ

ইসলাম আলোচ্য দু' পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে; কিন্তু আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ও নৈকট্য স্থাপন দ্বারা মানুষের মধ্যে যে পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয় তা তার মানুষ-ভাইয়ের জন্য কোমল অনুভূতি পয়দা করে এবং সর্বসাধারণ মানুষের জন্য ভালবাসা জাগায়, কল্যাণকামিতা ও মানুষের উপকারের জন্য ত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা শেখায়।

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۔ (الحشر - ٩)

"যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বেই ঈমান এনে হিজরতগাহ্ (মদীনাতে) বসবাস করছিল তারা ঐ ব্যক্তিগণকে মুহাব্বত করে যারা হিজরাত করে তাদের নিকট এসেছে। এবং তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে যে ব্যাপারে তাদের বুকের মধ্যে তারা কোন প্রকার সংকট অনুভব করে না, এবং তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন থেকে ওদের প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দেয় যদিও তাদের নিজেদের অভাব আছে।"(হাশর-৯)

আসলে মানুষে মানুষে মুহাব্বতই ঐ সঠিক কাজ যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এরই ফলে মানুষের সমাজ এমন একটি মজবুত কিল্লায় পরিণত হয় যার মধ্যে মানুষ নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিতে পারে।

এটাই ছিল সেই মুহাব্বত ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক যার ভিত্তিতে প্রাথমিক যুগে ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যকার প্রতিজন মানুষ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও পৃথক পৃথক কৃতিত্বের দাবিদার হওয়া সত্তেও তাদেরকে নিয়ে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল যা পরিপূর্ণ সংহত ও মজবুত ছিল। এ সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও দরদ-সহানুভূতি এবং অপরের জন্য ত্যাগ-কুরবানীর ভাবধারা সে সমাজকে করেছিল মজবুত ও অভংগুর। এ সমাজে ইসলামের নিযম-নীতি পালিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত উন্নতি থেকে সামাজিক উন্নতিও মুখ্যত নজরে পড়তো। এই সমাজ বা জামায়াতকে কুরআনে কারীম পরামর্শ, সহযোগিতা এবং একতার প্রশিক্ষণ দান করে সুন্দর হতে সাহায্য করেছিল।

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ -(المائدة :٢)

“নেকী ও তাক্বওয়া পরহেজগারীর কাজে একে অপরকে সাহায্য কর এবং গুনাহ্ ও সীমা লংঘনের কাজে কেউ কারো সাহায্য করো না।”(মায়েদা-২)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا - (ال عمران : ١٠٣)

“তোমাদের উপরে আল্লাহ্তায়ালা যে এহ্সান করেছেন তা স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পর দুশমন ছিলে তখন তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে জুড়ে দিয়েছিলেন। তারপর তোমরা তাঁর মেহেরবানী ক্রমে ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো আগুনে ভরা এক গর্তের একদম কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে তখন আল্লাহ্পাকই তোমাদেরকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।”(আলে ইমরাণ-১০৩)

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - (التوبه : ٧١)

“মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর বন্ধু দরদী” (তওবা-৭১)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - (الفتح :٢٩)

“মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ ফাফেরদের উপর ভয়ানক রকমের কঠোর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা অত্যন্ত দয়া পরবশ।” (ফাতাহ-২৯)

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ - (الشورى - ٣٨)

"তাদের কাজ হয় পরামর্শভিত্তিক।" (শুয়ারা-৩৮)

এ ছাড়া কুরআনুল কারীম ইসলামী সমাজকে দলীয়ভাবে চলার এক নীতিমালা দান করেছে এবং এমন সামষ্টিক দায়িত্ব দান করেছে যা একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ - (ال عمران : ١١٠)

"এখন এ বিশ্বে তোমরাই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ জাতি (তোমাদের বৈশিষ্ট্য) তোমরা (ক্ষমতার আসনে আসীন হয়ে) মানুষকে ভাল কাজসমূহের জন্য নির্দেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং তোমরা নিজেরাও আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হবে।" (আলে ইমরাণ-১১০)

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۔ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

(المجادلة : ٢٢)

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান রাখে তাদেরকে এমন অবস্থায় পাবে না যে, তারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তা সে (বিরোধী) লোকেরা বাপ, বেটা, ভাই বা নিজের খান্দানের লোক ও যদি হয়। এরা তো ঐ সব মানুষ যাদের অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানকে মজবুত (ভাবে অংকিত) করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে এক রূহ পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর নীচ (মধ্য) দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে, চিরদিন তারা সেখানে থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন, তারাও আল্লাহ উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে, ওরাইত আল্লাহ্র দল। শোনো আল্লাহর দলই (পরিশেষে) সফল কাম।" (মুজাদালা-২২)

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً - (الانفال : ٢٥)

"আর ভয় কর ঐ মহাবিপদকে যা শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যকার জালেমদেরকেই সংস্পর্শ করবে না।" (আনফাল-৩৫)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ـ (التوبه : ١٢٣)

"হে ঈমানদারগণ"! যুদ্ধ কর ঐ সকল কাফেরদের সাথে যারা তোমাদের আশে পাশে আছে।" (তওবা-১২৩)

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ ـ (محمد : ٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।" (মুহাম্মদ-৭)

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا ـ (الحجرات : ٦)

"হে ঈমানদারেরা! তোমাদের নিকট যদি কোন ফাসেক (গুনাহে কাবীরা বা মহা অপরাধে অভ্যস্থ) লোক এসে কোন খবর বলে তো সে খবরকে বাঁচাই করে দেখো (সত্য কিনা)।"(হুজরাত-৬)

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ط تُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ (الصف :١٠ـ١١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসা সম্পর্কে বলব যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে, সে ব্যবসা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করবে এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দ্বারা।" (সফ-১৭১)

ইসলামী মতবাদ স্বভাবতই এমন এক অবস্থা দাবি করে যেখানে সমাজ জনগণের সকল প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব নেবে এবং জনগণ ও সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবে। সে সমাজে যেন অনাগত বংশধরদের প্রশিক্ষণ হতে পারে তাদেরকে ইসলামী গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা যায়, তাদেরকে ইসলামী আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া যেতে পারে এবং তাদেরকে ইসলামী ধ্যান-ধারণার অধিকারী ও অনুসারী বানানো যেতে পারে। কারণ এগুলো এমন কাজ যেগুলো মানুষ একাকী আন্জাম দিতে পারে না, বরং এগুলো পূরণ করার জন্য সামষ্টিক চেষ্টা সংগ্রামের প্রয়োজন এবং সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একাজগুলো সফল হতে পারে। এভাবেই ইসলামী দলের কাজ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয় এবং দলের ব্যক্তিগণ আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ ও আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে,

ত্যাগ কুরবানী করে এবং এ পদ্ধতিতে এমন এক সামাজিক শৃঙ্খলা বাস্তবে আসে যার মধ্যে ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজ পরস্পর সহযোগী হয়ে যায় এবং সমাজের সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে এক মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠে।

নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা

মানব সত্ত্বার মধ্যে পরস্পর বিরোধী এমন দুটি গুণ পাওয়া যায় যে, সেই বিরোধটির দিকে তাকালে আশ্চর্য লাগে যে, এমন পরস্পর বিরোধী দু'টি বৈশিষ্ট্য এক সাথে কেমন করে একজন মানুষের মধ্যে বিরাজ করে। আসলে আবেগ অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতার এই দ্বিমুখী অস্তিত্ব (Amlivilence) মানবজীবনের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তার কারণ হচ্ছে মানুষ মাটি দ্বার পয়দা হয়েছে এবং তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বই হচ্ছে বস্তু ও আত্মার সমষ্টি) এ সত্যটি উদঘাটিত হয়ে যাওয়ার পর এ বিরোধটিকে অবশ্য আর আশ্চর্য লাগে না, বরং এটাই বিস্ময়কর লাগে যে ইসলাম কত চমৎকারভাবে এই পরস্পর বিরোধী আবেগ সমূহকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে এক দৃঢ় নিয়ম.শৃঙ্খরা পয়দা করে দিয়েছে।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার এক প্রবণতা বিরাজ করে যা পয়দা হয়েছে এবং তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বই হচ্ছে বস্তু ও আত্মার সমষ্টি)। এ সত্যটি উদ্ঘাটিত হয়ে যাবার পর এ বিরোধটিতে অবশ্য আর আশ্চর্য লাগে না, বরং এটাই বিস্ময়কর লাগে যে ইসলাম কত চমৎকারভাবে এই পরস্পর বিরোধী আবেগ সমূহকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে এক দৃঢ় নিয়ম শৃঙ্খলা পয়দা করে দিয়েছে।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার এক প্রবণতা বিরাজ করে যা এ কথার দাবি রাখে যে সে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মেনে চলুক এবং সেগুলোকে ব্যক্তিবর্গ নিজেদের জীবনে চালু করুক। আর যদি বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ তার উপর না থাকে তাহলে তার নিজের থেকে নিজের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নেয়া উচিত। এ ব্যবস্থা না নিলে নিঃসন্দেহে চরম উশৃঙ্খল হয়ে পড়বে এবং এ উশৃঙ্খলতা তাকে অশান্তির অতল তলে তলিয়ে দেবে। এ উশৃঙ্খলা (Anarclry) আসলে মন ও দেহ সর্বস্ব মানুষের প্রকৃতি বিরোধী।

মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে প্রকৃতিগতভাবে বাধ্য থাকলেও তার মধ্যে উশৃঙ্খলতারও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং কখনো কখনো সে চায় যে সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাক। এ দু'ধরনের প্রবণতাই তা ব্যক্তিত্বকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, দুটোরই আকর্ষণ প্রায় সমান সমান, তার মনে ও জীবনে এ দুই-এর প্রভাব

আছে এবং প্রকৃতপক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রয়োজনেই গড়ে উঠে রাষ্ট্র ও আইন এবং মানুষের তৈরি বিভিন্ন সংস্থা ও বিচার বিভাগ। এই স্বাভাবিক স্বার্থপরতার পাগলা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই মানুষ প্রতিটি দেশে এবং সর্বযুগে গড়ে তুলেছে সমাজ-সভ্যতা ও আইন-আদালত এবং বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সামাজিক—অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিয় সংস্থা। এ সকল সংস্থা অস্তিত্ব লাভের কারণই হচ্ছে যে, মানুষের প্রকৃতি চায় যে সে কোন না কোন নিয়ম শৃঙ্খলা বা নির্দিষ্ট আইন কানুনের পাবন্দী করুক এবং নিজেরাই এমন কোন যোগ্য ও দৃঢ়মনা লোক খুঁজে বের করুক যে এ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে এবং তাদেরকে সেই ব্যবস্থা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে, আর মানুষের এ স্বাভাবিক চাহিদার ফলেই সমাজে সমষ্টিগত আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার এ প্রবণতাই মানুষের মধ্যে আবিষ্কার, উদ্ভাবনী এবং স্বাধীনভাবে কিছু তৈরি করার যোগ্যতা গড়ে তোলার মূল ভিত্তি। কারণ মানুষ এটাও চায় যে, সে এসব নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যাক এবং অনুভব করুক যে প্রকৃতপক্ষে তাকে বাধ্য করার মত কেউ নেই এবং কিছুই নেই বরং সে নিজেই তার নিজের পরিচালক, তার ইচ্ছাই তার নিয়ন্ত্রক। এ দু ধরনের প্রবণতার অস্তিত্বই সমাজে সৃষ্টি করে এক আন্দোলন।

ঐ সকল বৈশিষ্ট্যগুলো পরিহার করার প্রবণতা

সর্বকালে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো (Characteristics) বর্তমান থেকেছে, তাদের মধ্যে যদি সাধারণভাবে নিয়ম কানুন মেনে চলার খেয়াল এবং নিয়ম কানুনের সাথে সম্পর্ক রাখার মেজাজ খতম হয়ে যায়, আর যদি সঠিক ও বেঠিক-এর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয় তো সে অবস্থাও হবে প্রকৃতি থেকে সরে যাওয়ার (Divert) নামান্তর, যেমন করে মানুষের মধ্যে থেকে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো দূর হয়ে যায়। এভাবে মানুষের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার ইচ্ছা ও সীমা ও আইনের বন্ধন মেনে চলার সহিষ্ণুতা তাকে কোন না কোন সংস্থার কোন অভ্যাসের বা কোন সমাজের নিয়ম পদ্ধতির গোলামীর শিকলে আবদ্ধ করে দেয়। এবং এসময় মানুষ নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা ও শরীরের প্রয়োজনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এর ফলে নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার প্রকাশ্য দাবি পরিবর্তিত হয়ে ইচ্ছা ও স্বাদ সম্ভোগের গোলামী মানুষকে বশীভূত করে ফেলে। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, বিবেক বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আনুগত্য মেনে চলার ইচ্ছা একই সময় এই দুই নিয়ন্ত্রণে উভয়টিকেই সে উপেক্ষা করে, যার ফলে সে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রিয় শৃঙ্খলার বা কোন ব্যক্তির দাসত্ব গ্রহণ করে। অন্য দিকে

নৈতিক যাবতীয় বন্ধনকে উপেক্ষা করে সে প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় এবং এভাবে উভয় অবস্থায় সে পরিপূর্ণ গোলামী এবং পরিপূর্ণ পশুত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়।

ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে সামনে রেখেই তাকে সংশোধন করতে ও সুন্দর করতে চায়। একদিকে যেমন তার উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিয়েছে, অপরদিকে এটা খেয়াল রেখেছে যেন তার স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের পথ বন্ধ না হয়ে যায়। এবং এ জন্য নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই সকল বিষয় যেগুলো একান্ত প্রয়োজন আর ততটুকু নিয়ন্ত্রণ করেছে যতটুকু করা একান্ত জরুরী। এবং সেই সেই বিষয়ে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা একটি সুস্থ সমাজের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাকে এমন নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে, এমন শিক্ষা ও সংগঠনের মধ্যে থাকতে তাকে বাধ্য করেছে যার মধ্যে না থাকলে সমাজ চলতে পারে না। কিন্তু ইসলাম মানব জীবনের উপর রাষ্ট্রের, দেশের, শাসকদের, সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণকে অনুমোদন করেনি। বরং যা কিছু নিয়ন্ত্রণ দিয়েছে তা আল্লাহ্‌পাকের দেয়া। এক কথায় সৃষ্টির উপর অন্যকোন সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং আশরাফুল মাখলুকাতের উপর একমাত্র তার স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণই চলতে পারে। ইসলামের এ কর্মপদ্ধতির ফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো, মানুষ গায়রুল্লাহ্‌র গোলামী বন্দেগী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে।

ইসলামের কর্মপদ্ধতি

ইসলাম মানুষের নিয়ন্ত্রণ-মুক্তির স্বাধীনতাকে এভাবে কাজে লাগায় যে, মানব জীবনে সর্বপ্রথম এ আগ্রহকে উদ্বুদ্ধ করে যে, সে যা কিছু কর্তব্য পালন করেছে এবং যে সব দায়িত্ব বহন করে যাচ্ছে তা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, বরং পুরোপুরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই। আর এটাই ঈমানের একটি সত্যিকার ফল।

অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দান করে ইসলাম মানুষকে এ স্বাধীনতা দিয়েছে যে, সে নিজ ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সাথে নিজের ও মানবতার কল্যাণ সাধন ও সফলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এবং এ পথেই তার ঈমানী উৎকর্ষ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের দ্বার উন্মুক্ত হবে ও বৃদ্ধি পাবে।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا - (الانعام : ١٣٢)

"প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুসারে।" (আনয়াম-১৩২)

ইসলাম মানুষকে যে সব সীমারেখার মধ্যে থাকতে বলেছে এবং যে সব কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন পদ্ধতির। সেগুলো আনুষ্ঠানিক ইবাদত সংক্রান্ত, আদান-প্রদানের সাথে জড়িত, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী এবং আন্তর্জাতিক আইন সম্বলিত। এটা সর্বজনবিদিত ও বাস্তব সত্য যে, আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন ব্যতীত অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগের জন্য প্রদত্ত আইন-কানুন তাই যা চিরদিনই সুস্থ ও সুন্দর মানব সমাজের আইন কানুনের মধ্যে রয়েছে এবং সেগুলো প্রয়োগের জন্য তেমনি আইন প্রয়োগের ক্ষমতাধর সংস্থার প্রয়োজন যেমন মানব রচিত ব্যবস্থা প্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজন জরুরী। ইসলাম শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের যে আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের বিধান দিয়েছে শুধুমাত্র এগুলোর কারণে ইসলাম ও অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এর কারণ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায় বা আইন-কানুনের মধ্যে মানুষের অন্তরের পরিশুদ্ধিতে অভ্যন্তরীন সংশোধন জনিত কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অন্যান্য ব্যবস্থায় সেই প্রকাশ্য দিকগুলো নিয়ে বিধি নিষেধ দান করা হয়েছে যার প্রতিফল মানবজীবনে প্রকাশ্যে দেখা যায় এবং যার দ্বারা স্পষ্ঠতঃ কারো কোন ক্ষতি না হয়, তাতে তার অন্তরে কি আছে তা দেখা দরকার মনে করা হয় না বা কোন মন নিয়ে সে ঐ কাজগুলো করছে তা দেখা হয় না। এভাবে প্রত্যেক ঐ সংগঠন যার বাহ্যিক রূপ কাজটিই শুধু দেখা হয়, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে তার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট দুর্বল হয়ে যেতে থাকে এবং তার মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের টানোপোড়নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, বাঁচার তাগিদে এবং আরো ভালভাবে জীবধারণের তাগিদে ভেতরে ভেতরে ঠাণ্ডা প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই ভাবেই মানব অস্তিত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে যায় এবং তার অস্তিত্ব দিশেহারা হয়ে যায়, পেরেশানী বৃদ্ধি পায় এবং তার শিরা উপশিরার মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের দামামা বাজতে থাকে—এ ধরনের টানাপোড়ন এক মহামারীর ন্যায় গোটা মানবদেহে ছড়িয়ে রয়েছে।

এরপর উল্লেখযোগ্য, ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে যে, ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত সকল ও প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নেয়াই ইবাদাত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا - (النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার হুকুম দানকারী যারা তাদেরও (আনুগত্য কর)। তারপর যদি তোমরা কোন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হও তবে বিবাদমান বিষয়টিকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (কুরআন ও হাদীসের ফায়সালার) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি প্রকৃতপক্ষেই তোমরা আল্লাহকে ও আখেরাতের দিবসকে বিশ্বাস করে থাক। এই (কর্মপদ্ধতিটাই) তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে এবং পরিণতির বিবেচনায় সুন্দরতর হবে।" (নিসা-৫৯)

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য শতকরা একশত ভাগই করতে বলা হয়েছে। কিন্তু হুকুম দানকারীর আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অনুযায়ী হতে হবে, এ শর্তেই তার আনুগত্য করতে হবে, নচেৎ নয়। শুধুমাত্র হুকুম দানকারী হওয়ার কারণেই আনুগত্যনয়।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيدِ يَهُمَاجَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ـ

(المائدة : ٣٨)

"চোর ও চোরনী তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, (চোর স্ত্রী পুরুষ যেই হোক, হাত কাটতে হবে) যে অপরাধ তারা করেছে তার শাস্তিস্বরূপ এ দণ্ড এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধকে ঠেকানোর জন্য এ এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা শিক্ষণীয় ব্যবস্থা। এখানে চুরির সাজাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এ দৃষ্টান্তমূলক সাজার মধ্যে মাথা গলানোর ইখতিয়ার কোন মানুষের নেই, এমনকি নবীরও নেই, যেহেতু এটা আল্লাহ্‌র আইন (যা সবার জন্য সমান)।"

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ـ (البقرة ـ ٢٨٢)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য কোন ঋণের আদান-প্রদান করা কালে লেখাপড়া করে নাও। এবং তোমাদের মধ্যকার কোন লেখক যেন সঠিকভাবে তা লিখে দেয়। এ সময় লেখক, যাকে আল্লাহ তায়ালা লেখা পড়ার তওফিক দিয়েছেন, যেন লিখতে অস্বীকার না করে, অতএব সে যেন লেখে এবং যার উপর ঋণের বোঝা চেপে যাচ্ছে যেন লেখার বিষয় ও ভাষাগুলো বলে এবং এ বিষয়ে সে যেন নিজ প্রভু আল্লাহকে ভয় করে।"(বাকারা-২৮২)

وَلَاتَسْأَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (البقره : ٢٨٢)

"লেনদেনের ব্যাপারে ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে লিখে নিতে গাফলতি করো না আল্লাহ্‌র নিকট এটাই বেশি ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি।" (বাকারা-২৮২)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - (البقرة : ١٨٢)

"আল্লাহ্‌র গজব থেকে নিজেদের বাঁচাও, তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মপদ্ধতি শেখাচ্ছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন।" (বাকারা-২৮২)

ইসলামের প্রতিটি আইন-কানুন, প্রতিটি পথনির্দেশ এবং আল্লাহ্‌র প্রতিটি হেদায়েত আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেক নিয়মতান্ত্রিক কাজ, দায়িত্ব এবং প্রত্যেক বাধ্যতামূলক কাজই হচ্ছে ফরজ, এই ফরজ আদায়, শুধু আল্লাহ্‌র ভয়ে নয়, বরং আল্লাহ্‌র মুহাব্বতেও বটে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ - (الانبياء : ٩٤)

"আর যে ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় ভাল কাজসমূহ করবে তার সে কাজকে অস্বীকার করা হবে না।"(আববিয়া-৯৪)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوٰلَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ - (البقرة :٢٦٥)

"আর যারা তাদের সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্য পূর্ণ দৃঢ়তা ও স্থিরতার সাথে ব্যয় করে তাদের এ খরচের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন—কোন উঁচু স্থানে অবস্থিত এক বাগিচা যা বৃষ্টি বাদলায় ডুবে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায় না।" (বাকারা-২৬৫)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا -(طه :١١٢)

"ঈমানের সাতে যে ভালকাজগুলো করবে তার প্রতি কোন জুলুম হবে না, বা তার হকও নষ্ট করা হবে না।" (ত্বাহা-১১২)

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -(النساء : ١١٤)

"সাধারণত গোপন শলা পরামর্শের বেশির ভাগ দ্বারাই কোন কল্যাণ সাধিত হয় না, তবে কেউ যদি গোপনে সদকা খয়রাত করার বা নেক কাজ করার বা

মানুষকে সংশোধন হওয়ার পরামর্শ দেয় তো সেটা অবশ্য ভাল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্য এ কাজ করবে, তার প্রতি আল্লাহ্র ওয়াদা "আমি (মহান আল্লাহ) তাকে মহা প্রতিদান দেব।" (নিসা-১১৪)

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ـ (الممتحنه : ١)

"হে ঈমানদারগণ! আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তোমরা জিহাদের নিয়তে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় দেশ-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসে থাক। তোমরা তো মুহাব্বতের সাথে ও তাদেরকে আপন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দাও; অথচ তোমাদের কাছে (নবী) যে সত্য নিয়ে এসেছে ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরক এই জন্য বহিষ্কার করছে যে তোমরা তোমাদের রব-প্রতিপালক আল্লাহ্কে বিশ্বাস করেছ।" (মুমতাহীনা-১)

নিজের থেকে নিজেদের বুঝমত কোন ভাল কাজ করার প্রতিফল দেয়ার একটি অবস্থা এই হতে পারে যে, মানুষকে কর্ম স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সে যে ভাল কাজের জন্য নিজের অন্তর থেকে উৎসাহ পায় এটা তার একটি ইতিবাচক পুরস্কার।

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّه وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُم تَعْلَمُوْنَ ـ (البقرة : ١٨٤)

"তারপর যারা রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখতে চায় তারা একটি রোযার পরিবর্তে একটি মিসকীন খাইয়ে দেবে (রোযা ফরয হওয়ার পর প্রথম বছর এই রেয়ায়েত দেয়া হয়েছিল, পরবর্তী বছরে এ রেয়ায়েত নাকচ করে দেয়া হয়)। তবে রোডা রাখাটাই তোমাদের জন্য উত্তম, তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগালেই তবে তোমরা এ কথা বুঝবে।" (বাকারা-১৮৪)

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ (بقرة :٢٧١)

"প্রকাশ্যভাবে সদকা দিলে তাও ভাল, তবে গোপনে যদি অভাবগ্রস্তদেরকে দাও তবে সেটা তোমাদের জন্য আরো ভাল, এভাবে দান করায় তিনি

আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের দোষত্রুটি মুছে দেবেন। যা কিছু তোমরা করছ সবই তিনি খবর রাখেন।"(বাকারা-২৮১)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ج بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْ هُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْ هُنَّ اُجُوْرَ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَلاَمُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ ج (النّساء)

"তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির উচ্চ বংশীয় মুমিন নারীদের কাউকে বিয়ে করার তৌফিক না রাখলে, তার জন্য তোমাদের অধীনস্থ কোন ঈমানদার দাসীকে বিয়ে করাকে সমীচিন হবে। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ঈমানের অবস্থা ভাল করেই জানেন। আসলে তো তোমরা এক গোষ্ঠিরই মানুষ (বনু আদম, কোন দুর্ঘটনায় পড়ে হয়ত কারো দাসত্বে এসেছে)। সুতরাং যে মুনিবের অধীনে যে দাসীগণ আছে তার অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিয়ে কর এবং তাদেরকে তাদের পাওনা মুহর ভালভাবে আদায় করে দাও। তাদেরকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদেরকে হেফাজত কর, নিয়ন্ত্রণাধীন যৌন সম্ভোগ তাদের সাথে করোনা অথবা চুরি-চামারী করে মন দেয়া নেয়া ও করোনা।"(নিসা-২৫)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِى لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ(النور:٦٠)

"আর যে সকল নারী (যৌবন পার হয়ে যাওয়ার কারণে) বিয়ের খেয়াল আর রাখে না এবং নিজ ঘর-সংসার নিয়ে বসে থাকে তারা যদি সৌন্দর্য প্রকাশের কোন ইচ্ছা ব্যতিরকে গাত্রাবরণ (বক্ষআবরণী) নামিয়ে রাখে তাতে কোন দোষ নেই। তবে, লজ্জা শরমের সাথে যদি তারা নিজেদেরকে আবৃত রাখে তো সেটা তাদের জন্য সম্ভ্রমপূর্ণ হবে। (যে বলে এবং যে যা করে) আল্লাহ তায়ালা তা সব শুনেন ও দেখেন।" (নূর-৬০)

নেক আমলের দিকে উৎসাহিত করার আর একটি দিক

এরপর নেক আমলের দিকে উৎসাহ দান করার আর একটি অবস্থা পেশ করা যেতে পারে এবং তা হচ্ছে কুরআনে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, মন্ত্রশক্তির মত এবং এক অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতিতে নেক আমলের উৎসাহ দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা, মানবিক চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে নিজ ইচ্ছায় সে সকল ভাল

কাজ দিতে পারে। এ ব্যাপারে বাইরের চাপ বা জবরদস্তির তুলনায় মানুষের আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা-আগ্রহ বেশি কাজ করে। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ . وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ . اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ . فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ . اُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

(المؤمنون : ١-١١)

"অবশ্যই ঐ সকল মুমিন সাফল্য লাভ করেছে যারা নামাযের মধ্যে বিনয় নম্রতা অবলম্বনকারী, যারা বেফায়দা জিনিষ ও ব্যবহার বর্জনকারী, যারা পবিত্রতা অবলম্বনের কাজ করে, যারা তাদের যৌনাংগের হেফাজত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ও দাসীদের নিকট গমন করা ব্যতীত। কারণ সেখানে যাওয়া নিন্দনীয় নয় (যেহেতু তাদের জন্য সেখানে গমন করা আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন) এ সকল স্থান ব্যতীত অন্যত্র যেখানে সেখানে যারা যাবে তারা হবে সীমা অতিক্রমকারী। সাফল্য লাভ করবে ঐ সকল ব্যক্তিত্ব যারা আমানতসমূহ রক্ষা করবে, চুক্তির হক আদায় করবে, এবং যারা তাদের সকল নামাযের হেফাজত করবে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী জান্নাতুল ফিরদৌসের, সেখানে চিরদিন তারা বাস করবে।"(মু'মিনুন-১-১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَنْ لَا تَخَافُوْا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ط نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ط نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ . وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . (فصلت : ٣٠-٣٢)

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, আমাদের রব (মুনিব, মালিক, শাসনকর্তা) আল্লাহ, তারপর একথার উপর মজবুত হয়ে টিকে থেকেছে (অন্য কাউকে আর রব মানেনি) তাদের উপর ফেরেশতাগণ নাজিল হয়ে অভয়বাণী শোনাবে, বলবেঃ ভয় পেয়ো না, এবং তোমাদের নিকট যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার সুসংবাদ

গ্রহণ করো। আমরাই দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও তোমাদের বন্ধু, তারপর তোমাদের জন্য সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে তাই পাবে আর যে সব জিনিষের দাবী তোমরা করবে তাও সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে। ক্ষমাশীল ও মহাদয়াময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটা এক মেজবানী। তারপর, ভেবে দেখ,, ঐ লোকের থেকে ভাল কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, ভাল কাজ করে এবং প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়; আমি মুসলমানদের দলের লোক।"

(হামীম আস-সিজদা-৩০-৩২)।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا . وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا . وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ط اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا . وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا . يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا . اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا . وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا . وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا . وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا . اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ط خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا . (الفرقان ٧٢-٦٣)

"মহা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দাগণ তারা, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর যখন তাদেরকে হঠকারী লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা তাদেরকে সালাম দ্বারা জওয়াব দেয়, কারণ তারা যুক্তি মানতে চায় না এবং কথা থামিয়ে দেয়। তারা তাদের পরওয়ারদিগারের জন্য সিজদা করে, দাড়িয়ে নামায পড়ে এবং এই বলে দু'আ করে, হে আমাদের রব। আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূর করে দিন, নিশ্চয়ই তার আযাব ধ্বংসাত্মক, জাহান্নাম নিকৃষ্ট বাসস্থান এবং নিকৃষ্ট অবস্থানগৃহ। মহা দয়ময়ের কৃপাধন্য তারা, যারা যখন খরচ করে তখন অপচয়ও করে না, কৃপনতাও করে না, এ দু'

চরম অবস্থায় মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করে। তারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক হিবেবে ডাকে না। কোন ব্যক্তিকে যুক্তি সংগত কারণ ছাড়া হত্যা করে না। একাজ যে করবে সে মহাঅপরাধের (গুনাহ কাবীরার) দায়ে দায়ী হবে। কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য আযাবকে দ্বিগুন করে দেয়া হবে এবং সেখানেই তারা অপমানিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে, (এ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর) যদি কেউ তওবা করে তারপর ঈমানের দাবী পূরণ করে ভাল কাজ করে তা হলে তাদের অন্যায় কাজগুলোকে তিনি নেক কাজে রূপান্তরিত করে দেবেন, আল্লাহপাক চিরদিনই মাফ করনেওয়ালাও মেহেরবান। আর এ মেহেরবানী এজন্য যে, যে তওবা করার পর ভাল কাজ করে চলেছে সে পুরোপুরি তওবা করেছে বলেই এভাবে গুনাহসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। এ সব লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর বেফায়দা জিনিষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আত্মসম্ভ্রমবোধ নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাদের নিকট আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তারা সত্যতা দেখতে পেয়ে তা গ্রহণ করে। তারা দু'আ করে, বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের এবং সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শান্তি বানিয়ে দিন এবং আমাদেরকে শীর্ষস্থানীয় মুত্তাকী পরহেজগার লোক বানিয়ে দিন। এ সকল গুণের অধিকারী লোকদেরকে তাদের সবরের কারণে (বেহেশতে) আরামদায়ক কক্ষ দান করা হবে এবং তাদেরকে উপঢৌকন ও সালাম দ্বারা অভ্যর্থনা করা হবে। এ বাসস্থানে তারা চিরদিন থাকবে, স্থায়ী বা অস্থায়ী বাস হিসেবে তা হবে চমৎকার স্থান।" (ফুরকানঃ ৬৩-৭৬)

ইসলামী চরিত্রের প্রশিক্ষণ দানের যে পদ্ধতি বর্ণিত হলো তা সুন্দরতম দৃষ্টান্ত। এর মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষাদান করা হয়েছে যে, মানুষের কাছে নেক কাজের দাবী করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সে টেরই পাচ্ছে না যে, তার কাছে দাবী জানানো হচ্ছে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি অতি সুন্দর আকর্ষণীয় এবং মনোরম দৃষ্টান্ত সামনে রেখে দেয়া হলো। তার আকর্ষণ এমনই মনোমুগ্ধকর যে তা দেখে মানুষ আপনা থেকে সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

নেতিবাচক ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য

মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তার মধ্যে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান রয়েছে, অর্থাৎ যখন মায়ের ভ্রূণ (Embryo) গঠিত হয় তখন তা দু'টি কীট ; অর্থাৎ মাতৃ ডিম্বকোষ (Ovum) ও পিতৃমনির শুক্রকীট (Semen)-এর সম্মিলনের ফলে বাস্তবে এসে ভ্রূণ গঠিত হওয়ার পূর্বে এদের

পথ থাকে পৃথক, মাতৃগর্ভের মধ্যে অবস্থিত ডিম্বকোষ আধার থেকে এই ডিম্বকোষ গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুক্র থেকে শুক্রকীট গর্ভ থেকে আভ্যন্তরীণ এক ঝিল্লির মধ্যে প্রবেশ করে যাতে করে ডিম্বকোষকে কার্যকর বানাতে পারে। এ দু' শক্তির সম্মিলিত অবস্থার নামই ভ্রূণ। অর্থাৎ এর মধ্যে একই সময় ধণাত্মক ও ঋণাত্মক (ইতিবাচক ও নেতিবাচক, (Positive & Negative) শক্তিদ্বয় বিরাজ করে।

সৃষ্টির প্রক্রিয়ার এ এক অদ্ভুত রহস্য যা এ সত্য উদ্‌ঘাটন করে যে, মানুষের মধ্যে একই সাথে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক (Positive & Negative) বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান আছে। মানুষকে কোন পথ প্রদর্শন না করে যদি এমনিই ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা প্রকৃতিগতভাবে ডাইনে বামে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে, স্থীরতা বা স্থায়িত্ব লাভ তারা করতে পারবে না। তার ফলে তার মধ্যে বিরাজমান যে ঋণাত্মক বোধ আছে, তা তাকে কোন ব্যক্তি অথবা অভ্যাস অথবা রীতির গোলাম বানিয়ে ছাড়বে; আর এই গোলামীর জীবন মানুষকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ছাড়বে, শুধু তাই নয়, বরং এ গোলামীর কারণে তার রীতি-নীতি ও অভ্যাসসমূহের উপর থেকে তদারকী উঠে যাওয়ায় অশান্তি, বিশৃংখলা ও ভাঙ্গনের দুয়ার খুলে যাবে। কারণ, সচেতন তদারকী ছাড়া কোন সংশোধনী আসতে পারে না। আর এটা বাস্তব সত্য যে, পরাধীন কোন গোলামের মধ্যে কোন কিছুকে সচেতনভাবে তদারকী করার যোগ্যতা থাকে না।

মানুষ যখন কোন রাষ্ট্রপতির বা রাষ্ট্রের গোলাম হয়ে যায়। তখন তার ব্যক্তিসত্বা বাস্তবে খতম হয়ে যায়, জীবন সমস্যা সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করা বা মতামত স্থীর করার মত কোন বুদ্ধি বা যোগ্যতা তার অবশিষ্ট থাকে না। যার ফলে সে নিজেকেও পরিচালনা করতে পারে না, অন্যকেও পরিচালনা করতে পারে না। তাকে যা কিছু নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়া হয় তা সে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে থাকে, তার মনে এ প্রশ্ন জাগে না যে ঐ সব পরামর্শ বা নির্দেশ মানলে তার বা সমাজের কোন কল্যাণ হবে কি না।

আর যখন কোন মানুষের কোন অভ্যাস ইচ্ছার দাস হয়ে যায় তখন সে প্রকৃতপক্ষে সেই অভ্যাসের অনুসারী হয়ে উঠে এবং তার আজাদী সেখানে ক্ষুন্ন হয় এবং তার ইতিবাচক বা ধনাত্মক শক্তি প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। এ সময় ধীরে ধীরে তার নিজ অভ্যাস বা ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একবারেই খতম হয়ে যায় এবং খুব বেশি সময় পর্যন্ত তার অভ্যাস বা ইচ্ছা কার্যকরী করা থাকে সে দূরে থাকতে পারে না, বরং অনেক সময় এমন হয় যে, সে অভ্যাস বা ইচ্ছা ত্যাগ করাতে তার প্রাণের উপর ভীষণ বিপদ ডেকে আনে। যেমন-মদের কথা ধরা যাক, এমনকি চা-সিগারেট এং নেশা আনয়নকারী অন্যান্য জিনিষও তদ্রূপ,

এগুলোর এমন সাংঘাতিক যে এগুলো তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের ক্ষমতাকে আহত করে ছাড়ে।

আবার কখনো কখনো মানুষ কোন সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা বশীভূত হয়ে যায় এবং সেই রীতিনীতিকে চালু করার জন্য আদাপানি খেয়ে লেগে যায় যদিও অন্তরের মধ্যে সেই রীতিকে অপছন্দ করে এবং এভাবে তার কাজটি কপটতাপূর্ণ হয়ে যায়। এ প্রকৃতির মানুষের কার্যকলাপে গোটা সমাজে কপটতার বিষাক্ত চারা অঙ্কুরিত হয়।

ইতিবাচক জিনিষের অস্বীকৃতি

ইতিবাচক জিনিষের ব্যাপারে যখন মানুষের মধ্যে অস্বীকৃতিভাব এসে যায় তখন তার মধ্যে আসে জিদ, ঘৃণা, নিজ ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য ঐকান্তিক বাসনা এবং এ বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে জোর-জবরদস্তির পথও গ্রহণ করা হয় এবং এ সময় এ হঠকারী মন নিয়ে যে কোন অন্যায় কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। এর কারণ হচ্ছে মানুষ নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রচেষ্টা চালাবে এবং আত্ম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য প্রয়োজন হলে ধ্বংসাত্মক পথও ধরবে, কারণ গঠনমূলক প্রণালী থেকে ধ্বংসাত্মক প্রণালী সহজ। এভাবে মানুষের মধ্যে অহংকার জাগ্রত হয়, যেহেতু অহংকারহীন মনের লোকদের উপর অধিকা প্রভাবশীল হয় এবং সে এমন মন্দ চরিত্রের প্রকাশ ঘটায় যা মানুষ আংগুল দিয়ে দেখাতে পারে। অহংকারী ব্যক্তি নৈতিক সকল বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। যেমন, অস্তিত্ববাদী মতবাদ (Existentiallism) দাবী করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু ভাল মনে করবে তাইই ভাল, তাকে তার মত অনুযায়ী চলার পথে সমাজ কোন বাধা দেয়ার অধিকার রাখে না। ইতিবাচক বা হাঁ সূচক জিনিষের প্রতি অস্বীকৃতি মূলতঃ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি অস্বীকৃতিরই শামিল। আর মানুষ এ জন্য আল্লাহকে অস্বীকার করে যেন তাকে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং বাহাদুর বলে অভিহিত করে।

মোটা কথা, সুষ্ঠু ও সুস্থ বুদ্ধি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বিভিন্ন রূপ আছে ; কারণ সুস্থ বুদ্ধি নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এবং নিজ ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। নেক কাজ ও সৎ গুণাবলীর বিভিন্ন দিক আছে এবং এত বেশি স্তর আছে যেগুলো তারা অর্জন করতে পারে যারা ইতিবাচক মনোভাব রাখে, যারা নিজ প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম

এবং সত্য সঠিক জিনিষের প্রতি মনকে ঝুকিয়ে রাখতে পারে, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে পথ দেখাতে পারে এবং সাফল্যের পথে মানুষকে এগিয়ে দিতে পারে।

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا - (الفرقان : ٧٤)

"আর আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের নেতা বানিয়ে দিন।"

(ফুরকান-৭৪)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মুকাবিলায় পূর্ণ নেতিবাচকতা

ইসলাম ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বা নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি শক্তিকেই কাজে লাগায়। এদের প্রত্যেককে তার সঠিক স্থানে রেখে মানব অস্তিত্বকে সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা প্রদান করে। ....ঘড়ি সেই সময়েই সময় জানায় যখন তার সবগুলো যন্ত্রাংশকে নিজ নিজ সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়।

ইসলাম বলে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার মুকাবিলায় পূর্ণ নেতিবাচকতা অর্থাৎ এ ঘোষণা যে তিনি ছাড়া ক্ষমতার মালিক কেউই নেই; আবার সৃষ্টির সকল বস্তু-শক্তির মুকাবিলায় মানুষের মধ্যে পূর্ণ ইতিবাচকতা অর্থাৎ যে কোন মানুষের মত শক্তি বা যে কোন শক্তি থেকে মানুষ বড় এ বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় মানুষের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।.......এটাই হচ্ছে সেই সঠিক পথ যার উপর চলার ফলে মানুষ ভাল ও সরল, সহজ ও মজবুত থাকতে পারে।

আল্লাহপাকের মুকাবিলায় পূর্ণ নেতিবাচকতার ব্যাখ্যা হলোঃ আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র স্রষ্টা, তিনি সব কিছুর ব্যবস্থাপক ও মালিক, তিনিই সমস্ত কাজ করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনিই জীবিত রাখেন, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনিই রিযিক দান করেন, তিনিই তার বান্দাহর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন এবং তিনি যা চান তাইই করেন। পাশাপাশি চিন্তা করলে বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তার মুকাবিলায় মানুষের কোন ক্ষমতা নেই এবং মানুষ নিজের বা অন্য কারো কোন উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। ব্যাস মোদ্দা কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন ও করতে পারেন। কোথাও কেউ নেই তাঁকে দেয়ার, এজন্য তাঁর সম্পর্কে মানুষের কর্তব্য 'মেনে নেয়া ও সন্তুষ্ট থাকা'-এটাই প্রকৃতপক্ষে সঠিক কথা। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর ইখতিয়ার এবং হুকুমের উপর কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, আপত্তি করতে পারে না এবং কোন দ্বিধা সন্দেহও থাকা সম্ভব নয়।

এ কথা মেনে নেয়া ও সন্তুষ্ট থাকাই উত্তম। এটাই প্রকৃতপক্ষে মানবতার

সঠিক, মুনাসিব অবস্থা, এটা মানার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সঠিক মর্যাদা, এটা কোন জবরদস্ত শত্রুর অশুভ শক্তিকে মানা নয়, যাতে মানুষের মন খচখচ করতে পারে। এটা কোন জবরদস্ত শত্রুর অশুভ শক্তিকে মেনে নেয়াও নয়। বরং এ হচ্ছে ঐ বিশ্বাপালককে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া যাঁর রহমত গোটা সৃষ্টিজগতের উপর ছেয়ে রয়েছে এবং তাঁর অসীম রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি মহা দয়াময়, দাতা, করুণাময়।"

মহা দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালার নামে শুরু করার মাধ্যমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের মনোভাব প্রকাশ পায়, তাঁর কাছে নতি স্বীকার করা হয়, স্বীকার করা হয় তিনি দাতা, ক্ষমাশীল, নিয়ামত দানকারী, অযাচিতভাবে দেনেওয়ালা, তিনিই মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, তিনি এই মাটির পুতুলের ভেতরে দিয়েছেন অনুপম সৌন্দর্য। তিনিই সৃষ্টির সবকিছুকে মানুষের অনুগত করেছেন, তিনি জীবনের সব দিকগুলোকে সুন্দর করে তোলার ব্যবস্থা করেছেন ও মানুষের সকল প্রয়োজন মেটানো সহজ করে দিয়েছেন।. এজন্য যখনই মানুষ আল্লাহর সামনে খুশির সাথে মাথা নত করে তখন তার মধ্যে মালিক মুনিবের প্রতি মুহাব্বতের গভীর ভাবধারা ফুটে উঠে, তখন সে স্পষ্ট অনুভব করে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সকল বান্দাহর উপর কর্তৃত্বশীল, ক্ষমতাবান এবং বান্দাহার উপর পরিপূর্ণভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ তাঁর আছে। মানুষকে বশীভূত করা ও বশীভূত রাখার মত যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাঁর কাছে সদা-সর্বদা মওজুদ রয়েছে। তিনি গোটা সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিপতি। এতদসত্তেও তাঁর বান্দাহকে তিনি ভালবাসেন এবং তার উপর তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। অপর দিকে বান্দাহদেরকেও আহ্বান জানান হয় তারাও যেন তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর উপর খুশী থাকে।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ - (ال عمران : ٣١)

"বল। (হে রাসুল), যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, তখন আল্লাহ তায়ালাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"

(আলে ইমরাণ-৩১)

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ج ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

"আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে, ঐ অবস্থাই তো মহা সাফল্যের প্রতীক। (মায়েদা-১১৯)

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ - (الشورى : ١٠)

"তোমাদের যিনি আল্লাহ্ তিনিই আমার 'রব', তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, আর তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাব এবং রুজু করবো।"

সৃষ্টির মুকাবিলায় পূর্ণাংগ ইতিবাচকতা
(সবকিছু করতে পারার মানসিকতা)

এটাই হচ্ছে পূর্ণাংগ মেনে নেয়ার মনোভাব এবং পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি, যার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সফল বস্তু। মানুষ যে কোন দুর্ঘটনায় মুখোমুখী হয়ে নিজের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অনুভূতি দ্বারা উপকৃত হয়; এ হচ্ছে এক অদ্ভুত অনুভূতি যা মুমিনের অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। যে মুমিন কোন জিনিসের নির্মাতা হয়, কোন জিনিস তৈরি করে, (বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ কোন মেশিন বা যন্ত্রের রূপ দেয় এবং নূতন নূতন জিনিস গড়ে তোলে), সেই মুমিনই উচ্চ মানের এবং সম্মানিত মুজাহিত বলে বিবেচিত হয়।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ - (المنا فقون : ٨)

"ইজ্জত ও মান-সম্মান আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্যই সংরক্ষিত।" (মুনাফিকুন-৯)

এ ঈমানী শক্তির কারণেই যে কোন মানুষের মুকাবিলায় মুমিন সম্মানিত হয়।

لَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۔ اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - (ال عمران : ١٣٩-١٤٠)

"মন ভাঙ্গা হয়ো না ও দুঃখও করো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। তোমাদেরকে যদি কোন ক্ষত স্পর্শ করে থাকে (যদি আহত হয়ে থাক) তো অন্য এক জনপদও তো ইতিপূর্বে আহত হয়েছে (পূর্বেকার যুদ্ধে, তাতে তো তারা হতাশ হয়নি, তাহলে তোমরাই বা এই আঘাতের কারণে হতাশ হবে কেন?) এমনি করেই তো আমি আল্লাহ বছরের দিনগুলোকে আবর্তিত করি মানুষের মধ্যে।"

আর এই ঈমানী শক্তির কারণেই মুমিনগণ বিভিন্ন অবস্থায় ইজ্জত পায়।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ـ (الجاثيه : ١٣)

"আর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুকে তাঁর মর্জি মুতাবিক তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন।" (জাছিয়া-১৬)

এভাবে ঈমানী শক্তি সকল দিক থেকে প্রত্যেক জিনিষের মুকাবিলায় মুমিনকে মান সম্ভ্রমের অধিকারী করে এবং এটা ঈমানেরই এক অলৌকিক শক্তি যে, আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের কারণে এ অত্যাশ্চর্য শক্তি হাসিল হয় এবং এ শক্তি সবকিছুর উপর প্রাধান্য পায় এবং সবকিছুর উপর বিজয়ী হয়ে যায়। এ শক্তির ফলেই মানুষ সমস্ত বস্তু শক্তি, সামাজিক শক্তি, অভ্যাসের দাসত্ব, রীতিনীতির বন্ধন, অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব এবং রাষ্ট্রীয় চাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কারণ মুমিনের নজরে এমন কোন শক্তি (আল্লাহর শক্তি ছাড়া) নেই, যা তাকে একেবারে অসহায় করে ফেলতে পারে, যেহেতু আল্লাহর শক্তি একমাত্র অমোঘ এবং চিরস্থায়ী ও পরিবর্তনহীন শক্তি। মুমিনের শক্তি গোটা সৃষ্টির উপর যে বিজয়ী হয় এটাও আল্লাহ তায়ালার হুকুমে এবং তাঁরই ব্যবস্থা মতে। কারণ জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যম আগত অহীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে পৃথিবীর বুকে মানুষ সমগ্র বিশ্বের সম্রাট আল্লাহ তায়ালার খলীফা (প্রতিনিধি) সুতরাং আল্লাহর চিন্তাই তার চিন্তা, আল্লাহর শক্তিতেই সে শক্তিমান। এই জন্যই সকল সৃষ্টিকেই তার অনুগত করে দেয়া হয়েছে আর এ কারণেই দেখা যায় ইসলামের প্রথম যুগে ঈমানের পূর্ণ বলে বলীয়ান মুমিনগণ এমন এক রাষ্ট্রিয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক শৃঙ্খলা কায়েম করেছিল এবং এমন এক আধ্যাত্মিকতার জন্ম দিয়েছিল যার কোন নজীর আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি এবং যা মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের বুদ্ধিবলে এবং মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন আইন-কানুন দ্বারা গড়ে উঠেনি। বরং মুমিনদের জামায়াত ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়েই এ স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিল। এই ঈমানী শক্তির কারণেই তৎকালীন সকল বস্তুশক্তি, বাতিল শক্তির সম্মিলিত বাহিনী এবং তৎকালীন সকল প্রকার যোগ্যতার অধিকারীরা মুসলমানদের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। এ ঈমানী শক্তির কারণেই মুসলমানদের মুষ্টিমেয় নিরস্ত্রপ্রায় একটি ছোট দল ধূর্ত কুরাইয়শদের সুশৃঙ্খল-সুশিক্ষিত এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত এক বিশাল বাহিনীকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়েছিল। বরং প্রকৃতপক্ষে এই ঈমানী শক্তির ফলে মুমিনগণ গোটা মানবমণ্ডলীর শত বাঁধা বিঘ্ন, শত ধোকাবাজি, সাজ সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর হযরত সিদ্দীকে আকবর এ ঈমানী শক্তির দ্বারাই যাকাত অস্বীকারকারী বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে সাহসী হয়েছিলেন এবং বিজয়ীও হয়েছিলেন।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর

মুকাবিলায় সব কিছুকে অস্বীকার করার কারণেই এ জবরদস্ত ইতিবাচক শক্তি হাসিল করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রশিক্ষণের উপায়-উপকরণ

পেছনের পাতাগুলোতে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, ইসলাম মানুষের অন্তরের কত গভীরে প্রবেশ করে এবং কত সূক্ষ্মভাবে তার মনকে পর্যালোচনা করে। তার বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করে, তাকে সঠিক দিকদর্শন দেয় এবং সব দিক থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগায়। এখন আমরা অলোচনা করবো যে, ইসলাম শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার ভেতরেই নিজের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং ইসলাম মানুষের সামনে এক বাস্তব নমূনা (দৃষ্টান্ত) পেশ করে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে ; এর সাথে ওয়াজ নছীহতের দ্বারা, ভাল কাজের পুরষ্কার সম্পর্কে নিশ্চয়তাদান, মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা দান করেছে। কারণ এর প্রত্যেকটি পদ্ধতিই মানব মনের উপর গভীর রেখাপাত করে।

প্রশিক্ষণ দানে ব্যক্তিত্বের নমুনা পেশ

মানুষকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তার মধ্যে আদর্শ ব্যক্তিত্বের জীবনাদর্শ পেশ করে তাঁর অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি। বাস্তবিক পক্ষে প্রশিক্ষণ দানের উপর একটি পুস্তক রচনা করা এবং তার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক ও আকর্ষণীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তুলে ধরা খুব কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়, অথচ যে কোন ব্যবস্থা সঠিকভাবে তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন তা কোন জনগোষ্ঠির মধ্যে বাস্তবে রূপ নেয়, যা মানুষ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে এবং বাস্তবে যার দাবিসমূহ পূরণ করা হয়।

আল্লাহ সুবহানুহু ওয়াতায়ালা জানতেন যে তাঁর প্রদত্ত সুন্দরতম পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন একজন ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন যিনি তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবে সে পদ্ধতিগুলো সর্বোতভাবে প্রয়োগ করে দেখাবেন এবং তাদেরকে বুঝবার সুযোগ দেবেন যে, তিনি আর পাঁচ জনের মত সংসারের সব ঝামেলার মধ্যে ঘেরাও থাকা অবস্থায় যখন ঐ উন্নত গুণাবলীকে আত্মস্থ করতে পেরেছেন তখন অন্য মানুষের পক্ষেও সেগুলো গ্রহণ করা সম্পূর্ণ সম্ভব। আসলে এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই আল্লাহপাক, নবী মুহাম্মদ (সঃ)-কে

দুঃখ বেদনাপূর্ণ এ সংসারের সকল জ্বালা দিয়েছিলেন, দুঃখ-বেদনা, সংকট-সমস্যা, অভাব অভিযোগ বাধা বিপত্তি এবং ক্ষতি-লোকসান ও শত্রুতা যত প্রকার হতে পারে সবাই তাঁর জীবনে এনে দিয়ে সে অবস্থায় এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের কি ভূমিকা তা দেখে বাস্তবে অনুসরণ করার পথ সহজ করে দিয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب ـ٢١)

"তোমাদের জন্য অবশ্যই রয়েছে আল্লাহর রাসূলের (জিন্দেগীর) মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ।"(আহ্যাব-২১)

তাঁর চরিত্র সম্পর্কে হযরত আয়শা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, "তাঁর চরিত্র হচ্ছে স্বয়ং কুরআন।" বড় সংক্ষিপ্ত, বড় অর্থপূর্ণ এবং অতি সত্য ছিল এ জওয়াব। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র জীবনই হচ্ছে কুরআনুল কারীমের বাস্তব নমূনা (দৃষ্টান্ত) এবং মূর্তমান প্রতীক। আর কুরআনুল কারীম যেন এক সার্বজনীন শক্তি, তেমনি নবী পাক (সঃ) এর পবিত্র জিন্দেগীও আল্লাহপাকের সৃষ্টির মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি, যার মধ্যে সৃষ্টির সকল শক্তি পুঞ্জিভূত ছিল এবং সৃষ্টির সকল আইন পূর্ণত্ব লাভ করেছিল। তার গোটা অস্তিত্বই ছিল নূরের তৈরী, বরং নূরের প্রতিমূর্তি।

আজ বৈজ্ঞানিক উন্নতি এতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সকল বস্তু (Matter) আসলে শক্তিরই স্থূলরূপ এবং শক্তি, নূরের প্লাবন (আলোকমালার প্লাবন Radiation)-এর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। মানুষও এক শক্তি যা নূরে পরিবর্তিত হয় এবং তার গোটা অস্তিত্ব হচ্ছে 'নূর'। আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ (সঃ) ও সর্বৈব নূর এবং নূরের প্রতিমূর্তি এবং গোটা বিশ্বজাহান তাঁরই নূরের দ্বারা আলোকিত এবং চির দিন আলোকিত থাকবে।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ الاَحزب : ٤٥ـ٤٦)

"হে নবী! নিশ্চয়ই আমি (মহান আল্লাহ) তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে, সুসংবাদদাতা হিসেবে, সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর দিকে তাঁরই নির্দেশে আহ্বানকারী হিসেবে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসেবে।" (আহযাব-৪৫-৪৬)

এ নূর বা বাতি ছিল মুহাম্মদ (সঃ)-এর, দ্বারা লোকেরা হেদায়েত পেয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ সেই নূরের দ্বারা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল তারা রাসূল (সঃ)-এর সাথে এমন মুহাব্বাত এর সম্পর্ক স্থাপন করেছিল যা দুনিয়ার

কেউ কোন দিন কারো সাথে করেনি। বরং আরো বড় সত্য হচ্ছে যে, যারা ঈমান কবূল করেনি, যারা তাঁর আনীত জীবনাদর্শের বিরোধী ও দুশমন ছিল, তারাও তাঁকে ভাল বেসেছে।

তারপর যখন সত্য-মিথ্যার সংঘর্ষ শুরু হলো, যা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, সে সংগ্রামে তিনি সংগতভাবে জয়ী হয়েছেন। এ বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য আসার পর অন্ধকার বিদূরীত হলো এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর নূর সমুজ্জল সূর্যের ন্যায় গোটা আরব ব-দ্বীপের উপর দেদিপ্যমান হয়ে গেল। এই নূর সারা বিশ্বের জন্য চিরতরে হেদায়েতের নূর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল যা থেকে ক্বেয়ামাত পর্যন্ত বিশ্ববাসী উপকৃত হতে থাকবে।

রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র সত্ত্বাই ছিল নূরের পুতুল, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বগ্রাসী ও অতি মহান। তিনি একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বর্ণের অবস্থার অধিকারী ছিলেন এবং সকল দিক ও সকল গুণ বিবেচনায় তাঁর পূর্ণত্ব ষোল কলায় পৌঁছেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের আত্মিক দিকটা এত ব্যাপক, এত শক্তিশালী এবং পূর্ণাঙ্গ ছিল যে, হজরত ঈসা (আঃ)-এর আত্মিক দিক সবটুকুই তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাঁর মধ্যে শারীরিক শক্তি এত অধিক ও পূর্ণাঙ্গ ছিল যা যে কোন বড় বাহাদুর থেকে তা বেশি ছিল। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন মনে হতো পথের মধ্যে তাঁর কদম মুবারক বসে যাচ্ছে, প্রত্যেক সমস্যার ব্যাপারে তিনি এত বেশি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতেন যে, তাতে তাঁর পূর্ণ আন্তিরকতা প্রকাশ পেতো। যুদ্ধের সময় তাঁর ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা দেখে মনে হতো তিনি কোন তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছেন। হজরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, যুদ্ধের সময় শ্রেষ্ঠ বাহাদুরগণ একমাত্র তাঁর ধারে কাছে থাকতে পারত। তিনি বিয়ে শাদী করেছেন এবং জীবনের কোমল বৃত্তিগুলো থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করেছেন যা একজন সুস্থ, পূর্ণাঙ্গ, শক্তিশালী ও বাহাদুর মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময়ে হাত পুরাপুরি প্রসারিত করে পূর্ণ আগ্রহের সাথে সালামের আদান প্রদান করতেন। যখন তিনি খুশী হতেন, পূর্ণ মাত্রায় খুশী হতেন। তাঁর অন্তরের খুশী তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তা অনুভব করতে পারতেন, আর অসন্তুষ্ট হলেও তাঁর চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠত এবং চেহারা মুবারকের উপরে একটি শিরা জেগ উঠত এসব কিছু এ কথাই ব্যক্ত করছে যে, শারীরিক, মানসিক ও মানবিক যাবতীয় শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার তিনি পূর্ণ অধিকারী ছিলেন।

তিনি একজন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও ছিলেন এবং এই দিকটির সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি তাঁর উম্মতকে একত্রিত করে ইতিহাসের এমন অধ্যায় রচনা

করেছিলেন যার কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তাঁর উম্মতকে সংগঠিত করে তাদের উন্নতি অগ্রগতি ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন।

তিনি একজন মর্দে-মুজাহিদ এবং একজন ফৌজি জেনারেলও ছিলেন। তিনি পরিকল্পনা তৈরি করতেন, সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন, নিজে যুদ্ধে শরীক হতেন এবং বিজয়ী হয়ে ফিরতেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে এতই মনযোগী ও তৎপর থাকতেন যে, যুদ্ধ ছাড়া আর তাঁর আর কোন কাজ ছিল না।

তিনি একাধারে পিতা, স্বামী, ছাপোষা বৃহদাকার সংসারের মুরুব্বী এবং নিজের বংশের অভাব-অভিযোগ তদারককারী ও মোচনকারী। এ ছাড়াও তিনি ঐ বংশধরদের চিন্তা-চেতনা ও মনস্তাত্বিক প্রয়োজনও পূরণ করতেন এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও এমনভাবে পালন করেছেন যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবী আজ পর্যন্ত দেখাতে পারে নি। তিনি বন্ধু ছিলেন, সংগী ছিলেন, আত্মীয়ও ছিলেন এবং এ কারণে মানুষের পেরেশানীতে তিনি দুঃখিত হতেন। জনগণের চিন্তা তাঁর অন্তরের মধ্যে সব সময়েই থাকত, তিনি তাদের অসুস্থবাস্থায় শুশ্রুষা করতেন, সাক্ষাত করতে বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যেতেন, তাদের সাহায্যও করতেন এবং তাদের সাথে মুহাব্বত ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন এবং এ কাজগুলো এত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে করতেন যে, অন্য কেউ করতে গেলে এ গুলোতেই তার সারা জীবনের সময় কেটে যেতো।

নামায ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো এত নিষ্ঠার সাথে আদায় করতেন যে, নামাযের সময় তাঁর দুনিয়া সম্পর্কে কোন খবর থাকত না, অন্তরেও দুনিয়ার চিন্তা থাকত না আর অন্য দিকে খেয়ালও যেত না।

এ সকল দিক ও গুনাবলীর কারণে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এক সামগ্রিক বিপ্লবের অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন। তাঁর এই সকল গুণাবলী তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সাথে বিরাজ করত। আসলে এতো ছিল সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত এক অত্যুজ্জ্বল নূর যা তাঁর ব্যক্তিসত্বার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল আর এ কারণেই তিনি বিশ্বজগতের সবার কাছে প্রিয় ও অনুসরণযোগ্য হতে পেরেছিলেন।

আল্লাহপাকের এ এক অলৌকিক ক্ষমতা যে, যেমন করে তিনি কুরআনে কারীমকে এক পরিপূর্ণ সামগ্রিক প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী এবং ব্যাপক অর্থবোধক, ভুল ও পরিবর্তনের উর্ধ্বে সহজে মুখস্তযোগ্য ও স্থায়ীভাবে মুখস্ত থাকার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বানিয়েছেন, তেমিন এর বাহক ও শেষ নবী (সঃ)-কেও এক পরিপূর্ণ এবং মহত্তম গুণাবলীর অধিকারী করে প্রেরণ করেছেন। তাঁর অস্তিত্বকে আল্লাহপাক সার্বজনীন হওয়ার যোগ্যতায় ভূষিত করেছেন ; বরং

সারা বিশ্বের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার, যোগ্যতা, নিপুণতা, পরিপূর্ণতা, সকল গুণের উৎস এবং সত্যের প্রতীকরূপে সৃষ্টি করে জগৎবাসীদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়সা (রাঃ) বলেনঃ "তাঁর চরিত্রেই কুরআন।"

মানুষের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ ব্যক্তিত্ব

নবী করীম (সঃ) এ পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীর জন্য এক আদর্শ নমুনা হিসেবে তশরীফ এনেছিলেন। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বাস্তবে তাঁর মধ্যে ঐ সব গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর সত্যতা স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ যে কথাগুলো, যে নির্দেশাবলী এবং যে আইন কানুনের কথা তাঁর কুরআনে কারীমে তেলোওয়াত করতেন সেগুলোকে বাস্তবে তাঁর মধ্যে দেখতেন আর মুগ্ধ হতেন আর বিস্ময়াবেগে হৃদয় আপ্লুত হতো, মনের মধ্যে এক আন্দোলন সৃষ্টি হতো এবং এমনভাবে মোহিত হয়ে যেতেন যে তাঁরা মুক্ত গগণের এ পূর্ণ চন্দ্রের সোনালী আভাকে মুঠো মুঠো আত্মস্থ করার জন্য পাগল-পারা হয়ে যেতেন। তাঁর স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে তৃষিত হৃদয় আকণ্ঠ পান করার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন এবং নবুওতের নূর থেকে নিজেদের আত্মাকে আলোকিত ও সমুজ্জ্বল করার জন্য নিশিদিন সযত্ন প্রচেষ্টা চালাতেন।

মানব জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসে তঁর পবিত্র অস্তিত্ব সর্বাধিক বাস্তব নমুনা, বরং আদর্শের বাস্তব প্রতিমুর্তি। কথার পূর্বে বাস্তব কাজের মাধ্যমে তিনি মানুষকে পথনির্দেশ করতেন, ট্রেনিং দিতেন, আর প্রদত্ত সেই শিক্ষার আলোক গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর বুকে এক আদর্শ উম্মত যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাকের ঘোষণাঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - (ال عمران : ١١٠)

"এখন বিশ্বের বুকে তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে গোটা বিশ্বের জন্য অনুসরণযোগ্য বানানো হয়েছে। তোমাদের কাজ হচ্ছেঃ তোমরা নেক ও কল্যাণকর যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেবে, (ক্ষমতা হাসিল করে ও ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে) বিরত রাখবে মানুষকে যাবতীয় অকল্যাণকর ও মন্দ কাজ থেকে, আর তোমরা নিজেরাও ঐ সকল কাজের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে পুরাপুরি আস্থাশীল হবে।" (আলে ইমরাণ-১১০)

আল্লাহ সুবহানুহু ওয়াতায়ালা এ উম্মতকে এহাসন প্রদর্শন করতে গিয়ে এরশাদ করছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِم اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

(ال عمران :١٦٤)

"অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিজেদের মধ্য (স্বগোত্রীয়) থেকে একজন নবী পাঠিয়ে তাদের প্রতি এহসান করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে (পড়ে) শোনানা, সেই আয়াতগুলোর শিক্ষার আলোকে তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কুরআন ও বুদ্ধিমত্তার কথা শিক্ষা দেন যদিও এর পূর্বে তারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল।"

(আলে ইমরাণ-১৬৪)

তাঁর পবিত্র জীবন চরিত, তাঁর মুবারক জীবন, তাঁর পরিচ্ছন্ন সুন্নত (কর্ম-বিধি), তাঁর জীবনের বাস্তব আদর্শ-উদাহরণ এবং বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রদর্শিত তাঁর জীবন্ত শিক্ষা কোন বিশেষ যুগ, বিশেষ জাতি ও বিশেষ এলাকার লোকের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর মহান অস্তিত্ব ও তদীয় শিক্ষা ছিল সর্ব যুগের দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য এক জীবন্ত এবং বাস্তবআদর্শ।

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ (الانبياء : ١٠٧

"হে নবী! তোমাকে আমি (মহান আল্লাহ) গোটা বিশ্বের জন্য রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছি।" (আম্বিয়া ১০৭)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ـ (سباء : ٢٨)

"হে নবী! সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্যই তোমাকে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।" (পারা-৩৮)

তাঁর পবিত্র চরিত্র তাঁর পরিচ্ছন্ন জীবনাদর্শ আজও উজ্জল, আজও জীবন্ত এবং আজও ভাস্বর হয়ে আছে। আর ততদিন জীবন্ত থাকবে যতদিন বিশ্বের এ কারখানা চালু থাকবে এবং যখন পবিত্র মহান চরিত্র পাঠ করা হবে তখনই তার নেক প্রভাব আঁধারে পথ হাতড়ে বেড়ানো। এ ভ্রান্ত মানুষকে হেদায়েতের আলোকে আলোকিত করতে থাকবে তা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে থাকবে, নবুওতের জামানায় যে সব সাহাবা তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর বাস্তব কর্মকাণ্ড অবলম্বনে সরাসরি হেদায়েত লাভ করেছিলেন তাঁদের অন্তরগুলো তাঁর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা এ নূরের আলোকে এত শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিলেন

যে, সংখ্যায় অত্যন্ত নগন্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মানবেতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও যে কোন ব্যক্তি আগ্রহ ও মুহাব্বাতের ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর জীবন চরিত অধ্যায়ন করবে সে নবুওতের নূর ও শক্তি হাসিল করতে পারবে।

আসলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এ প্রভাব আজকে এটা কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়, তার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর জাতিসমূহ স্থানীয় কোন বীর সাহসী নায়কের অনুসরণ করে তাদের জীবন পথ রচনা করে নেয় এবং অনেক উল্লেখযোগ্য কীর্তি স্থাপন করে। তাদের এ কীর্তি স্থানীয়ভাবে খ্যাতি অর্জন করে, কিন্তু যখন গোটা বিশ্বভিত্তিক কোন বীর পুরুষের উদ্ভব হয় তখন তার জীবন হয় তুলনামূলকভাবে আরো ব্যাপক, তার শিক্ষা হয় আরো সর্বাত্মক এবং তার কীর্তি হয় আরও সুন্দর প্রসারী ও আরো স্থায়ী। এ যুক্তি অনুসারে এটা সহজে বুঝা যায় যে, যে মহান সত্বাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা বিশ্বের জন্য আদর্শ বানিয়ে পাঠিয়েছেন তার জীবন কত ব্যাপক হতে পারে, তার প্রভাব কত স্থায়ী হতে পারে!

তাঁকে তো মহান গোটা বিশ্বের জন্য, সকল যুগের জন্য এবং সকল জাতির জন্য পাঠিয়েছেন। আর সর্বকালের সকল মানুষের জন্য বানিয়েছেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যাতে করে যতদিন চন্দ্র-সূর্য আলো দিতে থাকবে, যতদিন দুনিয়া টিকে আছে এবং তার বুকে যতদিন মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবে তাঁর জীবনাদর্শ থেকে মানুষ ততদিন আলো সংগ্রহ করতে থাকবে। তাঁর হেদায়েত থেকে শিক্ষা নিতে পারবে এবং ব্যক্তিত্বকে কুরআনে কারীমের বাস্তব ব্যাখ্যা (Parctical Interpretation) বলে বুঝতে পারবে ; আর তাঁর আনীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পেরে তাঁর উপর ঈমান আনতে পারবে এবং তাঁর প্রতিটি দিক ও বিভাগকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে।

নবুওতে মুহাম্মদীকে সর্বগুণে ভূষিত করার ব্যবস্থা এটা আল্লাহপাকের নিজস্ব তদ্বীর (কার্যধারা), যা আল্লাহপাকের প্রেরিত পবিত্র কুরআনেরই অনুরূপ।

আদর্শ ব্যক্তিগণ

ইসলাম আদর্শের এ বাস্তব প্রতিমূর্তিকে এবং আদর্শ দৃষ্টান্তকে মানুষের সামনে এজন্য পেশ করেছেন যাতে করে তাকে দেখে সত্য সঠিক জিনিষ বুঝা তার পক্ষে সহজ হয় এবং তাকে অনুসরণ করার এক স্বাভাবিক আগ্রহ তার নিজের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় যার ফলে সে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সে জীবনাদর্শের অনুসরণ

করতে পারে এবং নিজের জীবনকে তার আলোকে গড়ে তুলতে পারে ও তার নূরের প্রভায় নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করে তার হুকুম-আহকাম ও হেদায়েত অনুসারে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তব কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই শিক্ষা দানের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইসলাম যে শিক্ষা দেয় তার মাধ্যমে গড়ে উঠা লোকদের সামনে বাস্তব আদর্শ ও ঐ আদর্শের প্রতিমূর্তিগুলো তুলে ধরাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে পিতামাতার কর্তব্য হলো, ইসলামী মূলনীতি ও হেদায়েতের ভিত্তিতে নিজেদেরকে গড়ে তোলা ও তার বাস্তব নমুনা এবং আদর্শের বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে সন্তানদের সামনে ফুটে উঠা, যাতে করে বাচ্চাদের প্রকৃতির মধ্যে এ বাস্তব দৃষ্টান্ত অংকিত হয়ে যায়। এবং হেদায়েতের কথাগুলো তাদের মনে গেঁথে যায় ; আর ঐ আলো ও তার উজ্জ্বলতার মধ্যে থেকে সে শিক্ষা পেতে পারে। সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও এই ভাবধারা চালু হওয়া দরকার, সেখানেও প্রতিটি ব্যক্তি ইসলামের বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে ফুটে উঠলে আশা করা যায় তাদের পরবর্তী বংশধরগণ তাদের থেকে সঠিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় হেদায়েত গ্রহণ করতে পারবে এবং তাদের অনুসরণে সঠিক পথে চলতে পারবে। আর এর জন্য সমাজের কর্তাগণ, রাষ্ট্রের কর্ণধার, জাতির নেতা ও দেশের শাসককেও ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে। তাদের বাস্তব জীবন এবং সমাজে তাদের অস্তিত্বই হবে সামগ্রিকভাবে গোটা জাতি ও অনাগত বংশধরদের জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত, যারা রাসূল (সঃ)-কে আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসেবে তাদের সামনে হাজির পাবে।

ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণে শিক্ষাগ্রহণ শুধুমাত্র কোন ব্যক্তির এমন কোন কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় যা কখনও সফল হবে এবং কখনও হবে বিফল, বরং ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে এমন এক পূর্ণাংগ, সর্বাত্মক এবং সার্বজনীন পদ্ধতি যা একজন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে একজন দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, আইন আদালতে ইসলামের আইন কানুন চালু করা, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও পার্লামেন্টে ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণ করা, কারণ প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থা যে কোন পথ বেছে নেবে তা ঐ মূল ভিত্তির উপর রচিত হতে হবে যার উপর তা দাড়িয়ে আছে।

এই অবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ইসলাম তার প্রশস্ত পথকে উন্মুক্ত করার জন্য নিজস্ব পদ্ধতিগুলোকে কাজে লাগায়। তারপর ইসলামী সমাজ বাস্তবে কায়েম হয়ে গেলে সে সমাজের যারা আদর্শ ব্যক্তি আছে, তাদের বাচ্চাদের সামনে এবং অনাগত বংশধরদের সামনে

তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, তার থেকে তাদেরকে শিক্ষা দান করে। এর কারণ হচ্ছে, যে বাচ্চার পিতা নিজে মিথ্যা কথা বলে, সেই বাপের ছেলে কখনো সত্য কথা শেখে না, শিখতে পারে না, আর যে বাচ্চা তার বাপ-মাকে ধোকাবাজি অথবা আমানতের খিয়ানত করতে দেখে, সে কখনো আমানতের হক আদায় করতে পারে না। আর যে বাচ্চা মাকে দুশ্চরিত্র দেখতে পায় তার মধ্যে উন্নত মানের-গুণ গড়ে উঠতে পারে না। যে পিতা বাচ্চাদের সাথে কঠোর ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তারা কাউকে সহযোগিতা করতে বা কারো প্রতি রহম করতে পারে না।

পরিবারই প্রথম শিক্ষালয়, যেখানে বাচ্চারা আবেগ অনুকম্পা, কোন জিনিস পছন্দ করার যোগ্যতা, ব্যবহার এবং বাস্তব শিক্ষা লাভ করে। এজন্য একজন মুসলমানের ঘরোয়া পরিবেশ বড়ই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং সভ্য ভদ্র হতে হবে যাতে করে অনাগত বংশধরগণ ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে উন্নতমানের গুণাবলী হাসিল করতে সক্ষম হয় এবং নবী (সঃ)-এর সুন্নাতের অনুসারী হতে পারে। এরপর এ পদ্ধতি অবলম্বনে তার বাহ্যিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। ঘরে যে শিক্ষা বাচ্চারা পায় বাইরের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং তাদের সাংগঠনিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে সেই শিক্ষারই প্রতিফলন সে প্রত্যক্ষ করে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যায় ; যে শালীনতা, যে ভদ্রতা, যে সহনশীলতা, যে ধৈর্য ও ত্যাগ সে পিতামাতা ও ঘরের পরিবেশে দেখে তার অজান্তেই সেগুলো তার মজ্জাগত হয়ে যায় ; এর সাথে সাথে স্কুলে গেলে যদি এ শিক্ষাই পায়, বই-এর পাতায় পাতায় যদি তার মজ্জাগত শিক্ষার প্রতিচ্ছবি অবলোকন করে, শিক্ষকের কাজে, ব্যবহার ও জবানীতেও যদি ঐ শিক্ষার ঝলক অনুভব করে ; আবার রেডিও-টেলিভিশনে যদি তার মনের বীনায় গাথা আওয়াজ ঝংকৃত হতে শুনে এবং খবরের কাগজে যদি তার মনের কথাগুলোই দেখতে পায় তখনই তার কাছে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবতা ধরা পড়বে। চলতে ফিরতে, সমাজ জীবনের সবখানে ব্যবহার করতে ইসলামকে সে বাস্তব রূপে দেখে মুগ্ধ হবে এবং তার আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে পারবে। এভাবে সেও হবে ইসলামের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

উপদেশ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান

মানুষের মনের মধ্যে কথা থেকে শিক্ষা ও প্রভাব গ্রহণের যোগ্যত রয়েছে, কিন্তু যেহেতু প্রভাব অস্থায়ী, এজন্য কথার বারংবার পুনরুক্তির প্রয়োজন হয়।

প্রভাবপূর্ণ কথা আবেগ-অনুভূতির পথ ধরে তার গোটা সত্বাকে পরিচালিত

করে, কিন্তু এর সাথে সে যদি উপদেশ দাতার মধ্যে ঐ কথাগুলো বাস্তবে প্রত্যক্ষ না করে এবং ঐ কথাগুলো বাস্তবায়িত করার মত পরিবেশে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা না পায় তখন ঐ উপদেশগুলো প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। কারণ বাস্তব দৃষ্টান্তই মানুষের অন্তরের পর্দায় স্থায়ী ও মজবুত ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়, আর এর সাথেই যদি তার সামনে ভাল উপদেশ আসে তাহলে তার পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

সর্বাবস্থায় মানুষের প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে ও শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে উপদেশের গুরুত্ব সর্বাধিক মানুষের মনের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে এমন কিছু ঝোঁক প্রবণতা বর্তমান রয়েছে, যেগুলোকে উপর্যুপুরি ধার দেয়া প্রয়োজন। সেগুলোকে শালীনতা, ভদ্রতা ও অন্যান্য সদ্গুণাবলীর শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে দিয়েই যেতে হয় এবং এজন্য উপদেশ-দানের পদ্ধতি অপরিহার্য, যেহেতু উপদেশ শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ ছাড়াও, অনেক ক্ষেত্রে এমনো দেখা যায়, বাস্তব নমুনা সঠিকভাবে কাজ করে না। যেমন, কোন পিতামাতা চুরি না করলেও তার পুত্র খারাপ পরিবেশের প্রভাবে চৌর্যবৃত্তির বিষাক্ত ছোবলে পড়ে বিপথগামী হয়ে যায়। অথবা পিতামাতা মিথ্যা না বললেও অনেক সময়ে, বিরূপ পরিবেশের প্রভাবে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কারণে অথবা পিতামাতার কোন ত্রুটিকে চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে ফেলে। অনেক সময়ে এমনো দেখা যায় বাপ-মা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন নন, কিন্তু সন্তান মুক্ত পুচ্ছ পাখীকে ধরে মেরে ফেলে, বিড়ালের লেজ ধরে টানাটানি করে তাকে ব্যথা দেয়, এধরনের অবস্থায় তাদেরকে সদুপোদেশ দান করে ঐ কদর্য ব্যবহার পরিহার করার শিক্ষা দিতে হয় এবং সুন্দর ব্যবহার গ্রহণ করার জন্য বুঝাতে হয, যাতে করে আরো সুন্দর, উন্নত ও রুচিশীল হয়ে গড়ে ওঠে।

বাচ্চাদের মত বড়দের জন্য ও সর্বক্ষণ ও উপর্যুপরি উপদেশ প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় তাদের জন্যও শুধু বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয় না। এমনও হয় যে, শাসক ন্যায় পরায়ণ হয় ; কিন্তু প্রজাগণ নানা প্রকার জুলুম ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে। কখনো নেতৃবৃন্দকে চরিত্রবান দেখা যায় ; কিন্তু জনসাধারণ নিজেদের কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে মগ্ন থাকে এবং চারিত্রিক অবনতির ভেতর হাবুডুবু খায়। এ ধরণের অবস্থাতে উপদেশ দান অনিবার্য হয়ে উঠে। এ সকল কারণেই কুরআনে কারীমের বহু স্থানে উপদেশাবলী পরিলক্ষিত হয়।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ - (النساء : ٥٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যত প্রকার আমানত (বিশ্বস্ততার কাজ বা দায়িত্ব আছে) তা তার যোগ্যপাত্রে দান কর, আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তায়ালা সুন্দরভাবে তোমাদেরকে উপদেশ দান করছেন।"(নিসা-৫৮)

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًاوَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ـ (النساء : ٣٦)

"আর আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক (অংশীদার) করো না ; পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করো, নিকটবর্তী (আত্মীয়-অনাত্মীয়) সবার সাথে, ইয়াতীম অভাবগ্রস্তদের সাথে, দূর ও সাময়িক প্রতিবেশী, স্থায়ী ও নিকট প্রতিবেশী, মুসাফির এবং যারা তোমাদের অধীনে আছে সেই সকল ব্যক্তি, সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। নিশ্চই আল্লাহ্ তায়ালা আত্মম্ভরী ও নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

(নিসা-৩৬)

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ : يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ . وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَيَّ الْمَصِيْرُ . وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ . يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ج اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ . يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ . وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ . وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ج اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ . (لقمان -١٣ - ١٩)

"স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা, যখন লোকমান (হাকীম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছিল, হে পুত্র আমার! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক বাস্তবিকই বহুত বড় জুলুম। আর আমি (মহান আল্লাহ) চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে যেন সে পিতামাতার হক্ব আদায় করে ; তার মা তাকে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা ভোগ করার মধ্যে দিয়ে গর্ভে (ধারণ) বহন করেছে এবং দু' বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে গিয়ে এ জন্যই তাকে আমি (মহান আল্লাহ) নসীহত করেছি, একাধারে আমার শুক্‌রগুজারী করো এবং তোমরা পিতামাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আমার নিকটেই তো ফিরে আসতে হবে। আর যদি ওরা উভয়ে মিলে তোমর দ্বারা এমন কোন কাজ করানোর চেষ্টার করে যার কারণে আমার সাথে কাউকে বা এমন কিছুকে শিরক (অংশীদার) বানানো হয় যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই (অর্থাৎ তাদের কোন ক্ষমতা আছে বলে তোমার জ্ঞানে আসে না) তাহলে সে অবস্থায় তাদের কথা মানবে না ; তবে সে অবস্থাতে ও দুনিয়ার জীবনে বসবাসকালীন অবস্থায় তাদেরকে উত্তম সঙ্গ দান করো। আর যে সব লোকেরা আমার দিকে রুজু হয়েছে তাদের পথের অনুসরণ করে, তারপর, জেনে রেখো যে, আমার কাছেই তোমারেদকে ফিরে আসতে হবে এবং তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ঐ সব কাজ (ও তার পরিণতি) সম্পর্কে যা তোমরা (পৃথিবীর বুকে) করতে। হে আমার পুত্র! যদি কোন জিনিষ একটি রাইয়ের পরিমান ছোট্ট একটি দানায় পরিণত হয় এবং কোন পাথরের মধ্যে অথবা আকাশমণ্ডলীর কোথাও বা পৃথিবীর কোন অংশে লুকিয়ে থাকে সেখানে থেকেও আল্লাহ্ তায়ালা তা নিয়ে আসবেন (তাঁর কাছে), নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। হে আমার পুত্র! নামায কায়েম কর এবং ভাল কাজসমূহের নির্দেশ (ক্ষমতাবান হয়ে) দান কর এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখ, আর একাজ করতে গিয়ে যদি বাধা বিপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদ অপদ আসে—আসবেই, সে অবস্থাতে সবর কর (অবিচল থাক অস্থির হয়ো না)। এ হচ্ছে সেই সব কাজ যা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ মন দরকার। আর লোকদের কথার জওয়াব দিতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীর বুকে অহংকারপূর্ণভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক অহংকারী ও নিজের প্রাধান্য বিস্তারকারী লেকাদেরকে পছন্দ করেন না। (হে পুত্র) তোমার চাল চলনকে মধ্য গতিসম্পন্ন কর এবং তোমার আওয়াজ (কণ্ঠস্বরকে নরম কর, নিশ্চয়ই অপ্রিয় কণ্ঠস্বর গাধার আওয়াজের শামিল (বিকট ও শ্রুতিকটু)।"

لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلاً ۔ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ج اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۔ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۔ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا ۔ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ج اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۔ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ج اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۔ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً ۔ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلاَ يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ۔ وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ج وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ۔ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ج ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ۔ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ج اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً ۔ وَلاَ تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ۔ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۔ (الاسراء : ٢٢-٣٨)

"আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ো না, যদি কর তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। তোমার রব এ বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, খবরদার তাঁর আনুগত্য ছাড়া কারো আনুগত্য

করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্য প্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছে যায় (তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে) তাহলে সে অবস্থায় তাদেরকে "উহ্" বলো না (তাদের কোন বিরক্তিকর ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে "উহ্" বলবে না অথবা তাদের মুখ থেকে "উহ্" বের হওয়ার মত কোন ব্যবহার করবে না আর তাদেরকে ধমকও দেবে না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। বিনয়—নম্রতা ও দয়ালু চিত্তে তোমার বিনায়াবনত বাহুকে তাদের সামনে ঝুঁকিয়ে রাখবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলবে, হে আমার প্রতিপালক তাদের প্রতি তেমনি করে রহম (দয়া) করুন যেমন করে তারা ছোট বেলায় আমাকে করুনাভরা মন নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের রব ভাল ভাবে জানেন তোমাদের মনের কথাগুলো। যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা নেককার হও তাহলে সে অবস্থায় তাঁর দিকে রুজুকারী যারা তাদের জন্য তিনি ক্ষমাশীল। নিকটবর্তী লোকজন, আত্মীয় স্বজন, বাস্তুহারা ও মুসাফিরকে তার পাওনা (হক্ব) বুঝিয়ে দাও, কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর যদি কাউকে দেয়া থেকে এজন্য বিরত থাকতে চাও যে, তাকে না দিলেই (তোমার বিবেচনায়) তোমার রব খুশী হবেন, যে খুশী তোমার কাম্য, তাহলে সে অবস্থাতেও তার সাথে বেঁধে রেখো না (কাউকে কিছু না দেয়ার মানসে)। আর একেবারে দুহাত প্রসারিত করে সব কিছু বিলিয়ে দিও না, যার পরিণতিতে তুমি নিন্দিত এবং আক্ষেপকারী হিসেবে বিলাপ করবে। নিশ্চয়ই জেনে রেখো তোমার রব যার জন্য খুশী তার জন্য জীবন ধারণ সামগ্রী (রিজিক) পাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য খুশী তার জন্য তা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি তঁর বান্দাহর সব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং সব কিছু তিনি দেখেন। আর শোনো, নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা গুনাহে কবীরা। আর জ্বেনার নিকটবর্তী হয়ো না (যে সকল কাজ ধীরে ধীরে তোমাদেরকে ব্যভিচারের দিকে এগিয়ে দেবে বলে বুঝবে সেগুলো থেকে দূরে থাকবে)। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট কাজ এবং অত্যান্ত জঘন্য জীবন পথ। আর কাউকে বিনা যুক্তিসংগত কারণে হত্যা করো না, কারণ প্রত্যেকের জীবনকে আল্লাহ্তায়ারা সম্মানিত করেছেন, আর যে ব্যক্তি মজলুম নিহত হবে তার ওয়ারিশকে, আমি (মহান আল্লাহ্) হত্যার প্রতিশোধ পাওয়ার ক্ষমতা দান করেছি। সুতরাং তারও কর্তব্য সে যেন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা অতিক্রম না করে, নিহত সে ব্যক্তি তো আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত। আরও বলছি, ইয়াতীমের মালের ধারে কাছেও কেউ ঘেঁসবে না, তবে

তার অভিভাবত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য সময় ও শ্রম দান করতে গিয়ে যে আর্থিক টানাপোড়নে তোমাদের পড়তে হয় সে সময় ওরা তাদের মাল-সামান বা সম্পত্তি সংরক্ষণ করার মত যোগ্য না থাকায় কিছু পারিশ্রমিক নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সে অবস্থায় যতটা নিলে উচিত পারিশ্রমিক নেয়া হবে তার অতিরিক্ত যেন না নেয়া হয়। ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করা নিশ্চয়ই চুক্তিপূরণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মাপের কাঠা দিয়ে যখন কোন কিছু মেপে দাও তখন তা ভরে দাও বা পাল্লা দিয়ে ওজন করে যখন দাও তখন তা সঠিকভাবে ওজন করে দাও, এ সঠিক মাপ দেয়াই তোমাদের জন্য উত্তম এবং পরিণতির বিবেচনায় আরো সুন্দর! আর যে বিষয়ে তোমার (প্রকৃত ও সঠিক) জ্ঞান নেই সে বিষয়ে মাথা ঘামিয়ো না, তার পেছনে লেগে যেয়ো না (এতে ফায়দা থেকে ক্ষতিই বেশি হওয়ার ভয় আছে); নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর এদের প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পৃথিবীর বুকে চলাফেরার সময় বিজয়গর্বে বেশি উল্লসিতভাবে চলাফেরা করো না, নিশ্চই তুমি কিছুতেই পৃথিবীকে ফাটিয়ে দিতে পারবে না অথবা পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে পৌঁছুতে পারবে না। এসব কাজের প্রত্যেকটির মন্দ দিক তোমার রব-এর নিকট অপছন্দনীয়।" (বণী ঈসরাইল ২২-৩৮)

কুরআনে কারীম থেকে নমুনাস্বরূপ কিছু উপদেশ ও পরামর্শ এখানে তুলে ধরা হল। প্রকৃতপক্ষে কুরআনুল কারীমের সবটুকুই তো ওয়াজ-নসীহত।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ - (ال عمران : ١٣٨)

"এই কিতাব জনগণের জন্য স্পষ্ট সতর্কবাণী এবং খোদাভীরুদের জন্য হেদায়েত ও নসীহত (সদুপদেশ)।" (আলে ইমরাণ-১৩৮)

শিক্ষাদান করতে গিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা

সমাজের কিছু লোক এমন আছে যাদের উপর বাস্তব দৃষ্টান্ত অথবা সদুপদেশ কোন আছর (প্রভাব বিস্তার) করে না, তখন তাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কঠিন চিকিৎসা অর্থাৎ শাস্তি-সাজার ব্যবস্থা জরুরী হয়ে পড়ে, যাতে করে তাদের সংশোধন হয়ে যায় এবং এর পর তারা সমাজের মূল্যবান ও কর্মক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে।

আধুনিক যুগে প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে যারা নিজেকে পারদর্শী মনে করেন তারা এই শারীরিক সাজা দানকে অপছন্দ করেন, কিন্তু এই শারীরিক শাস্তি না দেয়ার মতবাদ অনুসারে গড়ে উঠা আমিরিকার যে আধুনিক বংশধরগণ আমাদের নজরে

পড়ছে তাদের করুণ অবস্থা সবার সামনে আছে। তারা কত উদার, কত নিয়ন্ত্রণহীন, কত উশৃঙ্খল এবং এর ফলে কত অশান্তি সৃষ্টিকরী।

নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে, সাজা সবার জন্য জরুরী নয় এবং এটা সত্য যে, সমাজে এমন বহু লোক আছে যারা বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে, উপদেশবাণী পেয়ে এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বহু গঠনমূলক ও কল্যাণকর কাজ করে চলেছে, তাদেরকে জীবনভর সাজা দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি ; কিন্তু এর সাথে আর একটি সত্যও আছে যে, সকল মানুষ এক রকম নয়, অনেকে এমন আছে যাদেরকে বারবার শক্ত সাজা দেয়া প্রয়োজন। সাজা ছাড়া তারা শুধরাণোর মত নয়, তাই বলে যে, তাদেরকে একেবারে শুরু থেকেই সাজা দিতে হবে তা নয় বরং প্রথমে তার সামনে বাস্তব বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাদেরকে সংশোধণের চেষ্টা করতে হবে, নানা প্রকার সদুপদেশ ও ওয়াজ-নসীহত এবং আল্লাহ্র ভয় দেখাতে হবে, এভাবে সাজা দেয়ার পূর্বে সংশোধনীর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর সেসবগুলো নিষ্ফল প্রমাণিত হলে তখন উপায়হীন হয়ে সমাজকে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে এবং সাধারণ মানুষকে তাদের অকল্যাণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মুনাসিব পরিমাণ সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে, এটা সংশোধনমূলক, আক্রোশমূলক নয়। সাজাদানকারী সাজা দেয়ার সময়েও তার প্রতি কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে সাজা দেবে এবং ততটুকু হিসেব করে দেবে যতটুকু তার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন, একজন পারদর্শী শৈল্য চিকিৎসক রুগীর পঁচনশীল অঙ্গবিচ্ছেদের সময়ে রুগীর প্রতি যে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়, ঠিক সেভাবে ইসলামী শরীয়ার চিকিৎসকরা সাজা দেয়ার সময় মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইবে।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ اِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔ وَ لَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ج اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۔ (فصلت - ٣٤-٣٣)

"ঐ ব্যক্তি থেকে ভাল কথা আর কার হবে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজেও (ঐ নির্দেশিত) ভাল কাজ করে এবং (প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধবাদী সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা দেয় যে, আমি মুসলমানদের দলের একজন সদস্য। ভাল ও মন্দ কখনো বরাবর নয়, মন্দ ব্যবহারের প্রতিরোধ কর সর্বোৎকৃষ্ট ভাল ব্যবহার দ্বারা তার ফল দাঁড়াবে এই যে, তোমার সঙ্গে যার চরম শত্রুতা রয়েছে সে তোমার পরম বন্ধুত্তে পরিণত হয়ে যাবে।"

(হামীম আস সিজদা ৩৩-৩৪)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۔ (النحل : ١٢٥)

"মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকো হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা।"(নাহাল-১৩৫)

وَالصَّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُوْلُوْنَا - (المزمل : ١٠)

"ওরা (অন্যায়) যে সব কথা বলছে তাতে বিচলিত হয়ো না।" (মুযাম্মেল-১০)

কিন্তু, সকল সমাজেই এবং সর্বকালে এমন কিছু লোক থাকে যারা বর্ণিত সব উপায়-উপকরণ ও ওয়াজ-নসীহত দ্বারা সংশোধন হয় না, তাদের মানসিক বিকৃতি এবং অন্তরের বক্রতা এত জটিল যে, তাদেরকে হিতোপদেশ যত বেশি দেয়া হোক না কেন তাদের সত্য বিমুখতা আরো বেড়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, তাদেরকে উপেক্ষা করা বা তাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সদ্ব্যবহার এবং প্রয়োজনের অধিক বিনম্র ব্যবহার করা হিকমাতের খেলাফ। এ সকল মানুষ নিশ্চিতভাবেই রুগী ও মানসিক ব্যধিগ্রস্ত (Perverted), তাদের মানসিক ব্যধির চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু এমন না হয়, তাদের সত্য বিমুখতার চিকিৎসা মানসিক ব্যধির দোহাই দিয়ে বন্ধ রাখা হয় এবং মানসিক ব্যধিগ্রস্ত বলে তাদেরকে সমাজে যা খুশী তাই করার সুযোগ দিয়ে বিশৃঙ্খলাকে জিয়িয়ে রাখা হয়।

বাচ্চাদের মেজাজকে মজবুত বানানোর সাথে সাথে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, বিনয়-নম্রতা, স্নেহ-মায়া, মমতা ও মুহাব্বাতপূর্ণ ব্যবহারের সঠিক ট্রেনিং যদি দেয়া হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা সমধিক উপকারী বলে প্রমানিত হবে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নরম ব্যবহার এবং প্রয়োজনের বেশি মুহাব্বাত বাচ্চাদেরকে বিগড়ে দেয় এবং তাদের মানসিক অবস্থাও দুর্বল এবং স্থিতিহীন হয়ে যায়।

মানুষের মানসিক অবস্থা শারীরিক অবস্থারই অনুরূপ। শরীরের প্রতি বেশি দয়া দেখালে এবং সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এ ভয়ে যদি তাকে কাজে না দেয়া হয়, আবার শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়বে এ আশাংকায় শরীরকে কঠিন পরিশ্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে সে শরীর কষ্ট-সহিষ্ণু থাকবে না, রোগ প্রতিরোধক শক্তি লোপ পাবে, কষ্টবিমুখ হয়ে উঠবে, বিলাসী ও আরাম প্রিয় হয়ে উঠবে, আলস্যে পেয়ে বসবে, মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে, মন্দ ঝোঁক প্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর কন্ট্রোল থাকবে না এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সংঘাতের সময়ে বাস্তবে এ শরীর এমনভাবে জওয়াব দিয়ে দেবে যে, সে চরম অসহায় ও নির্মমভাবে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠবে। এ জন্য বাচ্চা বা বৃদ্ধ যেই হোক না কেন, তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। চারিত্রিক দৃঢ়তার সাথে সাথে শরীরকেও মজবুত, কষ্ট সহিষ্ণু, যে কোন অবস্থায় শরীরকে কর্মক্ষম হিসেবে পাওয়ার যোগ্য ও রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ করার মত তেজোদৃপ্ত বানাতে হবে।

এ ধরণের ট্রেনিং-এর অনুরূপ হচ্ছে প্রয়োজনমত কঠোর হওয়া, ধমক দেয়া এবং হিসেব মত সাজা দেয়া।

ট্রেনিং দিতে গিয়ে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন

ইসলাম ট্রেনিং দান করতে গিয়ে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এ পর্যায়ে একদিকে যেমন বাস্তব নমুনা পেশ করেছে, সদুপোদেশ দিয়েছে, উৎসাহ প্রদান ও সওয়াবের বয়ান দ্বারা ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনি ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। এ পর্যায়ে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় দেখিয়েছে, যদিও এটি একটি হালকা ধমক ; কিন্তু এ ধমক খাঁটি মুমিনদের জন্য খুবই প্রভাবপূর্ণ ও গভীর গুরুত্ববহ।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ - (الحديد : ١٦)

"ঈমানদারদের জন্য কি এখনো সেই সময় আসেনি, যখন আল্লাহ্র স্মরণে তাদের অন্তরে গলবে এবং তাঁর নাজিলকৃত সত্যের সামনে তারা নুয়ে পড়বে। আর তারা ঐ সকল লোকের মত হবে না, যাদেরকে এর পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং এক দীর্ঘ বয়সও পেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ফাসেক ও মহা অপরাধে লিপ্ত।" (হাদীদ-১৬)

কোন কোন সময় কুরআনে কারীম স্পষ্ট শব্দে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছে; যেমন হজরত আয়শা (রাঃ)-র উপর মিথ্যা কলংক আরোপ সম্পর্কে কুরআন জানিয়েছেঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا ط سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ . يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . (النور : ١٤-١٧)

"যদি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত না থাকত তাহলে, যে সকল কথায় তোমরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলে তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে এক মহা শাস্তি স্পর্শ করত। যখন তোমাদের জিহ্বা দ্বারা ঐ কথাগুলো উচ্চারণ করা হচ্ছিল এবং এক মুখ থেকে অন্য মুখে কথাগুলো পৌঁছে যাচ্ছিল আর তোমরা না জেনে তোমাদের মুখ দিয়ে ঐ কথাগুলো বলছিলে, অথচ তোমরা ব্যাপারটি সহজই মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট ব্যাপারটি খুবই বড় ছিল। তোমরা যখন রটনাটি শুনলে তখন কেন বললে না, "না আমাদের পক্ষে এসব কথা বলা শোভা পায় না। হে আল্লাহ আপনি মহা পবিত্র, এটাতো সাংঘাতিক এক অপবাদ।" তোমরা যদি মুমিন হও তাহলে সাধারণ এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যেন কখনো না হয়। তার জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যথাযথ উপদেশ দিচ্ছেন।" (নূর ১৪-১৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ . (البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে লোকদের কাছে পাওনা যা কিছু সুদ বাকি রয়ে গিয়েছে তা ছেড়ে দাও। তা যদি কিছুতেই ছাড়তে না চাও তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, তোমরাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"(বাকারা ২৭৮-৭৯)

কুরআনে কারীম কোন কোন সময়ে আখেরাতের ভয়ও দেখায় ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا . يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا . (الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩)

"আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ইলাহ (সর্বময় ক্ষমতার মালিক) হিসেবে ডাকে না (সাহায্য চায় না) এবং সঠিক কারণ ছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে না যাকে হত্যা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন এবং যার জান মালকে সম্মানিত করেছেন। আর তারা ব্যাভিচার করে না। আর যে কোন ব্যক্তি এ কাজ করবে সে নানা প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। তার জন্য আযাবকে

দ্বিগুণ করে দেয়া হবে ক্বেয়ামতের দিনে এবং তারা চিরদিন থাকবে সেখানে হীনতা ও অপমানের মধ্যে।" (ফুরকান ৬৮-৬৯)

কুরআনে কারীম দুনিয়ার সাজা সম্পর্কেও ভয় দেখায় ঃ

اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ - (التوبه : ٣٩)

"তোমরা যদি দলে দলে বেরিয়ে না পড় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব দান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন।"(তওবা-৩৯)

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - (الفتح : ١٦)

"আর তোমরা যদি পুনরায় সেইভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, যেমন করে পূর্বে তোমরা চলে গিয়েছিলে তাহলে তোমাদেরকে তিনি বেদনাদায়ক আযাব দেবেন।" (ফাতাহ-১৬)

وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - (التوبه : ٧٤)

"আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে ওদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের সবখানে শাস্তি দান করবেন।"(তওবা-৭৪)

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - (التوبه : ٥٥)

"অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই শাস্তি দিতে চান।"(তওবা-৫৫)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - (النور : ٢)

"জেনাকারীনী ও জেনাকারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মার।"(নূর-২)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا - (المائدة : ٣٨)

"চোর ও চোরণী, (চৌর্যবৃত্তিতে যেই ধরা পড়বে ও প্রমাণিত হবে) তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, এটাও তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান।" (মায়েদা-৩৮)

মানুষের প্রকৃতি ও মেজাজকে সামনে রেখে মানুষকে শাস্তি দেয়ার এসব বিভিন্ন স্তর বয়ান করা হয়েছে। এর কারণ, এমন অনেক লোক আছে যারা ইংগিতেই মূল কথা বুঝে যায় এবং ঐ ভুল কাজ পরিত্যাগ করে, যার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে যাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় এবং খোলাখুলিভাবে তাদের

ভুলগুলো জানানোর পর সংশোধিত হয়। কিছু লোক এমনও আছে যাদেরকে ভবিষ্যতের শাস্তি সম্পর্কে জানানোতেই যথেষ্ট হয়। কিছু লোককে শাস্তি দেয়ার চাবুক দেখালে তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে দাঁড়ায়, আবার কিছু লোক এমনও আছে যাদের শরীরে সাজার আঘাত না পড়া পর্যন্ত তারা শুধরায় না।

কিস্‌সা-কাহিনীর বর্ণনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান ও শোধরানোর প্রচেষ্টা

মানুষের সংশোধনী প্রচেষ্টার মধ্যে অতীতের ঘটনাবলী ও বিভিন্ন কিস্‌সা-কাহিনীর বর্ণনা এক যাদুকরী প্রভাব রাখে, মানুষের অন্তরে এর এমন স্থায়ী আছর হয় যা সহজে মানুষ ভুলে না। এসব কিস্‌সা কাহিনীর কার্যকরিতা চিরদিন ছিল, আছে ও চিরদিন থাকবে। এখন চিন্তা করতে হবে, এ দারুণ কার্যকরীতার কারণ কি? অবশ্য নিশ্চিতভাবে এর কারণ নির্ণয় করা মুশকিল। এর কারণ, হতে পারে, মানুষের চিন্তা শক্তি কাহিনীর স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয় এবং কাহিনীর মধ্যকার ঘটনাবলীকে নিজ চেতনার মধ্যে স্থান করে দেয়, অথবা কাহিনীর মধ্যকার ব্যক্তিবর্গ ঘটনাবলীর মধ্যে মানুষ অনুসন্ধানী মন নিয়ে শরীক হয়ে যায়। অথবা এটা মানুষের মনের এক বিশেষ অভিব্যক্তি শক্তি, এর কারণে মানুষ কাহিনীর ঘটনাবলীর সাথে নিজের জীবনের অনেক কিছুর মধ্যে মিল দেখতে পায় এবং তখন তার ভাল লাগে ঐ কাহিনী যা তাকে বিশেষ কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। একাজটি কোন দলীয় প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব হয় না, এটা মানুষের একাকী অবসরে নিজের অজান্তে সংঘটিত হয়। সকল সময়েই এটা দেখা যায় যে কিস্‌সা-কাহিনীর মধ্যকার ব্যক্তিও ঘটনাবলী পাঠ করার সময় মানুষ এমনই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, তার মনে হয় ঐ বই-এর প্রতি পাতার ছত্রে ছত্রে তার নিজের জীবনের ঘটনাগুলোই বিবৃত হয়েছে। আবার কখনো তুলনা করতে গিয়ে মানুষ দেখে কোন ঘটনা তার জীবনের ঘটনাগুলোর অনুরূপ, কোনটা বিপরীতমুখী এবং কোনটা তার নিকট আশ্চর্যজনক।

কুরআন কারীম মানব-মনের এ প্রকৃতি জেনে বুঝেই তার প্রশিক্ষণের জন্য তার স্বভাবসংগত বিভিন্ন কিস্‌সা-কাহিনীর ও অতীতের ঘটনাবলী তুলে ধরেছে, তার মধ্যে কোনটি দৃষ্টান্তমূলক এবং কোনটি বাস্তব ভিত্তিক। এ সব কিস্‌সা যত ধরণ হতে পারে তা সবই কুরআনে কারীম গ্রহণ করেছে। এ প্রসংগে দেখা যায়, কুরআনে কারীমে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোর স্থান, ব্যক্তিবর্গ এবং ঘটনাবলী সবগুলোই খেয়াল করার বস্তু, কিছু মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার বাস্তব নমুনাস্বরূপ।

ঐতিহাসিক ঘটনাবীলর মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনালেখ্য তাদের প্রতি অস্বীকৃতি এবং অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন অবস্থা ও শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি রূপ নিয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত কিস্সায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ঘটনা, স্থানের নাম ইত্যাদির নাম নিয়ে নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরআউনের ঘটনা, হজরত ঈসা (আঃ)-এর বিবরণ, বণী ঈসরাইলের ঘটনাবলী, হযরত সালেহ্ (আঃ), হুদ (আঃ) এবং আ'দ জাতি, হযরত শুয়াবে (আঃ) ও মাদয়ান শহর, হযরত লুত (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী, হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর জাতি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হজরত ইসমাঈল (আঃ) এর ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনের কিস্সায় হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর দু'পুত্রের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ . (مَائِدَة : ٢٨ - ٣٠)

"হে রাসূল! ওদেরকে আদম (আঃ)-এর দু' পুত্রের খবর কম বেশি না করে সঠিকভাবে শুনিয়ে দাও। স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা, যখন তারা দু'জনেই কুরবানী করল, কিন্তু একজনের কুরবাণী কবূল হলো, অন্য জনের হলো না। তখন দ্বিতীয় জন বললঃ আমি নিশ্চিত তোমাকে হত্যা করব। প্রথম জন বললঃ কুরবানী তো কবূল তারই হয়, যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, তুমি যদি আমার দিকে, আমাকে হত্যা করার মানসে হাত প্রসারিত কর, তা করতে পার। কিন্তু তাই বলে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বজাহানের যিনি রব তাঁকে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার ও তোমার গুনাহের দায়িত্ব তোমার একার ঘাড়েই পড়ুক। আর তুমি দোযখের অধিবাসীতে পরিণত হও, আর জালেমদের পরিনাম এটাই। এরপর দ্বিতীয় ভাই-এর মন তার ভাইকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে দিল এবং সে তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করল ও তারপর সে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। (মায়েদা-২৭-৩০)

আর এক শ্রেণীর উদাহরণ নিম্নের ঘটনাঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنَاهُمَا
بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا . كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ج
وَفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا . وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصٰحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ
مَالاً وَّاَعَزُّ نَفَرًا . وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا .
وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا . قَالَ لَهُ
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلاً
لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّىْ اَحَدًا . وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ج اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَّوَلَدًا . فَعَسٰى رَبِّىْ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا
مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا . اَوْ يُصْبِحَ مَاءُ
هَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا . وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَا اَنْفَقَ
فِيْهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْ اَحَدًا . وَلَمْ
تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا . (الكهف : ٣٢-٤٣)

"হে নবী! ওদের জন্য একটি উদাহরণ দাওঃ দু' ব্যক্তি ছিল, একজনকে আংগুরের দু'টি বাগিচা দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চতুর্দিকে আমি খেজুর গাছের ঘের দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এ দুটির মধ্যভাগে ফসল হত। দু'টি বাগিচাতেই প্রচুর ফল ও ফসল হত, কোন বছরেই কম হত না। বাগিচা দু'টির মাঝখান দিয়ে নহর প্রবাহিত হতো যার ফলে এগুলো সদা সজীব ও ফলে ফুলে ভর্তি থাকত। তখন একদিন বাগানের মালিক কথা প্রসঙ্গে তার সংগীকে বলে উঠলঃ আমি ধন দৌলত ও জনবলে অনেক বড়, তারপর সে ঐ বাগানে প্রবেশ করে নিজের উপর জুলুমকারী হিসেবে বলতে লাগল ঃ আমি তো মনে করি আমার এ বাগিচা চিরদিন এ রকমই থাকবে, এটা কোন দিন ধ্বংস হবার নয় ; আর একান্তই যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেখানে এর থেকেও উত্তম জিনিষ আমি পাবো, (যেহেতু আমি আমার রবের করুনাধন্য, দুনিয়াতে যেমন পরকালেও তেমনি থাকব)। এ সময় তার সঙ্গী তাকে জওয়াব দিতে গিয়ে বললঃ তুমি কি সেই মহান সত্ত্বার নেয়ামতকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে মাটি দিয়ে পয়দা করেছেন, তারপর সৃষ্টি কাজ চালু রেখেছেন শুক্র বিন্দু দ্বারা, যার দ্বারা পরে তোমাকে একটি পুর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেছন? কিন্তু আমি তার নাশুকরি করি না, বরং আমি এভাবে বলি যে তিনিই আমার রব (প্রতিপালক) যিনি

মহান আল্লাহ, আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক করি না। আচ্ছা, তুমি তোমার বাগিচায় প্রবেশ করার সময় এভাবে বললে ভাল হয় না কি যেঃ আল্লাহপাক যতটা চেয়েছেন ততটা আমাকে দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই, যদিও আজকে তুমি আমাকে মালসম্পদ ও জনবলে কম দেখছ। কিন্তু এমনো তো হতে পারে যে, আমাকে আমার রব তোমার বাগিচা থেকে ভাল কিছু দিতে পারেন এবং তোমার বাগিচার উপর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে কোন মুসিবাত পাঠিয়ে দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবেন, এর পর সেখানে শুধু ধুধু ময়দান রয়ে যাবে। অথবা এমনো তো হতে পারে যে, সে বাগিচার পানি শুকিয়ে যাবে, তা এত নীচে নেমে যাবে যে, শত চেষ্টা করেও তুমি তা তুলতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই, হঠাৎ করে সে বাগিচা খতম হয়ে গেল এবং যা কিছু রইল সব পানির অভাবে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেলো। তারপর পরদিন যখন সে বাগিচায় গেল, দেখল গাছের কাণ্ডগুলো সব মাটিতে পড়ে রয়েছে, তখন সে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বলতে লাগলঃ হায় আফসোস! আমি আমার রবের সাথে অন্য কিছুকে যদি শরীক না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত। তখন কোন দল তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল না যার দ্বারা সে আল্লাহর দেয়া এই মুসীবাতের মুকাবিলা করতে পারে, অথবা সে নিজেও এটা কোন ভাবে ঠেকাতে পারল না।"(কাহাফ ৩২-৪৩)

কুরআনে কারীমে বর্ণিত মানুষ গড়ার সব রকম উপায় ও পদ্ধতির মধ্যে অতীতের কিস্‌সা কাহিনীর বর্ণনা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ সব কাহিনী দ্বারা আত্মা, বুদ্ধি ও শরীর গড়ার খিদমত নেয়া হয়েছে এবং সেগুলো দৃষ্টান্তমূলক নমুনা পেশ করে, আবার কখনো উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ সব ঘটনাবহুল দৃষ্টান্ত দ্বারা যে বড় ফায়দা হয়েছে তা হচ্ছে অত্যন্ত অল্প কথায় অত্যন্ত ব্যাপক ও কার্যকরী শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়েছে। কোন জায়গায় সরল সহজ সংলাপ ও কথা বার্তার মাধ্যমে কখনো বাক্যের সুনিপুণ ও ঝংকার পূর্ণ ছন্দের মাধ্যমে কখনো বর্ণনা মূলক গতিতে ঐ সব ঘটনার বর্ণনা মানুষকে এমনই আবেগমুগ্ধ করেছে যে, ঐ বর্ণনা মধ্যস্থিত শিক্ষা তাদের অজানতেই তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে। কোন জায়গায় সরল সহজ সংলাপ ও কথাবার্তার মাধ্যমে, কখনো বাক্যের সুনিপুণ ও ঝংকারপূর্ণ ছন্দের মাধ্যমে কখনো বর্ণনা মূলক গতিতে ঐ সব ঘটনার বর্ণনা মধ্যস্থিত শিক্ষা তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে। কোন জায়গায় দেখা যায় অতীতের কীর্তিমালার জীবন্ত ছবি, কোন যায়গায় বর্ণনার মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানব হৃদয়ের গ্রন্থিগুলোকে খুলে দেয়ার মত ঘটনা, আবার কখনো কাহিনীর ঐ অংশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আর কখনো রয়েছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয় কেড়ে নেয়ার মত মৃদু মন্দ গতিতে তালে তালে এগিয়ে যাওয়ার মত শব্দের তরংগমালা।

আদম (আঃ) এর কিস্সা

কুরআনে কারীমে বর্ণিত আদম (আঃ)-এর কিস্সা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনী মানব সভ্যতার প্রত্যেক স্তরের জন্যই ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۖ قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ اِنِّى اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ۔ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۔ قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۔ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۔ وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۔ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ج اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ط فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔ (البقرة : ٣٠-٣٩)

"আর স্মরণ করে দ্যাখো ঐ সময়ের কথা যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেনঃ অবশ্যই আমি পৃথিবীর বুকে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে চাই, তারা বললঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু বানাতে চান যে, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত (খু-নখারাবী) করবে; অথচ আমরাই তো আপনার কৃতিত্বের কথা প্রচারের মাধ্যমে আপনার যাবতীয় দুর্বলতামুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। তারপর তিনি আদমকে সকল জিনিসের নাম শেখালেন

এরপর ফেরেশতাদের সামনে সেগুলোকে পেশ করে জিজ্ঞেসা করলেন, এগুলোর নাম আমাকে বল দেখি, যদি তোমাদের ধারণা যে, সে শুধু ফাসাদ সৃষ্টিকারী হবে একথা সত্য হয়? তারা বলে উঠল, আপনি পাক পবিত্র হে মওলা! আপনি আমাদেরকে যেটুকু জানিয়েছেন তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, আপনিই একমাত্র জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান। তিনি বললেনঃ হে আদম! এগুলোর নাম ওদেরকে জানিয়ে দাও। তখন আদম ওদেরকে সব কিছুর নাম জানিয়ে দিল। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ অবশ্যই একমাত্র আমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু অদেখা জিনিস জানি, আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ সেগুলোও জানি। তারপর, ঐ সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন আমি (মহান আল্লাহ্) ফেরেশতাদেরকে বললামঃ সিজদা কর আদমকে, (তার সামনে শ্রদ্ধাবণত হও) তখন তারা সবাই সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া ; সে (সিজদা করতে) অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং শেষ পর্যন্ত সে অস্বীকারকারীই রয়ে গেল। তারপর আমি (মহান আল্লাহ্) আদমকে ডেকে বললাম! হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী (জোড়া বা সংগিনী) জান্নাতে বসবাস করো এবং আরামের সাথে ও আনন্দের সাথে যেখানের যা কিছু তোমাদের দিল চায় খাও, তবে এ গাছটির ধারে কাছেও ঘেঁসো না। যদি তা কর তাহলে কিন্তু জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর, শয়তান তাদের উভয়কেই ঐ নিষিদ্ধ গাছটি সম্পর্কে ভুলিয়ে দিয়ে তাদের পদস্খলন করে দিল (অপরাধী বানিয়ে দিল) এর ফলে, তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল। তারপর আমি (মহান আল্লাহ্) বললামঃ তোমরা পরস্পর দুশমন হিসাবে জান্নাত থেকে নেমে যাও এবং এখন থেকেই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের থাকার জায়গা স্থিরীকৃত হলো। এ সময়ে আদম তার রবের নিকট থেকে কিছু কথা শিখে নিয়ে সে কথাগুলো দ্বারা তওবা করল, ফলে তিনি তওবা কবুল করলেন, অবশ্যই তিনিই তো তওবা কবুলকারী মেহেরবান। কিন্তু আমি (মহান আল্লাহ্) বললাম, ঠিক আছে, তওবা কবুল করলাম বটে, তবে এখনকার মত তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও ; তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন কোন পথ নির্দেশ আসবে তখন যে ব্যক্তি সে নির্দেশ মেনে নেবে তার জন্য আর কোন ভয়ও থাকবে না বা তারা কোন দুঃখও পাবে না। আর যারা সেই হেদায়েতকে মানতে অস্বীকার করবে এবং আমার নাযিলকৃত আয়াতগুলো (আমারই পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে বলে) অস্বীকার করবে তারাই হবে দোযখবাসী, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।"(বাকারাঃ ৩০-৩৯)

এ হচ্ছে সেই 'মানুষ'টির ঘটনা যাকে তার সৃষ্টিকর্তা সম্মানিত করে ছিলেন এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাকে তিনি গোটা পৃথিবীর খিলাফতের দায়িত্ব দান করেছিলেন যাতে তিনি তার নিজের পরিচালক নিজেই হতে পারেন। তাকে একথাও আল্লাহপাক জানিয়ে দেন যেন তিনি এক আল্লাহরই বন্দেগী করেন,

কিন্তু এ আদম সন্তানদের মধ্যে ধীরে ধীরে দুর্বলতা এসে গেল এবং তারা বিষয় সম্পত্তি, ধনদৌলত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুহাব্বাতে পড়ে গেল, তারা তাদের চাহিদার হাতে তাদের জীবনের লাগাম তুলে দিল, ফলে শয়তান তাকে নিজের পথে টেনে নিয়ে রওয়ানা হল এবং এই মানুষ নিজের মূল খিলাফত এর দায়িত্বকে ভুলে গেল এবং এইভাবে আকাশের সাথে তাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা ভুলে গিয়ে তারা মনে করল যে দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী এ জিন্দেগী, তার আরাম আয়েস ও স্বাধ আহলাদ এগুলোই তাদের জীবনের সবকিছু। কিন্তু আল্লাহ্ পাক মানুষকে নিজ রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেননি, বরং তাকে তার ভাবাবেগ পরিহার করে তার প্রকৃত সাফল্যের পথের চাবিকাঠি "তওবা" করার জন্য নিয়ম জানিয়ে দিলেন।

فَتَلَقَّىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ـ (البقرة : ٣٧)

"এসময়ে আদম তার রবের নিকট থেকে কিছু কথা শিখে নিল, এজন্য আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করলেন।" (বাকারা-৩৭)

মানুষ গুমরাহীর মধ্যে থাকার জন্য যদি জিদ না করে এবং নিজের ভুল ক্রটির কথা স্মরণ করে যদি আল্লাহ্পাকের দিকে রুজু করে ও সর্বান্তকরণে হেদায়েতের পথকে আঁকড়ে ধরে তাহলে আল্লাহ্ পাক তাকে হেদায়েত দান করার সাথে সাথে তাকে খিলাফতের যোগ্যও করে তোলেন, আর এভাবে মানব সত্বাকে তিনি পূর্ণত্ব এবং ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে দেন।"

কুরআনের কাহিনীগুলোর বিষয়ভিত্তিক অবস্থা

এটা একটা বাস্তব সত্য যে, কুরআনে কারীমে যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তা দ্বীন ইসলামের উদ্দেশ্যগুলোকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু কুরআনে কারীম হেদায়েত ও মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বলিত এক কিতাব। সাধারণ কিস্সা কাহিনীর কিতাব নয়। কিন্তু তা সত্বেও হেদায়েতের কথা প্রচারের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করানোর বিষয়কে সামনে রেখে ঐ ঘটনাপঞ্জী বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণেই ঐ ঘটনাবলী বা কিস্সাগুলো মানব প্রশিক্ষণের এক অতি মূল্যবান ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

কুরআনে কারীম এতে বর্ণিত কাহিনীর নায়কদের জীবনের সেই সম্মানজনক, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মুহূর্তগুলো পেশ করে যা অপরের জন্য নমুনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আর যা পাঠকদেরকে চারিত্রিক উচ্চমার্গে পৌঁছুতে সাহায্য করতে পারে। এভাবে সত্য বিমুখ লোকদের (Diverted People) জীবনের অন্ধকার দিকগুলো তাদের অন্তরের ঐ কালো অংশ এবং তাদের সত্য বিমুখতার ঐ মন্দ

দিকগুলোকেও স্পষ্ট করে তোলে যা অপরের নিকট ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হয়। তা পাঠ করে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। এ পদ্ধতিই কুরআনে কারীমের উপস্থাপন পদ্ধতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।

কিন্তু অনেক সময় কুরআনে কারীম প্রতিকার ও সংশোধন করার উদ্দেশ্যে মানুষের দুর্বলতার মুহূর্তগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনে কারীম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উপস্থাপিত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করেনি যা মানুষের মধ্যে অবস্থিত পাশববৃত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সত্য বিমূখতাকে যৌবনের শক্তিমত্তা (Heroship) বা বাহাদুরী বলে গ্রহণ করে। এর পরিবর্তে কুরআনে কারীম এসব প্রবণতাকে তার নিজস্ব রূপে তুলে ধরে তার সাথে সাথে একথাও জানায় যে, এসব মন্দ প্রবণতা বা শয়তানী মননশীলতা মানুষের মধ্যে খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না বরং শীঘ্রই আল্লাহপাকের নূরের জ্যোতিতে তা অপসারিত হয়ে যায় এবং মানুষ যাবতীয় মন্দ চিন্তার বিপাক থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে হেদায়েতের পথ ধরে। আর প্রকৃতপক্ষেই জঞ্জালমুক্ত মানুষকেই আল্লাহপাক সম্মানিত করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির সেরা বানিয়ে তাকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

হযরত সুলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) যে ফিৎনার মধ্য লিপ্ত হয়েছিলেন, কুরআনে কারীম কোন প্রকার কমবেশী না করেই তা অবিকল বর্ণনা করেছে এবং একথা জানিয়েছে যে, এই দুর্বলতা (মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা) যা তার প্রকৃতিগত চাহিদার কারণে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তা ততটুকু এসেছিল যতটুকু আসার পরই আল্লাহর দিকে তাঁরা রুজু ছিলেন এবং তাদের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিবেচনায় উচুঁ মানে উঠতে পেরেছিলেন।

وَهَلْ اَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ . اِذْ دَخَلُوا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ . اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ ج وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ . فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ .

(ص: ٢١-٢٥)

"হে রাসূল! তোমার নিকট কি ঐ মুকাদ্দমার খবর পৌঁছেছে যখন কয়েকজন লোক দেয়াল টপকে পার হয়ে ঐ মহলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল? যখন তারা দাউদের নিকট পৌঁছুল তখন সে তাদের দেখে ঘাবড়িয়ে গেল। তারা বললঃ ভয় পাবেন না, আমাদের মধ্যেকার এক মুকদ্দমার (ঝগড়ার) দুটি পক্ষ আমরা। আমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, আপনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে (এবং হক্ব) ফয়সালা করে দিন। আর দেখবেন বেইনসাফী করবে না যেন, এবং আমাদেরকে সঠিকভাবে সরল সঠিক পথটি দেখিয়ে দিন। এই যে ইনি আমার ভাই, তার কাছে ৯৯ (নিরানব্বই) দুম্বা আছে আর আমার কাছে আছে একটি মাত্র দুম্বা, এখন উনি আমাকে বলছেন, "তোমার ঐ দুম্বাটিও আমাকে দিয়ে দাও, আর কথার মারপ্যাচে উনি আমাকে বাধ্য করে ফেলেছেন।" দাউদ বলল, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি নিজ দুম্বাগুলোর সাথে তোমার দুম্বাটিতে মিলিয়ে নেয়ার দাবী করে তোমার উপর বড় জুলুমই করেছে। অবশ্যই এটা সত্য এমনি একসাথে বসবাসকারীদের মধ্যে অনেকেই এভাবে অপরের উপর জুলুম করে, এ জুলুম করা থেকে তারাই বাঁচতে পারে যারা আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে ভাল কাজসমূহ করে, অবশ্যই এসব লোক সংখ্যায় নগন্য। (এ কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝে গেল যে, আসলে আমি (মহান আল্লাহ) তাকে পরীক্ষা করেছি। সুতরাং দাউদ নিজ ভুল বুঝতে পেরে তার রব এর নিকট ক্ষমা চাইল এবং বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহর সামনে ঝুকে পড়ল ও তার দিকে ফিরে গেল। তখন আমি (মহান আল্লাহ) তাকে ঐ ব্যাপারে যে তার দোষ হয়েছিল তা তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আর অবশ্যই তারজন্য আমার কাছে নৈকট্যপূর্ণ স্থান এবং সুন্দর পরিণতি রয়েছে যেহেতু সে ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথে শুধরে নিয়েছিল।" (সায়া ২১-২৫)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ج نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ . اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنٰتُ الْجِيَادُ . فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ - وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ غ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَايَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ . (ص ٣٠ - ٣٥)

"আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) দাউদকে সুলায়মান (এর মতযোগ্য পুত্র দান করেছিলাম, চমৎকার বান্দাহ সে, নিশ্চয়ই সে নিজ প্রভুর দিকে রুজুকারী। ঐ

সময়ের কথা স্মরণ করে দ্যাখো, যখনঃ সন্ধ্যাকালে তার সামনে অত্যন্ত সুন্দর ঘোড়াগুলো হাজির করা হলো, (এই ঘোড়াগুলো দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রভুর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার পর স্মরণ হতেই) সে বলে উঠলঃ আমি আমার রব থেকে বেশি মালের মুহাব্বাতে এত বেশি পড়ে গিয়েছি যে সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেল (ডুবে গেল)! তখন সে তর কর্মচারীদের হুকুম দিলঃ ঐ ঘোড়াগুলোকে অমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, (আনা হলে) সে ঐগুলোর পা ও গর্দানের উপর আঘাত করতে শুরু করল। আরও (দ্যাখো যে) সুলায়মানকেও আমি (মহান আল্লাহ) পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর একটি শরীর এনে ফেলে দিলাম। তারপর সে (আল্লাহর দিকে) ফিরে এলো; বললঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে এমন বাদশাহী দান করুন যা আমার পরে আর কারো পক্ষে হাসিল করা সম্ভব না হয়। অবশ্যই, এটা সত্য যে আপনিই প্রকৃতপক্ষে দেনেওয়ালা।”

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ
شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ . قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ
فَغَفَرَلَهٗ ج اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا
لِّلْمُجْرِمِيْنَ . فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ
ج قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ . فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا
قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا
الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ
النّٰصِحِيْنَ . فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ .

(القصص ٢٢-١٥)

“একদিন সে (মূসা) শহরে এমন সময়ে প্রবেশ করল যখন শহরবাসী গাফলতির মধ্যে (অমনোযোগী) ছিল, তখন সে দু' ব্যক্তিকে মারামারি করা অবস্থায় পেল, একজন ছিল তার নিজের কওমের, আর অপর জন ছিল তার

দুশমন গোত্রের মধ্যকার লোক, তখন মূসা তাকে একটি ঘুষি মারল, ফলে সে মারা গেল। মূসা (আঃ) বলল, এটাতো শয়তানের কাজ, নিশ্চয়ই সে খোলাখুলি দুশমন। তারপর মূসা (আঃ) (আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে) বললেনঃ হে আমার রব, আমি নিজে জীবনের উপর জুলুম করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, এতে আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করে দেনেওয়ালা মেহেরবান। তারপর মূসা বললেন, হে আমার রব! আপনি যখন আমকে ক্ষমা করলেন তখন আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না, তারপর দিন, সে (মূসা) ভয়ে ভয়ে এবং কে কি করছে তার দিকে খেয়াল রেখে চলাফেরা করছিলেন এমন সময় যে ব্যক্তি পূর্বদিনে তাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল সে এদিনও চীৎকার করে তাকে ডাকতে শুরু করল। মূসা (আঃ) বলল, তুমি তো দারুন আহাম্মক লোক হে!

তারপর যখন সে (মূসা) তাদের উভয়ের দুশমন ঐ ব্যক্তিকে ধরার ইচ্ছা করল তখন সে বলে উঠলঃ হে মূসা! তুমি গতকাল যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, আজকে আমাকে সেভাবে হত্যা করতে চাও নাকি? মনে হচ্ছে, তুমি পৃথিবীতে মানুষকে অসহায় বানিয়ে ফেলতে চাও এবং জুলুমবাজ বলে পরিচিত হতে চাও? আর কোনভাবেই তুমি সংশোধনকারী হতে চাও না? (বলে মনে হচ্ছে)। আর এ সময় এক ব্যক্তি নগরীর অপর প্রান্ত হতে ছুটতে ছুটতে এলো, সে বলে উঠলঃ হে মূসা! নিশ্চয়ই সর্দারগণ তোমাকে হত্যা করবে বলে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে আলোচনা করছে ; অতএব এখান থেকে বেরিয়ে যাও, আমি কিন্তু তোমার ব্যাপারে সৎ পরামর্শদানকারী (বলে জেনে রেখো)। তখন মূসা সেখান থেকে (সঙ্গে সঙ্গে) বেরিয়ে গেল ভীতসন্ত্রস্তভাবে এবং তখন কে কি করছে বা বলছে তার সন্ধানও নিতে থাকলো। সেখান থেকে মূসা নিরাপদ স্থানে মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়ে (আল্লাহ্‌র শুকরাগুজারি স্বরূপ) বলে উঠল ও দোয়া করলো, হে আমার রব! আমাকে আপনি অত্যাচারি জাতির হাত থেকে নাজাত দিন।" এরপর মাদায়নে শহরের দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় সে (নিজ মনে মনে) বলতে লাগল আমার রব হয়ত আমাকে সঠিক পথেই (এবারে) চালাবেন।"

কুরআনে কারীম মানবীয় দুর্বলতার এ দৃষ্টান্তগুলো পেশ করেছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে ঐ জঘন্য কাজটিকে তাঁর (মূসার) বাহাদুরী (Heroship) বলে প্রকাশ করেনি। আর, প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-এর ঐ মুহূর্তগুলো কোন বাহাদুরীর মুহূর্ত ছিল না। হযরত আদম (আঃ)-এর কিস্‌সার ব্যাপারে যতটা জানা যায় তাতে কুরআনের ভূমিকাই সে ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কুরআনে বর্ণিত ঐ ঘটনা পাশ্চাত্যবাসীদের আধুনিক বর্ণনা পদ্ধতি

থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে মানুষকে ঐ ঘটনাগুলো সংঘটনকারী এবং তাদের ঐ ঘটনাপঞ্জীর মুহূর্তগুলোকে বাহাদুরী (Heroship)-এর মুহূর্তসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু আদম (আঃ)-এর কিস্সার মধ্যে সে সব মুহূর্ত বর্ণিত হয়েছে তা মানব জীবনের সেই, সব দুর্বল মুহূর্ত যার মধ্যে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে এবং বিশ্ব-প্রভুর সাথে কৃত ওয়াদা ভুলে গিয়ে নিজের যে শ্রেষ্ঠত্ব (পার্থিক খিলাফাত) তার চুক্তিকে অবমান না করে এবং এভাবে প্রবৃত্তির কোন চাহিদার শিকার হয়ে শয়তানের পথে চলতে শুরু করে। আর এ-ই হচ্ছে কুরআনে পাকের ব্যাখ্যার ধরণ। এটাই বাস্তব সত্য; কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণ নিজেদের কিতাব থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মানুষের দুর্বলতার ঐ মুহূর্তগুলোকে তার বাহাদুরীর মুহূর্তসমূহ বলে পেশ করে এবং আল্লাহর নাফরমানী এবং অপরাধ প্রবণতাকে তার প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা ও তার অস্তিত্বের স্বাধীনতা বলে গণ্য করে। আর প্রবলতার সাথে একথার দাবী করে যে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে যদি তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় তো তা হোক—এই ভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্য সাহিত্য যা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত থেকে ফিরে গিয়েছে এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শন (Greek mythology) দ্বারা প্রভাহিত হয়ে রয়েছে, যার দৃষ্টিতে দেবতা ও তার দাসদের মধ্যে চিরদিনই এক সংঘর্ষ চলে এসেছে এবং চলতে থাকবে। এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী জালিম দেবতার উপর মানুষ সফলতা অর্জন করার জন্য এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য সদা-সর্বদা আকাঙ্খী হয়ে রয়েছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাহিত্য ; তার শিক্ষা হচ্ছে তার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে উষ্কানী দান করা এবং মানুষের লাগামহীন ও সীমাহীন চাহিদা পুরণের জন্য তাকে প্ররোচিত করা। এ দর্শন মানুষকে শিক্ষাদেয় যে, ব্যষ্টির পরিপূর্ণতা লাভের এইটিই একমাত্র উপায় ও পদ্ধতি। মূলতঃ এ হচ্ছে এক রুগ্ন ও ব্যধিগ্রস্ত হৃদয়ের নাফরমানীপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং এটাই বাচ্চাদের জীবন যাপন প্রণালীর নিকৃষ্ট স্তর। যেমন বাচ্চারা মুরুব্বীদের কথা না মেনে চলাকেই তারা বাহাদূরী মনে করে আর যারা গুরুজনদের কথা মেনে চলার কারণে স্থবির হয়ে যায় তারা আসলে নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়েছে মনে করে। কিন্তু তারাই যখন বড় হয় এবং জীবনের বাস্তব সত্যের সাথে পরিচিত হয় তখন তারা বুঝতে পারে যে, আত্ম প্রতিষ্ঠার দুটি উপায় (Juo Methods of Self Assertion) আছেঃ একটি হচ্ছে, আল্লাহর নাফরমানী করে ভুল ও সত্য বিমুখতার পথ, অপরটি হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে হেদায়েতের আলোতে নিজেকে পরিচালনা করার পথ। প্রথমটি যারা গ্রহণ করেছে তারা

হচ্ছে অন্তরের দিক দিয়ে ব্যধিগ্রস্ত, ব্যধির কারণেই তাদের ধারণা, বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে যে কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অপর দিকে সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিবেকসম্পন্ন লোক একথা হৃদয় মন দিয়ে বুঝে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, তাঁর অনুগত বান্দাহগণ তারাই যারা জীবনের সব ব্যাপারে আল্লাহর বিধানমত চলতে বদ্ধপরিক। তাদেরকেই তিনি নিজের পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য দান করে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর দরবারে তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক অবস্থান। এই মহাসত্যের দিকেই আদম (আঃ)-এর কিস্সা ইঙ্গিত করছে।

আর একটি কথা ও বিশেষভাবে চিন্তা করার মত ; তা হচ্ছে, কুরআনে কারীমের যত যায়গায় অন্যায় কাজ ও যৌন সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, সে সব বর্ণনাভঙ্গী এমন হয়নি যে, তা পড়ে মানুষ অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত হবে, অন্যায় কাজ করা মঙ্গলময় বলে বুঝবে। প্রকৃতপক্ষে যৌন সম্পর্কেই তো আর জীবনের সব কিছু নয়, বরং জীবনের অন্যান্য অবস্থার মধ্যে এটা একটা অবস্থা। এ অবস্থা আসে, চলেও যায়। সর্বক্ষণ ঐ অনুভূতি বা ঐ অনুভূতির তীব্রতা থাকে না। কারণ, ঐ অবস্থা সাময়িকভাবে থেকে চলে যায় বলেই তো মানব জীবনের অন্যান্য উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কাজ করতে পারে এবং সৃষ্টি, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ঈমান-প্রদীপ্ত সুষ্ঠু ধ্যান ধারণা মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান লাভ করে। এভাবে মানুষ বাস্তব-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আজাদী অনুভব করে এবং তখন একটি পাক-পবিত্র এবং এমন পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন করার জন্য চেষ্টা সংগ্রাম করে, যার মধ্যে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা হয়, যার মধ্যে সত্য ববং ইনসাফ কায়েম হয়, যার মধ্যে মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পায় এবং যার মধ্যে মানুষ নিরাপদে ও কোন বড় বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে সুন্দর আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করে।

এগুলো সবই সেই মহান উদ্দেশ্য যা হাসিল করা মানুষের জন্য অপরিহার্য এবং মানুষের অধিকাংশ যোগ্যতাকে এসব বিষয়ে হাসিল করার জন্য কাজে লাগানো উচিত। এসব উদ্দেশ্য হাসিল করার পথে বস্তুর ব্যবহারের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। যেহেতু বস্তুর ভোগ ব্যবহার মানুষের যোগ্যতাকে বেশি বেশি ব্যবহার দ্বারা আসলে তার অপব্যবহারই হয়। বস্তুর ব্যবহার বাঁচার জন্য। সুতরাং এ হচ্ছে বাঁচার উপায়, উপায় কখনোও লক্ষ্য হতে পারে না। সুতরাং বাঁচার উপায়কে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা মারাত্মক এক ভুল। তাও যদি হালাল পথে অর্থাৎ কাউকে কষ্ট না দিয়ে বস্তুর ব্যবহার করা হয়, তবুও সে ব্যবহারকে

জীবন লক্ষ্যের পথে অন্তরায় না হতে দেয়ার মধ্যেই জীবনের সফলতা, আর যদি হারাম পথে বস্তুর ভোগ ব্যবহার হয় তাহলে তা হবে ঘৃণ্য এবং তা থেকে পরহেজ করা মানবতার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

কুরআনে কারীমের যত যায়গায় মন্দ ঘটনাগুলোর বর্ণনা এসেছে, সবখানেই উল্লেখিত নীতি ঠিক রাখা হয়েছে। আর এভাবে ইসলামী কাহিনী যেখানে যতটা বর্ণনা করা হবে সবখানেই এই নীতি ঠিক রাখা দরকার। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বিদ্যা শেখা নিষিদ্ধ নয় এবং বস্তু ও ইন্দ্রিয়জাত আবেগ অনুভূতির বিবরণ দান করাও নিষিদ্ধ করা হয়নি। আবার অবনতি বা দুর্বলতার মুহূর্ত একেবারেই আসবে না তাও বলা হয়নি। এ ক্ষেত্রে এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে, মানবীয় স্বাভাবিক এ সব বৃত্তিগুলো আসবে নিজের গতিতে; কিন্তু মানুষের বিবেককে কাজে লাগিয়ে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অর্থাৎ এসব মুহূর্ত আসবে আর স্থায়ী কোন ছাপ না রেখেই তা চলে যাবে। বস্তুগত ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত এসব চাওয়া ও পাওয়া যেন মানুষের জীবনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাই মানুষের কর্তব্য। এই সব চাওয়া-পাওয়ার আবেগ-অনুভূতিতে বাহাদুরীর মুহূর্ত (Moments of Heroship) হিসেবে যেন গ্রহণ না করা হয়। এইটিই হচ্ছে সেই অবস্থা যার মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল উদ্দেশ্য ও ঈমানের দাবীর মধ্যে কোন বৈপরিত্য বা সংঘাত নেই। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই ইসলাম বিভিন্ন কিস্‌সা-কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলে। এতে দু'টি ফল পাওয়া যায়। এক, ইসলামের মূল দাবী থেকে মানুষ দূরে সরে যায় না। দুই, কোন বিষয়ের শিক্ষা নীরস এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু শিক্ষা গ্রহণ করার একটি কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে মানুষকে ক্লান্ত করে না। সুতরাং কুরআনে উপস্থাপিত সত্য ও বাস্তব ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন উপমা-উদাহরণ দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সে তার অজান্তে এবং বিনা ক্লেশে অনেক কিছু শেখে, হৃদয়ংগম করে সে শিক্ষাকে আত্মস্থ করে অপরের কাছে বাস্তব উদাহরণ হয়ে ফুটে উঠে, যা সরাসরি ওয়াজ নসীহত দ্বারা সম্ভব হয় না।

অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা দান

মানুষকে ধীরে ধীরে অভ্যস্থ করে তোলার মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া যায় তা অত্যন্ত সুন্দরও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে মানুষের চেষ্টা-সাধনার ক্লেশ লাঘব হয় এবং ধীরে ধীরে অভ্যাস গড়ে তোলার ফলে অনেক জটিল বিষয় মানুষ আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। এ নিরন্তর চেষ্টা সাধনা ও

দৃঢ়তার নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা মানুষ নিত্য নতুন আবিষ্কার করে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। অভ্যাস বা অনুশীলন করার এ মেজাজ যদি আল্লাহপাক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে না দিতেন তাহলে মানুষ শুধু হাটতে শেখার কাজে, চলাফেরা করতে ও সাধারণ হিসাব নিকাশের কাজের মধ্যেই আত্মনিয়োগ করে জীবনের মূল্যবান সময় কাটিয়ে দিত।

কিন্তু, যেখানে অভ্যাস গড়ে তোলার ফায়দা এক দিক দিয়ে খুবই ব্যাপক মনে হয়, তেমিন অপরদিকে এর সঠিক ব্যবহার না করার কারণে এটা তার জ্ঞানানুশীলন ও নিত্য-নতুন প্রচেষ্টার একটি অন্তরায় হিসেবেও খাড়া হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে সেই পর্যায় যখন মানুষ তার বিবেককে না লাগিয়ে শুধু ভাবের আবেগে চলতে থাকে এবং না বুঝে শুধু মেশিনের মত বিনা হিসেবে কাজ করে। ইসলাম অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষকে জটিল জটিল জিনিস শেখায়। এ কারণেই দেখা যায় যে, এ উপায়ে মানুষ অনেক কল্যাণকর কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এতে মানুষের মনের উপর খুবই কম চাপ পড়ে, শারীরিক ক্লান্তি কম আসে এবং অনেক দুঃসাধ্য কাজ তার কাছে সহজ সাধ্য হয়ে যায়। সাথে সাথে ইসলাম এ বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখে যে, তার এই অভ্যাস যেন বিবেক বর্জিত না হয়ে যায়। অর্থাৎ একেবারেই না বুঝে-সুঝে শুধু মেশিনের মত কাজ করে যাবে এমনও যেন না হয়। ইসলাম সদা-সর্বদা ঐ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্মরণ করতে থাকে যার জন্য ঐ নির্দিষ্ট কাজে মানুষকে অভ্যস্থ করে তোলে। এ কারণেই ইসলাম মানুষের অন্তর ও আল্লাহ রাসূল আলামীনের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে তোলে, যার আলোকে মানুষের হৃদয়-মন আলোকিত হয়ে যায় এবং তার হৃদয় গ্রন্থির মধ্যে মরচে ধরার কোন সুযোগ থাকে না।

আরবের নিকষ কালো জাহেলিয়াতের আঁধারের পর্দা ছিড়ে যখন ইসলামের সূর্য উদিত হলো তখন ইসলাম আরব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত বদভ্যাসের গ্রন্থিগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করে তা দু'টি উপায়ে ছিন্ন করার কাজ শুরু করলঃ এক, কোনটিকে তাৎক্ষণিকভাবে সজোরে ছিন্ন করে বহুদিনের বদঅভ্যাস থেকে মানুষকে মুক্ত করল। আবার অনেক অভ্যাস এমন ছিল যেগুলো বদলাবার জন্য পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। প্রথম পর্যায়ের কাজ ছিল আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বে কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের গোলমাল দূর করা। এক্ষেত্রে মানুষ বা দেব-দেবতা বা কোন ব্যক্তি মানুষকে বসিয়ে বা আল্লাহর ক্ষমতায় তাদের অংশীদারিত্ব স্বীকার করার ফলে মানুষের জীবন যে সীমাহীন কষ্ট ও দুর্বিসহ অশান্তি নেমে এসেছিল তা বিদূরীত করার জন্য ঐ বদভ্যাস কবলিত সমাজ মানসকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করতেই

হয়েছে। যেহেতু এ ছিল এমন একটি প্রশ্ন যে বিষয়ে মুহূর্তের জন্য আপোষ করা সম্ভব নয় এবং যেহেতু এ বিষয়টিকে সহ্য করে তাওহীদের মূল বিশ্বাসকে কায়েম করা বা তার দাওয়াত দেয়াও অসম্ভব আর সেহেতু একই সময়ে এবং স্থানে আল্লাহর প্রভুত্ব এবং অপর কারো প্রভুত্ব একই সাথে চলতে পারে না। এ কারণেই কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে ও ইসলাম গ্রহণ করলে মানসিকভাবে আরবের জাহেলী পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় এবং তাওহীদের ঐ ধ্বজাধারীদের সাথে সম্পর্কিত হতে হত যারা একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বের ভিত্তিতে এবং সৃষ্টির সর্বত্র তারই প্রভুত্ব কর্তৃত্বের ধ্যান-ধারণা ও মূলমন্ত্রের বুনিয়াদে নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

জীবন্ত কবরস্থ করার কুপ্রথা ও অন্যান্য সামাজিক ব্যধি

আরবের পাপ-পঙ্কিল সমাজে যেসব মানবতা বিরোধী ও সমাজ বিধ্বংসী প্রথা চালু ছিল তার মধ্যে জঘন্যতম ছিল কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করার হৃদয় বিদারক ও হিংস্র প্রথা। এ প্রথা যেমন ছিল মানবতার জন্য কলংকজনক তেমনি ছিল ঈমানেরও পরিপন্থী। কারণ এর অন্যান্য অজুহাতের মধ্যে সর্বাধিক বড় যে অজুহাত পেশ করা হত তা ছিল দৈন্যের ভয়। যেহেতু কন্যা সন্তান শুধু ব্যয় করার খাত, তার দ্বারা আয় রোজগার সম্ভব নয়; আজ এ ভয় ঐ মুমিন-হৃদয়ে ঠাঁই পেতে পারেনা যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই রিজিকদানকারী হিসেবে পুরাপুরিভাবে মেনে নিয়েছে এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ সক্ষম বলে সে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত। তাছাড়া, এপ্রথা এত বড় জুলুম এবং এত বড় বে-ইনসাফি যা ঐ মহল ও কৃপাময় সত্ত্বার অনুমোদিত হতে পারে না। যার করুণারাশি নিশিদিন আসমান-জমিনের সব কিছুর উপর ঝরে পড়ছে।

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - (التكوير : ٨.٩)

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল?" (তাকবীর ৮-৯)

এই বদ রসমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সাথে সাথে মিথ্যা, গীবত, চুগোলখুরী, দোষারোপ করার বদঅভ্যাস নিন্দা-মন্দ করা ও অহংকার করার নিকৃষ্ট ব্যধির চিকিৎসা করার আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যাতে করে আল্লাহপাকের সাথে প্রকাশ্য ও গোপনে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। আর ঐ বদ অভ্যাসগুলো অবিলম্বে দূর না করা পর্যন্ত ঐ নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু ঐ ব্যাধিগুলো দূরীকরণ তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধির সাথে জড়িত

ছিল যার মধ্যে ইসলাম আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে। কিন্তু, সেই সব সামষ্টিক মন্দ অভ্যাস যার সম্পর্ক ব্যক্তিগত আইন কানুনের (Private Laws) সাথে জড়িত নয়, বরং সেগুলোর সবটুকু সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন ছিল, তার জন্য অনবরত ওয়াজ নসীহত, সদুপদেশ এবং বিবেককে জাগ্রত করা জরুরী ছিল। এই কারণে দেখা যায়, মদ্যপান, ব্যভিচার, সুদ-ভিত্তিক লেনদেন এবং দাসত্ব-প্রথা এগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যধি ছিল না; এগুলো সামাজিক ব্যাধি; যা ব্যক্তিগতবাবে এবং হঠাৎ করে উৎখাত করার জন্য ধীরে ধীরে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ইসলামী আইনের সমাপ্ত পর্যায়ে গিয়ে এগুলোকে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

যেমন-কুরআনে কারীম সর্বপ্রথম মদের ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেঃ

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًاوَّرِزْقًا حَسَنًا ـ (النحل : ٦٧)

"যাকে তোমরা নেশার (পানীয়) বস্তু এবং পাক পবিত্র রিজিক হিসেবে গ্রহণ করা।" (নাহাল-৬৭)

এ বাণীতে আল্লাহপাক মাদকদ্রব্য ও উত্তম রিজিকের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন অবশ্য এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এমন ছিল যার কারণে কোন কোন বুদ্ধিমান মুসলমান বুঝতে পেরেছিলেন যে, আগামীতে এই মাদকদ্রব্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

এরপর দেখা যায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে নৈতিক ও আবেগ অনুভূতির কাছে যে ভাবে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে কথা পেশ করা হয়েছে তাতে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক বুঝতে পেরেছে যে, মাদকদ্রব্য কোন ভাল জিনিস নয়, বরং এটা পান করা গুনাহের কাজ। এ কথার দ্বারা মানুষের মনের মধ্যে এ জিনিসটির প্রতি আকর্ষণহীনতা জাগানোর উদ্দেশ্য ছিল এবং এটি ছাড়ার ব্যাপারে মন মগজকে তৈরী করার কথা প্রচ্ছন্ন ছিল।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ (البقرة : ٢٠٩)

"ওরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, বলঃ এ দুটির মধ্যে মানুষের জন্য বিরাট ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে, অবশ্য কিছু উপকার-ও এগুলোর মধ্যে রয়েছে, তবে উপকার থেকে এগুলোর ক্ষতি অনেক বেশি।"

(বাকারা-২১৯)

এর পরে মুসলমানদেরকে নামাযের সময় মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে

উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা পরোক্ষভাবে মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারণ নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে মদ্যপান করা হবে এবং নামাযে যখন হাজির হবে তখন তার মধ্যে নেশাগ্রস্ত অবস্থা একেবারে থাকবে না এটা আদৌ সম্ভব ছিল না।

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى ـ (النساء : ٤٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।" (নিসা-৪৩)

এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়াতে মদ্যপানকে চূড়ান্তভাবে এবং সরাসরিভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করা হলোঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (المائدة : ٩٠)

"এটা অতীব সত্যকথা যে, মদ, জুয়া, মূর্তির বেদী এবং তীল নিক্ষেপ দ্বারা ভাগ্য নির্ধ্বারণ এসব শয়তানী অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে (দূরে) থাক, তাহলেই হয়ত তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হবে।" (মায়েদা-৯০)

ব্যাভিচারকে নিষিদ্ধ করতে গিয়েও পর্যায়ক্রমিক ধারা গ্রহণ করা হয়েছে, প্রথমে সদুপদেশ দান করা হয়েছে, এর সাজা দেয়া হবে বলে ধমকি দেয়া হয়েছে, তারপর সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ অর্থবোধক বাক্য দ্বারা সাজার কথা বলা হয়েছে, অবশেষে স্পষ্ট ও বিস্তারিত কথায় শাস্তির বয়ান এসেছে। এভাবে, এ হুকুমও এসেছেঃ যে সব মহিলা পবিত্র থাকতে চায় তাদেরকে মন্দ কাজে বাধ্য যেন না করা হয়, এর সাথেই মুতা বিবাহকে জায়েজ রাখা হয়েছে, পরিশেষে দেহ-ব্যবসা ও মুতা (সাময়িক বিবাহ) কে এক সাথে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর জীবনভর একসাথে ঘরকণ্যা করার নিয়তে যে বিবাহ-বন্ধন, তাছাড়া সর্বপ্রকার নারী পুরুষের মেলা মেশা ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দশম হিজরীতে ঐ সময় সুদ নিষিদ্ধ করা হয়, যখন মুসলিম সমাজ যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জন করেছে এবং মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা জীবনের অবস্থা জীবনের প্রশিক্ষণও পরিপূর্ণ হয়েছে।

দাসত্ব প্রথাকে বিলুপ্ত করার জন্যও ইসলাম পর্যায়ক্রমিক ধারা নিয়েছে এবং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার পরিণতিতে গোলামী প্রথা শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ক্রমিক ধারার গ্রহণ করাই যথার্থ ছিল। যেহেতু শরীরকে মুক্ত করার পূর্বে মনকে মুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। এভাবে ইসলাম তাদেরকে এ

অনুভূতি দান করেছে যে, তারাও মানুষ এবং তাদের সাথে সদ্ব্যাবহার করা অপরিহার্য। উপরন্ত, ইসলাম আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা তাদেরকে আজাদীর স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত করেছে যাতে করে হঠাৎ করে স্বাধীন হয়ে স্বাধীন জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব তারা পালন করতে পারে এবং কোন ব্যাপারে অযোগ্যতার পরিচয় না দেয়।

সুন্দর ও গঠনমূলক অভ্যাসের লালন

মানুষের মধ্যে সুন্দর ও উত্তম অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও ইসলাম কয়েকটি পর্যায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ঈমানের জন্য ইসলাম মানুষের আভ্যন্তরীণ আবেগকে আকর্ষণ করেছে। যার কারণে, একজন কাফের ব্যক্তি ঈমান কবূল করে মুসলমানদের দলভুক্ত হয় এবং তার মনের ধ্যান ধারণা ও তার অন্তরের অনুভূতিতে আমুল পরিবর্তন আসে। ঈমান গ্রহণ করার পর রাসূল (সঃ)-এর আদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ করার মাধ্যমে তার মৌখিক স্বীকৃতি দৃঢ়তা লাভ করে এবং তার মধ্যে এমন অভ্যাস গড়ে ওঠে যা ব্যক্তি ও স্থানের পরিসীমা অতিক্রম করে বংশ পরাম্পরাক্রমে ঈমানের এ বীজ পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। এভাবে একজন মুসলিম কাফির পরিবেষ্টিত এলাকা থেকে মুসলিম পরিবেশে প্রবেশ করে মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং অপর মুমিনদের সাথে সম্পর্ক থেকে মজবুত। কোন মুমিনের সাথে সাক্ষাত হলেই ঈমানের কথা বলা মুমিনসুলভ কাজ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। মুমিন নামায পড়তে শুরু করার পর নামায তার অভ্যাসগত হয়ে যায়। তারপর যখন সকল মুমিন কাফিরদরে বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয় তখন জিহাদী জিন্দেগীতে সে অভ্যস্থ হয়ে উঠে। এভাবে ইসলাম এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছিল যার মধ্যে ইসলামের মূলনীতি ও মতবাদসমূহ বাস্তবে কার্যকর হয়েছিল এবং সর্বত্র ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার পরিণতিতে প্রত্যেকটি ব্যক্তির অভ্যস সমাজের অভ্যাসগুলোর সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার পরিণতিতে প্রত্যেকটি ব্যক্তির অভ্যস সমাজের অভ্যাসগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং এ অভ্যাসগুলো স্থিতিশীল ও স্থায়ী হয়ে যায়। এভাবে ইসলামের শিক্ষার আলোকে একটি মজবুত সুদৃঢ় এবং মানুষের হৃদয়গ্রন্থীর মধ্যে প্রবেশ করার মত একটি মূলনীতি সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। ইসলাম মানুষের মধ্যে অপর মানসিক, অভ্যাসসমূহ, যেমন-সত্যবাদিতা, ঈমানদারী, বিশ্বস্ততা ও বিনয়-নম্রতা এবং ত্যাগ-কুরবানী গড়ে তোলার জন্য প্রথমতঃ তার মানসিক আবেগ অনুভূতিকেই জাগিয়ে তোলে। তারপর সে অনুযায়ী তার কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে, তারপর সে আগ্রহকে সঠিক ও বাস্তবরূপে তা নিজ নিজ আলামতসমূহ সহ স্পষ্ট

হয়ে সামনে ভেসে ওঠে এবং সদ্‌গুণাবলী, সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক সম্পর্কে পরিণত হয়।

যেমন নামায, এটা এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে প্রথমতঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপনের একটি ইচ্ছা ও তাঁর কাছে দোয়া ও দরখাস্ত পেশ করার একটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু ইসলাম নামাযের সময় নিরুপন করছে ও জামায়াতের উপকারিতা বর্ণনা করে একাজটিকে সামাজিক রূপ দিয়েছে।

যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাকাত দাতার অন্তরকে কৃপণতা ও লোভ লালসা থেকে পবিত্র করা। অভাবগ্রস্তকে দয়া করা ও সমাজে সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা; কিন্তু এ যাকাত ব্যবস্থা যখন একটি আইন হিসেবে আইন সংস্থার মাধ্যমে সামনে আসে এবং তা আদায় করার সময় নির্ধ্বারণ করা হয় এবং তার হার নিরুপণ ও তা আদায় করার পদ্ধতিও স্থির করে দেয়া হয় তখন এই ব্যক্তিগত কাজটি এমন এক সামাজিক কাজে পরিণত হয় যা রাষ্ট্র ও সমাজের মূল বুনিয়াদে পরিণত হয়।

এইভাবে ইসলামে প্রত্যেক অভ্যাসকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে তা প্রথমতঃ একটি আবেগরূপে ব্যক্তির সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে তা একটি জীবন্ত এবং গতিশীল কাজে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, যেন বিনা বাধায় ও বিনা কষ্টে আদায় হতে পারে এবং যুক্তিসংগত আবেগ অনুভূতির সাথে তা প্রদত্ত হয়।

শক্তি প্রয়োগ

মানুষ গড়ার অঙ্গনে ইসলাম যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাতে দেখা যায় যে, এ ব্যবস্থা মানুষের মনের মধ্যকার সঞ্চিত শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগায় যেন শুধু মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। এজন্য, মানুষের মন ও শরীরের মধ্যে যে শক্তি হতে থাকে, তাকে উপকারী ও গঠনমূলক কাজে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি অপকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আর এমনও হতে পারে যে, এ শক্তির ব্যবহার কোন যায়গাতেই হয়ত হবে না এবং এইভাবে অপব্যবহারের কারণে মরিচা ধরে তা বেকার হয়ে যাবে। ইসলাম এ সকল শক্তিকে গঠনমূলক ও উপকারী কাজে লাগিয়ে তা সঠিক ব্যবহার করে এবং এ সকল শক্তিকে মন্দের বিরুদ্ধে একটি প্রাচীর হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ইসলাম এ সব শক্তির নিরর্থক সঞ্চয়ের বিরোধি, কারণ শারীরিক বা

মাসিক শক্তি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সঞ্চিত হয়ে থাকলে এবং কোন কাজে লাগলে তা মানুষের অস্তিত্বের জন্য বিপদজনক হয়ে ওঠে এবং তার থেকে বিভিন্ন মানসিক ব্যধি পয়দা হয়ে যায়। যেহেতু শক্তি কোথাও সঞ্চিত বা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকলে ও তার সঠিক ব্যবহার বা নির্গমনের কোন সঠিক পথ না পেলে, বিস্ফোরিত হয়ে তা ক্ষতিকর হয়ে যায়। আর এই কারণেই ইসলাম শক্তিকে দীর্ঘ দিন ধরে সঞ্চিত করে রাখার বিরোধী; যাতে করে মানুষের মানসিক বহু ব্যাধি দূরে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার পেরেশানী ও অস্থিরতা মানুষকে পেয়ে না বসে। এসকল পেরেশানী থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে পুঞ্জিভূত যোগ্যতা ও শক্তিকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কোন কাজে লাগিয়ে দেয়া। যেমন, ঘৃণার উদ্রেক করা মানুষের প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক একটি শক্তি। ইসলাম এ শক্তিকে শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য এবং তাদের দ্বারা পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এভাবে এ শক্তিকে মানুষের অস্তিত্বের জন্য যা কিছু ক্ষতিকর আছে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এর সাথে আর একটি দিক উল্লেখযোগ্য যে, যখন মানুষ কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন তার মধ্যকার ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে মানুষের বাহাদুরী ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে এবং সমাজের অন্যায় থেকে, অশান্তিকর অবস্থা থেকে এবং বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হওয়ার এবং উন্নত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এভাবে মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য; তাকে ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের মাধ্যমে তাকে খিলাফাত দানের মূল লক্ষ্যকে পূর্ণ করা হয়।

এভাবে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার আবেগকে ইসলাম আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য, সৃষ্টির জন্য এবং প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলোর জন্যও এ প্রেমাবেগকে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, মুহাব্বত-এর এ শক্তিকে যদি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা না হয় তাহলে এ সুন্দর গুণটিও মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে যাবে এবং নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হবে। ভালবাসা কখনো আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং আত্মপূজা ও আত্মপ্রসাদের কাজে তা নিয়োজিত হয় অথবা ভালবাসার গতি ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভালভাবে থাকা বা ভাল কাউকে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাওয়ার ব্যাপারে নিয়োজিত হয়। অথবা অপরের জিনিস লাভের জন্য তা উদগত হয় অথবা কখনো অপরের মতবাদ গ্রহণের ভালবাসা মানুষকে পেয়ে বসে।

কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, একজন মুসলমান তাই ভালবাসবে যা তার নিজের জন্য কল্যাণকর বা অপরের জন্য কল্যাণকর, তার নিজের মন-মানসিকতা, শরীর-স্বাস্থ্য, চরিত্র, বৃদ্ধি বা বস্তুর উন্নতিকল্পে অথবা

সমাজের যাবতীয় উন্নতিকল্পে মুসলমানের ভালবাসা নিয়োজিত হবে। যে কাজে তার কল্যাণ কিন্তু অপরের অকল্যাণ সে কাজের সাথে ভালবাসাকে ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম এমন ভালবাসা শেখায় যার দ্বারা মানুষ অকল্যাণকে রোধ করবে এবং অন্যায়কারীদের যাবতীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে এক অভঙ্গুর প্রাচীর খাড়া করে ন্যায় ও সুবিচারের পাতাকাকে সমুন্নত করবে। এ শক্তিকে মুসলমান মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাতে গিয়ে যাকে ভালবাসলে এবং যা ভালবাসলে আল্লাহ্‌তায়ালা খুশী হবেন তাই ভাল বাসবে ; কিন্তু ভাল তাকে বাসতেই হবে, ভালবাসার এই আবেগকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না। মুসলমান এ আবেগকে শর্ত সাপেক্ষেই ব্যবহার করে, লাগাম ছেঁড়াভাবে নয়।

কর্মব্যস্ততা

ইসলাম কর্মহীনতা ও বেকারত্বকে অপছন্দ করেছে। কারণ, বেকারত্বের ফলে মানুষের মধ্যকার পুঞ্জিভূত শক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে যায় এবং সব থেকে বড় বিশৃঙ্খলা হচ্ছে, মানুষ যখন অবসরকে নিজ বুদ্ধিমত কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত করে তখন সে তার শারীরিক শক্তিকে ধ্বংস করতে শুরু করে এবং বেকারত্বের কাজ হিসেবে ধ্বংসকর ও ক্ষতিকর বিভিন্ন অভ্যাসকে আত্মস্থ করে।

সর্বাবস্থায় ইসলাম চায় যে, মানুষ প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর থেকে শুরু করে পুনরায় রাতে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত কোন না কোন কাজে নিয়োজিত থাকুক এবং এমন কোন ফুরসত যেন তার না থাকে যা পূর্ণ করতে গিয়ে তার শারীরিক শক্তি বিনষ্ট হওয়ার সুযোগ আসে এবং তাকে তার মূল পথ থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু এর অর্থ মানুষের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়া নিশ্চয়ই হতে পারে না। কারণ তাতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয় যাবে। যেহেতু ইসলাম মানুষকে পৃথিবীর ভাল জিনিসগুলো থেকে ফায়দা হাসিলের দাওয়াত দিয়েছে এবং পার্থিব জীবনে তার পাওনাকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলাম মানুষকে সর্বক্ষণ ও অনবরত চেষ্টা সংগ্রাম ও কঠিন কাজে নিয়োজিত থাকতে বলে না, বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জীবনে যেন বেকারত্ব না থাকে এবং এমন অবসর যেন সে না পায় যার মধ্যে সে অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণকর কাজ করতে পারে। এ কারণেই দেখা যায় ইসলাম জীবন ধারণের জন্য চেষ্টা সাধনার সাথে সাথে একদিকে যেমন আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্রাম, আহার-নিদ্রার সময় নিরুপণ, পরিবারের সাথে হাসি-খুশীভাবে আলাপ-আলোচনা, দেখা-সাক্ষাত ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও করেছে।

ইসলাম যে সময়ের মধ্যে মানুষের জাহেলী অভ্যাসসমূহ, রীতি-নীতি ও বাজে খেল-তামাশা এবং তাদের জীবনের নানা প্রকার কু-প্রথাকে বদলে দিয়েছিল সে সময়টুকু একেবারে বেকার রেখে দেয়নি, বরং সে সময়টুকুর সঠিক ব্যবহারের জন্য ইসলাম নতুন কিছু অভ্যাস, নতুন রীতি-পদ্ধতি, নতুন আমোদ-প্রমোদ এবং জীবনের স্বাদ-আহলাদের নতুন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যেমন-জাহেলী জামানায় আরবের লোকেরা মদ্যপান, জুয়া, মূর্তি-পূজা, এবং উদ্দেশ্যহীন কাব্য চর্চার জন্য একত্রিত হত। ঐ সময়টিতে ইসলাম জামায়াতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার ব্যবস্থা করলেও পরস্পর মিলিত হয়ে কুরআন চর্চা ও মুখস্থ করার কাজে লাগিয়ে দিল। যেখানে আরববাসী মেলা-আড়ং ও ঈদ-সমাবেশে একত্রিত হয়ে নাচ-গান ও উদ্দেশ্যহীন চেচামেচি করত, সেখানে ইসলাম পবিত্র উদ্দেশ্য, পবিত্র অর্থে উন্নত মানের হাদীয়া বিতরণের মাধ্যমে ঈদ উদ্‌যাপন করার শিক্ষা দিল।

তারপর কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক যখন ইসলাম গ্রহণের কারণে একেবারেই কেটে গেল তখন পুরাতন আত্মীয়তার পরিবর্তে আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে নতুন ভ্রাতৃত্ব কায়েম হয়ে গেল। ঈমানী সম্পর্কের কারণে মুসলমান জনসাধারণ পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেল এবং মায়ের পেটের ভাইয়ের মত, বরং তার থেকে আরো বেশি তারা পরস্পর পরস্পরের দরদী ও নিকট হয়ে গেল। এই ভ্রাতৃত্ব এতটা গভীর ও দরদপূর্ণ ছিল যে, মুহাজিরদেরকে আনসারগণ যখন ভাইরূপে গ্রহণ করলেন তখন তাদেরকে সবকিছু সমান সমান ভাগ করে দিলেন, এমনকি তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও ভাগ করে দিয়ে দিতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি। শুধু এতটুকু করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বরং মীরাসী (উত্তরাধিকারের) সম্পত্তিতেও তাঁরা মুহাজির ভাইদেরকে শরীক করে নিলেন।

وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ حَاجَةً وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - (الحشر : ٩)

"আর যা কিছু তাঁরা দিয়ে দিল সে সব জিনিস সম্পর্কে তাদের অন্তরে তারা কোন আকর্ষণও অনুভব করে না এবং নিজের প্রয়োজনের উপর অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে তারা অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদের ক্ষুধা রয়েছে।"

(হাশর-৯)

যাই হোক, কর্মব্যস্ততা মানুষের মানসিক অবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণের এক উত্তম উপায়। বিশেষ করে সেই সময়ে যখন প্রবৃত্তিকে তার চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রাখা

হয়েছে। এ সময় সব থেকে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে, চাহিদাকে দমন করতে গিয়ে মনের মধ্যে যে শূন্যতা (প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করার দরুণ) পয়দা হয় তা কোন না কোন মনোরম ও আকর্ষণীয় কাজ দিয়ে পূরণ করে দেয়া, যাতে প্রবৃত্তি সেইদিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি আভ্যন্তরীণভাবে নিজের সকল বিভাগে একটি অঙ্গের সাথে অন্য অঙ্গ পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশিক্ষণদানে বাস্তব ঘটনাবলী উল্লেখের ভূমিকা

মানুষের জিন্দেগী চেষ্টা-সংগ্রাম ও কষ্ট-পরিশ্রমে ভরা এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু না কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনা রয়েছে। এগুলো সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার কোন হাত নেই, অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই এগুলো এড়িয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা অতি সত্য কথা যে, একজন দক্ষ প্রশিক্ষণদানকারী ব্যক্তি এই সকল ঘটনা দুর্ঘটনাকে প্রশিক্ষণদানকালে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে পারে এবং এ সব ঘটনা দ্বারা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে। প্রশিক্ষণদানকালে যে সব উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে ঐ সব ঘটনা ও দুর্ঘটনার স্থান যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার কারণ হচ্ছে, দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে মানুষের মেজাজ অনেকাংশে নরম হয়ে যায় এবং এটা অতীব সত্য কথা যে, মন মানসিকতার এই অবস্থা ও গ্রহণশক্তি সব সময় পয়দা হয় না অথবা আরাম-আয়েশ, নিশ্চিন্ততা ও শান্তিপূর্ণ মুহূর্তগুলোর মধ্যেও মানসিক এ বিশেষ অবস্থা আসতে পারে না, কোন বিশেষ ঘটনা বা দুর্ঘটনাই দুর্বিনীত মনকেও নরম হতে বাধ্য করে।

যদিও অত্যন্ত কঠোর সাধনা ও আবেগপূর্ণ অবস্থায় এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতের ফলে আত্মিক যে উন্নতি সাধিত হয় তার কারণেও কখনো কখনো মানুষের মনের মধ্যে কোন কিছু গ্রহণ করার ও তৎপরতা প্রদর্শনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা কদাচিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক এই পরিবর্তন আসে কোন দুর্ঘটনাকবলিত হলেই এবং অনুরূপ অবস্থায় এটা সকল মানুষের মধ্যেই আসে। এ অবস্থায় সবার মধ্যে শক্ত ও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া ও তৎপরতা সৃষ্টি হয়। এটাই সেই অবস্থা যার মধ্যে মানুষের মন কোন কিছু গ্রহণ করতে সার্বিকভাবে প্রস্তুত হয়। আর এ সময় মনকে ভাবাবেগপূর্ণ ও কার্যকর পথ নির্দেশ এবং হেদায়েত দেয়াও যেতে পারে, আর তখনই ঐ হেদায়েতগুলোর গভীর ও স্থায়ী ফল দেখা যায়।

কুরআন কারীম মানুষকে উপযুক্ত ও কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন জাতির কঠিন পরিণতির কথা উল্লেখ করেছে এবং মানুষের

ইতিহাসে সব থেকে ব্যতিক্রম ধর্মী এবং সব থেকে উন্নতশীল উম্মতকে অতীতের ঐ সব ঘটনাবলী দ্বারা শিক্ষা দান করে তাদেরকে আল্লাহ্র যমীনে তাঁর আইন-কানুন চালূ করার মাধ্যমে তাঁর প্রভূত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (ال عمران : ١١٠)

"তোমরাই দুনিয়ার বুকে সব থেকে উৎকৃষ্ট জাতি, তোমাদেরকে গোটা মানবমণ্ডলীর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সর্বপ্রকার ভাল ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখবে, আর নিজেরাও পরিপূর্ণভাবে ঈমানের দাবি পূরণ করবে।" (আলে ইমরাণ-১১০)

মক্কা মুকাররামা-হতে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল সেই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেদায়েত দান

মদীনা শরীফে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার সম্পর্কে অবতীর্ণ হেদায়েতসমূহ থেকে সংগত কারণেই ভিন্নতর ছিল। যেহেতু দু'এলাকার অবস্থা ছিল ভিন্ন, আর এ কারণেই মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে বিপদে সবর ইখতিয়ার, কঠোর অবস্থায় সংযম এবং দুঃসহ যন্ত্রণাকে সহ্য করার জন্য বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। অথচ মাদানী জীবনে বাড়াবাড়ি ও বেইন্সাফীর কারণে জওয়াবী প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। শক্তিদর্পীদের দর্প শক্তি দ্বারা চূর্ণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছ এবং যে কোন অপমানকে সহ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে প্রদত্ত হেদায়েতের উদ্দেশ্য একই ছিল। অর্থাৎ মনের মধ্যে ভারসাম্য ও ইনসাফ পয়দা করা এবং আল্লাহ্র সাথে মানুষের মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা ও প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ্র অস্তিত্বকে হাজির নাজির জেনে তাঁর দিকে রুজু হয়ে থাকা।

প্রাক-ইসলামিক জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে ভীষণ অহমবোধ এবং নিজের অস্তিত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্ক দারুণ অনুভূতি বিরাজ করত। এ ব্যাপারে তাদের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না এবং তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার এ অনুভূতির কারণ, কোন নৈতিক মানে (Ethical value) উপনীত হওয়ার আকাঙ্খা ছিল না; বরং তা ছিল একমাত্র ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ একথা কেউই চাইত না যে, কোনভাবে তার এতটুকু ক্ষতি বা কষ্ট হোক, তা সে যে কোন কারণেই হোক না কেন। কথায় কথায় তারা তরবারি তুলে নিত, এ ব্যাপারে সত্য পক্ষ কোনটি খেয়াল তারা করত না। এ কারণেই দেখা যায় যে, আরব বদ্বীপে প্রতি দিন খুন খারাবী লেগে থাকত। আর রাত-দিন মারামারি-কাটাকাটি, রাহাজনি

এবং জুলুম নির্যাতন হতে থাকত। নিরাপত্তা ও শান্তির নিঃশ্বাস কেউ নিতে পারত না। সততা ও সত্যবাদিতার ভিত্তিতে কাবীলাদের সম্পর্ক গড়ে উঠত না এবং মানব জীবনের মান সম্ভ্রমের কোন প্রকার চেতনা কারো মনে ছিল না। অবশ্য এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু উন্নতমানের যোগ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ছিল। যেমন-তারা অতিথিপরায়ণ ছিল, সৌজন্যবোধ সম্পন্ন ছিল, ওয়াদা পূরণকারী ছিল। অপমানে তারা বিক্ষুব্ধ হত, হীনতাকে সহ্য করতে পারত না এবং গোত্রীয় অধিকার প্রতিরোধ ও প্রতিষ্ঠাকারী এবং গোত্রের মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য তাদের কাফেলা খুনখারাবী করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। এসব কিছু সত্য। কিন্তু এ সব উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কল্যাণকারিতা সম্পর্কে তারা আন্তরিকভাবে আপ্যায়নের জন্য নিজেদের মূল্যবান পশু জবাই করে দিত। যেহেতু এই উদারতা ছিল, লোকেরা তাদের অতিথিপরায়ণতার কথা প্রচার করবে ; অপরদিকে তারা দুর্বলদেরকে, অভাবগ্রস্তদেরকে নিঃস্ব-বঞ্চিতদেরকে, এক গ্রাস খাবারও দিতে প্রস্তুত ছিল না। যেহেতু এসকল ভূখাদের খাওয়ানোর মাধ্যমে কোন সুনামের আশা করা যেত না। আর এ কারণেই বঞ্চিত, নিঃস্ব, ইয়াতীম-বিধবাদেরকে খাওয়ানোর জন্য কুরআনে কারীমে অত্যন্ত তাগিদ দিতে হয়েছে এবং অসহায়দেরকে সাহায্য দান করার জন্য কুরআনে পাকের বহু সূরা ও আয়াতে অত্যন্ত জোরালোভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

"একমাত্র 'হিলফুল ফুজুল'ই ছিল একটি এমন সংস্থা যার মাধ্যমে আরবদের জাগ্রত বিবেকের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোন সংস্থা বা সমিতির কোন সংবাদ ইতিহাসে নেই, যার মাধ্যমে তাদের সামাজিক চুক্তি রক্ষার কোন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, বরং তাদের প্রত্যেকটি চুক্তি হক-নাহক ও সত্য মিথ্যার বাছ বিচার মুক্ত ছিল এবং এক পক্ষকে জুলুম থেকে বাঁচতে গিয়ে অন্য পক্ষের উপর জুলুম করা হত। তাদের নিকট ব্যক্তিগত ও গোত্রগত স্বার্থ ব্যতীত তাদের বিচার-আচার বা চুক্তির মধ্যে কোন ন্যায়-নীতি স্থান পেত না।

আরববাসী তাদের খুশীমত হারাম মাসগুলো (যেগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম বলে বহু শতাব্দী ধরে সবাই মানত) পরিবর্তন করে কোন জুলুমের প্রতিশোধ নিতে চাইত না কারো উপর জুলুম করার পথ বের করে নিত। কোন যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়ে গেলে, শেষ হওয়ার পূর্বেই হারাম মাসসমূহ উপস্থিত হলে সেগুলোকে পিছিয়ে পরবর্তী বছরে ফেলা হত। পরবর্তী বছরেও যুদ্ধ শেষ না হলে তার পরবর্তী বছরে হারাম মাসগুলোকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এভাবে সব কিছুকে তাদের মনগড়া নিয়মনীতি অনুসারে ব্যবহার করার কারণে স্থায়ী কোন নিয়ম-নীতি তাদের মধ্যে ছিল না।

اِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا ـ

(التوبة : ٣٧)

"মাসকে পিছিয়ে দেয়া (নিজের স্বার্থ অনুসারে) এই কাজটি তাদের কুফরীর উপর আরও বাড়তি কুফরী ছিল। যার দ্বারা কাফেরদেরকে আরো বেশি গুমরাহীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তারা এক বছরকে (হারাম মাস পিছিয়ে দিয়ে) যুদ্ধের জন্য হালাল করে নিত এবং অন্য বছরে যুদ্ধ করা হারাম করে নিত।"

(তাওবা-৩৭)

মক্কী যুগের আরবদের এই ঘটনাগুলোকে সামনে রেখে কুরআনে কারীম তাদেরকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে, তাদের কাজ ও ব্যবহারকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে থেকে তারা যেন চিন্তা করতে পারে এবং এভাবে অভ্যস্থ করা হয়েছে, যেন তারা ব্যক্তিগত ও গোত্রগত স্বার্থের গণ্ডীকে দূরে রেখে হক ও ন্যায়-ইনসাফ মত এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা কাজ করতে পারে। যেন তাদের প্রতিটি কথা, কাজ-ব্যবহার, চিন্তা-চেষ্টা সব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে পারে। এ জন্যই মক্কী যুগে মুসলমানদের পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথে টিকে থাকতে গিয়ে কতটা দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে পারে, কতটা ত্যাগ স্বীকার করে এই নব উত্থিত দাওয়াতী কাজকে এগিয়ে নিতে পারে এবং কিভাবে জুলুম ও বে-ইনসাফীর বদলা না নিয়ে তারা সবর করতে পারে।

কঠোরতা ও বিপদ-আপদে সবর (অবিচলতা) ইখতিয়ার করা

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণকে যে জুলুম নির্যাতন সইতে হয়েছে তাতে তারা সবর না করে জওয়াবী হামলাও করতে পারত-এ শক্তি ক্ষমতা অবশ্যই তাদের অনেকের ছিল, আর শক্তি ক্ষমতা না থাকলেও তারা প্রতিশোধ নিতে পারত। কারণ, তাদের প্রকৃতিই ছিল এমন যে কোন জুলুম হলে তাদের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পরিণতির কথা চিন্তা করত না, কে থাকবে, কে থাকবে না। প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী বা কতটা হজমযোগ্য এতসব হিসাব নিকাশ করা আরবদের ধাতের বাহিরে ছিল। কিন্তু, তবুও মুসলমানেরা প্রতিশোধ নেয়নি, কারণ প্রতিশোধ নিলে নতুন আন্দোলন দানা বেধে উঠত না এবং এ নতুন জীবন ব্যবস্থা মাথা খাড়া করতে সক্ষম হত না, বরং জাহেলী-যুগের ধ্যান ধারণা ও রীতি-নীতি যথারীতি চালু থাকত এবং মানুষ মানবতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, হক্ক ও ইনসাফের উপর পরিচালিত জীবনযাত্রা এবং আল্লাহর

সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজব্যবস্থার কদর না করে প্রচলিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোত্রকেন্দ্রিক সমাজের সেই জাহেলী ব্যবস্থার উপরেই টিকে থাকত। কিন্তু কোরআন থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর তারা প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত রইল, তারা শত কষ্ট ও বিপদের মধ্যে সবর করল এবং সর্বপ্রকার জুলুম নির্যাতন সহ্য করে গেল। আর এ সবর ও সহনশীলতা তাদের দিলকে মজবুত বানিয়ে দিল ; তাদের অন্তরগুলোকে অভঙ্গুর শিলাভূমিতে পরিণত করল এবং তাদরে ব্যক্তিত্ব এতই মজবুত ও সম্ভ্রম বোধসম্পন্ন হয়ে গেল যে, ইতিপূর্বে মানুষ ঐ সম্মান ও ব্যক্তিত্ব কখনই অনুভব করেনি। কারণ এ পবিত্র ব্যক্তিগণ ঈমানের ধারক বাহক ছিল এবং আল্লাহ রাব্বুল প্রদত্ত ইজ্জতের নির্ধ্বারিত ভাগ্যলিপির উপর আস্থাশীল ছিল এবং ঈমানের বদৌলতেই সর্বপ্রকার বস্তুগত এবং পার্থিব সব রকমের মূল্যবোধকে যথাযথভাবে মেনে নিয়েছিল। আর এ ঈমানের বদৌলতেই সর্বপ্রকার বস্তুগত এবং পার্থিব সব রকমের মূল্যবোধ থেকে উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল।

প্রশিক্ষণ পর্বে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً - (المزمل : ١٠)

"ওরা যা কিছু বলছে সে ব্যবাপারে সবর কর এবং সুন্দরভাবে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা।" (মুজাম্মেল-১০)

قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۔ نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً
اِنَّـا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً - (المزمل : ٢)

"রাতে ওঠো এবং নামাযের জন্য দাঁড়াও। কিন্তু কিছু সময় বাদে। অর্ধ্বেক রাত জাগো, অথবা তার থেকে কিছু কম জাগো, অথবা অর্ধ্বেকের থেকে কিছু বেশি জাগো এবং ধীরে ধীরে এবং থেমে থেমে কুরআন পড়। অবশ্যই আমি (মহান আল্লাহ) তোমর উপর শীঘ্রই কিছু ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) কথা নাজিল করব।" (মুজাম্মেল-৫)

বিপদ-মুসিবতে সবর এবং রাতে (আল্লাহর দরবারে আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ইবাদাত) নামাযের মধ্যে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দেয়ার কারণ হচ্ছে, যেন মানুষের মন মগজ আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে যায়।

اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلاً - (المزمل : ٦)

"নিশ্চয়ই (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়) রাতে জেগে উঠা-এটা এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে কঠোর ভাবে কু-প্রবৃত্তিকে দমন রাখা যায় এবং কার্যকরীভাবে

তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর এ কাজ কুরআন সঠিকভাবে পড়া ও কথাকে মজবুত বানানোর জন্য অত্যন্ত মজবুত এক উপায়।" (মুজাম্মেল-৬)

নবী করিম (সঃ) এবং তার সংগী সাথী সাহাবায়ে কেরামের অনেকে রাতে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতীকস্বরূপ তাহাজ্জুদ নামাজে মশগুল থাকতেন এবং সারা বছরই নিষ্ঠার সাথে এ রাতে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকতেন এবং 'আলামীন' আল্লাহর ধ্যানে এমনভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে কাটাতেন যে, তাদের পা ফুলে যেত। রাসূল (সঃ)-এর কদম মুবারকও ফুলে ফেটে গিয়েছিল। এ হচ্ছে সাধনের কথার উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক নাজিল করলেনঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ج وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ج عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ج عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَاُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا لِاَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ج وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ (المزمل : ٢٠)

"(হে নবী), নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন যে, তুমি ও তোমার সংগী সাথীদের একটি দল (আল্লাহর মুহাব্বাতে) দাঁড়িয়ে নামায পড়, কখনো রাতের দু' তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সময়ে দাড়িয়ে থাক, কখনো অর্ধেক রাত আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তায়ালাই তো রাত-দিনের হিসাব রাখেন, তিনি জানেন যে, তোমরা কিছুতেই সঠিক হিসাব রাখতে পার না। সুতরাং তিনি মেহেরবানী করে তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে কৃত কাজের জন্য সলজ্জ তওবা কবুল করেন। অতএব নিশ্চিন্তে ও যতটা আসানীতে পড়তে পার ততটাই পড়। অবশ্যই তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ থাকবে, কিছুলোক রুজি রোজগারীর সন্ধানে বিদেশে ভ্রমণরত অবস্থায় থাকবে আবার কিছু সংখ্যক লোক থাকবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা কল্পে যুদ্ধরত। অতএব কুরআন থেকে যতটা মনে আছে তার থেকে যতটা সহজে পড়তে পার পড়, নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে সুন্দরভাবে কর্জ দিতে থাক। আর যা কিছু তোমরা তোমাদের

নিজেদের জন্য ভাল কাজ করতে থাকবে তাই-ই তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে। সেই পাওয়াটাই হবে উত্তম পাওয়া এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি মাফ করনেওয়ালা, মেহেরবান।" (মুজাম্মেল-২০)

মদীনা মুনাওয়ারাতের সংঘটিত ঘটনাবলী

যখন প্রথম যুগের কঠিন অবস্থার মধ্যে ঈমান কবূলকারী মুমিনদের অন্তরের মধ্যে বরকত পয়দা হয়ে গেল। তাদের মন আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়ে গেল, আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট মাত্রায় হয়ে গেল, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং তাদের পূর্ণ একীন (বিশ্বাস) হয়ে গেল যে, আল্লাহ্তায়ালাই মুমিনদেরকে মদীনাতে হিজরাত করতে হুকুম দিলেন, যাতে করে তারা সেখানে গিয়ে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) এবং শরীয়াতের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে এবং বাধা বিঘ্ন ও আক্রমন যাই আসুক না কেন নিজেদের সাধ্যমত তারা প্রতিরোধ করতে পারে।

মক্কা শরীফে থাকাকালীন সময়ে মুমিনদের যে কঠিন নির্যাতন সইতে হয়েছে তা শুধু এজন্য যে, তারা সেখানে দুর্বল ছিল এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে গিয়ে শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল-তা নয়, বরং ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মক্কাতে তারা অনেকেই দুর্ব্যবহারের বদলা নিতে পারত এবং আক্রমনকারীদের সমুচিত শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু মুসলমানগণকে মক্কায় থাকাকালে সবর ইখতিয়ার করতেই শেখানো হয়েছিল এবং মদীনাতে আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাদেরকে শক্তি ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যাতে করে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-কানুন চালু করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে পারে। এ কাজ করতে গিয়ে কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যেন তারা কাজ না করে এবং নিজেদের দিল দেমাগের নিয়তকে খালিস রেখে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তারা কাজ করতে পারে এবং জীবনের সকল ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ - (التوبه : ٢٥)

"আর হুনায়েনের কঠিন দিনের অবস্থা একবার স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে লাগেনি, বরং পৃথিবী তার এত প্রশস্ততা থাকা সত্বেও তোমাদের জন্য

তা সংকীর্ণ হয়ে গেল, তারপর তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পালানো শুরু করলে।"(তাওবা-২৫)

হুনায়েন যুদ্ধের দিনে কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন গুন, এ সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই কিছু খুশী ও অনেকাংশে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল, এতে বুঝা গেল আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কমে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই সংখ্যধিক্যের উপর কিছুটা ভরসা এসে গিয়েছিল, এ অবস্থা আল্লাহ তায়ালা সহ্য করতে রাজী নন, যার জন্য তাদেরকে কিছুটা আঘাত দানের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন এবং বুঝালেন যে, না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি নেই। যাবতীয় শক্তি ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অতএব, একমাত্র তাঁর উপরেই ভরসা করা দরকার এবং তাঁর কাছেই সাহায্যের জন্য হাত তোলা প্রয়োজন। তিনি যাকে খুশী যুদ্ধের ময়দানে সাফল্য দান করেন। মক্কী জিন্দেগীর সেই কঠিন অবস্থায় মুসলমানদেরকে সবর ও কষ্ট সহিষ্ণু উপদেশ দিয়ে তাদেরকে জানালেন যে, দাওয়াতের সাফল্যের চাবিকাঠি বস্তুগত শক্তি নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই সাফল্য নির্ভর করে। এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে নিরন্তর কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকা এবং ঈমানী শক্তি থেকে শক্তি হাসিল করা। মদীনায়ে মুনাওয়অরাতে বস্তুগত শক্তির আধিক্য হওয়ার সময়েও তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বস্তুগত শক্তি যতটা হাতে আসে তার সদ্ব্যবহার তো অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে তার অর্থ এটা হওয়া চলবে না যে, কেউ আল্লাহ থেকে লা পরওয়া হয়ে যাবে এবং বস্তুশক্তিকেই কোন কাজের পরিণতির জন্য নির্ভরযোগ্য মনে করবে। বরং সর্বাবস্থায় মুমিনদেরকে মনে করতে হবে যে, সব কিছুর পরিণতি আল্লাহরই থাকে।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ج ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ (التوبه : ٢٧)

"(শিক্ষঅমূলক কিছু আঘাত দানের পর) আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন এক বাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদেরকে আযাব দিলেন আর সেটাই তো তাদের পাওনা (মন্দ কাজের শাস্তি) তারপর ওমরকে শাস্তি দেয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করে নেন যার কাছ থেকে ইচ্ছা তার কাছ থেকে, আর আল্লাহ তায়ালই মাফ করনেওয়ালা, মেহেরবান।" (তাওবা-২৬)

উহুদ যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধের সময়ে যখন যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য দৃষ্টির বাইরে চলে গেল এবং মুসলমানরা গণীমাতের দিকে ঝুঁকে পড়ল তখনো তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ . مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

(ال عمران : ۵۲)

"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সাথে যে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি এভাবে পূরণ করেছেন যে, যুদ্ধের প্রথম ভাগে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে, কিন্তু যখন তোমরা হিম্মত হারিয়ে ফেললে এবং (পরিচালকের) হুকুম মত কাজ করার ব্যাপারে তোমরা মতভেদ করলে এবং মালে গণীমত যা তোমরা পছন্দ কর তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা নির্দেশ অমান্য করলে, যেহেতু তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে যারা (মুখ্যতঃ) দুনিয়া চায়, আরো কিছু লোক এমন আছে যারা (প্রধানত) আখিরাত চায় ; তারপর তিনি তোমাদেরকে পিছপা করে দিলেন যাতে করে তিনি তোমাদের (ঈমানকে পরীক্ষা করে নেন। অবশ্য এতে যে ত্রুটি তোমাদের হয়েছে তা) আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তো মুমিনদের উপর বড়ই মেহেরবান।

বদর যুদ্ধ

এভাবে বদর যুদ্ধের ব্যাপারেও হেদায়েত দেয়া হয়েছে ঃ

وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ . لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ . اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ . وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ج وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ . (انفال : ۷-۱۰)

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর! যখন আল্লাহ্ তায়ালা তেমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তোমরা দুটি দলের মধ্যকার যে কোন একটি দল পেয়ে যাবে আর তোমরা চাইছিলে যে নিষ্কন্টকটাই তোমাদের হোক, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা (অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত দলটির মুখোমুখি করে দিয়ে) তাঁর কথাগুলো শক্তি দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মিথ্যাকে ধ্বংস করার জন্য, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না। স্মরণ কর! ঐ সময়ের কথা, যখন কাকুতি মিনতি করে তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্যের আবেদন পেশ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের দোয়া কবূল করে জওয়াব দিলেন, আমি তোমাদেরকে মদদ (সাহায্য) দেব পর পর (অনবরত) আগমনরত হাজার হাজার ফেরেশতা দ্বারা। তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং যেন তোমাদের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায় তাই আল্লাহ্ তায়ালা এ সাহায্যের ওয়াদা জানালেন আসলে যাবতীয় সাহায্য তো আল্লহর পক্ষ থেকেই আসে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা মহাশক্তিমান-মহাবুদ্ধিমান।"(আনফাল ৭-১০)

তাবুকের অভিযান

তাবুকের অভিযান সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَنْفُسِهِمْ فِـــى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَاتَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ج لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُـوْنَ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ . فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلـــى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِــىَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ . (التوبة : ٨٣-٧)

"তাবুকের অভিযানে যাওয়া থেকে বিরত থাকার অনুমতি যাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধাভিযানে না গিয়ে এবং পেছনে (মদীনায়) বসে থেকে খুশী হয়ে গিয়েছিল, আসলে তারা তো তাদের মাল ও জানের কুরবানী করে আল্লাহর পথে কোন জিহাদে শরীক হতে প্রস্তুত নয়। এজন্য তারা লোকদেরকে বলেছিল ঃ এই গরমের মধ্যে দলে দলে বেরিয়ো না, তাদেরকে বলে দাও যে, জাহান্নামের আগুন এর থেকে বেশি গরম ; হায়, ওরা যদি তা বুঝত ! অতএব, তাদের হাসা দরকার কম, কাঁদা দরকার বেশি, কারণ যে অন্যায় কাজে তারা লিপ্ত রয়েছে তার প্রতিদান এমনই হয় (অর্থাৎ সে কঠিন

করুন পরিণতির কথা স্মরণ করে তাদের কাঁদাই দরকার বেশি)। তারপর হে রাসূল, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যদি ওদের কোন দলের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীতে যদি তারা কোন যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় সে সময় তুমি বলঃ না, কিছুতেই তোমরা আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার সঙ্গী হয়ে কোন শত্রুর সাথে লড়াইও করতে পারবে না। অবশ্যই তোমরা প্রথম যুদ্ধাভিযানকালে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে ঘরে বসে থাকাটাই পছন্দ করেছিলে। অতএব আজও যার ঘরে বসে থাকে তাদের সাথে ঘরে থাকো।" (তওবা-৮১-৮৩)

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ج وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَنْ لاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ . اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ ج رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ،

"দুর্বল, অসুস্থ এবং ঐ সব লোক যারা জিহাদে যোগদান করার জন্য অস্ত্রপাতি ও রাহা খরচ যোগাড় করতে পারছে না তারা যদি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূরে প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে তাহলে তারা (যুদ্ধে যেতে না পেরে) পেছনে থেকে গেলে কোন ক্ষতি নেই (তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই) এমন এহ্সানকারীদের (যারা অতীতে ঈমানের প্রমান দান করেছে তাদের) জন্য কোন ধরপাকড় নেই এবং তাদের ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলা হবে না। (এতদসত্তেও কিছু ক্রুটিবিচ্যুতি হয়ে গেলে সে ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা মাফ করনেওয়ালা মেহেরবান। আর ঐ সব লোকের ব্যাপারেও কোন ধরপাকড় হবে না যারা তোমার কাছে সওয়ারীর আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে যেন তোমার সাথে জিহাদে যেতে পারে ; কিন্তু তুমি বলেছ "আমি কেন সওয়ারী তোমাদের বহন করার জন্য যোগাড় করতে পারছিনে, এমতাবস্থায় তারা খরচ করার মত পয়সা যোগাড় করতে না পেরে দর বিগলিত ধারায় নির্গত অশ্রুসিক্ত নয়নে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে গিয়েছে। পাকড়াও তো ঐ সব ব্যক্তিকে করা হবে যারা সচ্ছল থাকা সত্বেও তোমার কাছে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য অনুমতি চেয়েছে, তারা ঘরে বসে থাকা মানুষের সাথে পেছনে থাকাই পছন্দ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা (তাদের ভুল) বুঝবেনা। (তওবা ৯১-৯৩)

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صٰلِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ . اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . (التوبه :١٠٣)

"আরো কিছু লোক আছে, যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তাদের জীবনের কাজের মধ্যে ভাল-মন্দ মেশানো আছে, তাদেরকে হয়ত আল্লাহ্‌তায়ালা মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌পাক মায়াফ করনেওয়ালা-মেহেরবান। তাদের ধন-সম্পদ থেকে (তাদের এটির কাফফারাস্বরূপ) কিছু ছদকা নিয়ে নাও যা তাদেরকে পাক-পবিত্র (গুনাহমুক্ত) করে দেবে এবং তাদের জন্য দোয়া কর, নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শুনেন ও জানেন যা তাদের মনের গোপনে বিরাজ করছে।" (তওবা-১০২,১০৩)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ ج فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ . اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

(التوبه-١٢٣ - ١١١)

"অবশ্যই এটা প্রকৃত সত্যকথা যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য লড়াই করে এবং যুদ্ধের সময় তারা শত্রুকে হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়, ঐটাই (ঐ জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াদা, যার বর্ণনা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে পাওয়া যায়। আল্লাহ থেকে অধিক ওয়াদা পূরণকারী আর কে হতে পারে। অতএব, তোমরা যা বিক্রি করেছ তার বিনিময় লাভ করবে বলে সুসংবাদ গ্রহণ কর। খুশী হয়ে যাও ; এটাই তো সব থেকে বড় কৃতকার্যতা। আল্লাহর নিকট তওবাকারী (বার বার প্রত্যাবর্তনকারী), তার আনুগত্যকারী, তার প্রশংসায় মুখর, ভাল ও কল্যাণকর কাজের হুকুমদানকারী ও মন্দকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে যারা এবং আল্লাহর রাজ্যের ও নির্দেশের সীমান্তগুলোকে হেফাজত করে তারাই তো প্রকৃত মুমিন ও আল্লাহ্‌র সুসংবাদ প্রাপ্ত। সুতরাং সেই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।" (তওবা ১১১-৪৩)

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ . وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ . مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ج ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ . وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

(التوبه : ١١٧-١٢١)

"আল্লাহ্ তায়ালা নবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং ক্ষমা করেছেন ঐ মুহাজির ও আনছারদেরকেও যারা বড় সংকটের সময়ে নবীর সাহায্য এগিয়ে এসেছে ও তার অনুসরণ করেছেন যদিও তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা কিছু বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল (কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তারা শেষ পর্যন্ত বাঁকা পথ এখতিয়ার করেনি বরং নবীল অনুগামীই হয়েছে)। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মাফ করে দিলেন। অবশ্যই তাদের জন্য তিনি বড়ই স্নেহময় ও মেহেরবান। আর ঐ তিন জনকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন যাদের সমস্যাটা মুলতবী রাখা হয়েছিল এবং তাদের নিজেদের জীবন তাদের কাছে দুর্বিসহ হয়ে গিয়েছিল। এবং তাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে, আল্লাহর কাছে ছাড়া তাদের আর কোন যায়গাতেই কোন আশ্রয় পাওয়ার মত অবস্থা নেই। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তাদের দিকে মনোযোগী হলেন তারা ফিরে (তার কাছে) আসতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তিনিই যিনি তওবা কবুলকারী, তিনিই মেহেরবান।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। মদীনাবাসী ও মদীনার আশেপাশের (মুসলিম) জনতার পক্ষে নবীর সঙ্গে থেকে দূরে ঘরে বসে থাকা কিছুতেই উচিত হয়নি। অথবা নবীকে ছেড়ে তাদের নিজেদেরকে নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে এটাও তাদের জন্য শোভনীয় হয়নি। এর

কারণ হচ্ছে, তারা যা কিছু পিপাসা, কষ্ট অথবা ক্ষুধা আল্লাহ্‌র পথে থাকতে গিয়ে বরদাশত করেছে, আর সত্য বিরোধীদের নিকট যেসব ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ তারা করেছে এবং সত্যের কোন দুশমন থেকে যে প্রতিশোধ তারা নিয়েছে তার বিনিময়ে তাদের আমলনামাতে কিছু নেক আমল দেখা না হয়ে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা এহ্‌সানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তারা যা কিছু খরচ করছে অথবা আল্লাহ্‌র কাজে যে কোন উপত্যকায় তারা ভ্রমণ করছে তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাদের কাজের তুলনায় তাদের আমলনামায় বেশি নেকী লিখে দিয়েছেন।"(তওবা-১১৭-১২১)

উপরে উল্লেখিত সতর্কীকরণের উদ্দেশ্য

উপরে বর্ণিত কথাগুলোর মাধ্যমে এত কঠোর ভাবে সতর্কীকরণের কারণ হচ্ছে, যেন মুমিনরা জিহাদ থেকে কখনো পিছিয়ে না থাকে। এটাও সত্য যে বাস্তবে ঐ সময়ে কোন খাটি মুমিন কর্তব্য পালনে পিছিয়ে থাকেনি। ঐ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যে তারা যেন সর্বাবস্থায় লালসা, ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতার উর্ধ্বে থেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য কাজ করে যায় এবং প্রত্যেকটি কাজের পেছনে আল্লাহকে রাজী-খুশী করাই যেন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ

(التوبه : ٢٤)

"বল (হে রাসূল), যদি তোমাদের নিকট তোমাদের বাপ-দাদা, সন্তানাদি, ভাই, স্ত্রীরা, আত্মীয় স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন সম্পদ এবং ঐ কারবার, যা মন্দা পড়ে যাওয়ার ভয় তোমরা কর, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ থেকে বেশি প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্‌র ফায়সালা না আসা পর্যন্ত তোমরা ইন্তেজার কর, আল্লাহ্ তায়ালা ফাসেক জাতিকে হেদায়েত দান করেন না।"(তওবা-২৪)

মনের গভীরে জীবনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তীব্র চেতনা যখন বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন মন মজবুত ও স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং তার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দব, দুর্বলতা ও ঝোঁক-প্রবণতা খতম হয়ে যায় এবং তখন যে কদম সামনে বাড়ে তা আর পিছে

হটে না, তারপর কোন কিছুর জন্য অপেক্ষার সময়ে সে আর আগ্রগামী হয় না, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের মধ্যে থাকার সময় তার প্রশিক্ষণ হয়ে যায়, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নুরের আলোতে নূরাণী হয়ে যায় এবং তখন এই অন্তর দিক চক্রবাল থেকে আলো সংগ্রহ করতে থাকে। এভাবে কুরআনে উল্লেখিত ঐ গুণের আঁধার হয়ে যায় যা নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ (ال عمران : ١١٠)

"এখন দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট জাতি তোমরা, তোমাদের কাজ হচ্ছে ভাল কাজসমূহের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ঈমান রাখবে।"(আলে ইমরান-১১০)

ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এটা জরুরী নয় যে, কুরআনে অবতীর্ণ পরম্পরা অনুসারে ঐ ঘটনাগুলো আসতেই হবে যা ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দলের, উপর এসেছিল। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের বাস্তব হিকমাতগুলোকে যেন অনুসরণ করা হয় এবং ঐ সব দুর্ঘটনার বর্ণনায় মনের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা যেন পয়দা হয়ে যায় যার থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে। উপরন্তু এ ফায়দাও হাসিল করতে হবে যে, কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনা থেকে মুমিনগণ পূর্ণ সচেতনতার সাথে তরক্কী করবে এবং সঠিক পথ নির্দেশ পেতে থাকবে।

ইসলামী সমাজ

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এটাও একটা মৌলিক শর্ত যে, ইসলামী সমাজব্যবস্থা বর্তমান থাকতে হবে ; তা না হলে বা এর বিপরীত ব্যবস্থাচালু থাকলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব না থেকে যদি মানুষের তৈরী (বাতিল) সমাজব্যবস্থা চালু থাকে তাহলে যেখানে হাজারো চেষ্টা করা হোক না কেন আদর্শ মানুষ তৈরী করা সম্ভব হবে না। সুতরাং মানুষ গড়ার প্রস্তুতির জন্য পূর্বশর্ত ও প্রথম কথা হচ্ছে, কিছু সংখ্যক লোককে ইসলামী আদর্শের ধারক ও বাহক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে ; বরং ইসলামের বাস্তব প্রতিমূর্তি হিসেবে ফুটে উঠতে হবে। এরা ইসলামী শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী করে সেই শিক্ষাদানে সীমিত পরিসরে চালু করে যে আদর্শের লোক বাস্তবে গড়ে তুলবে তাদেরকে দেখে

আশে পাশের লোকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবে। এভাবে ব্যষ্টির আদর্শে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত সমাজ এবং সমাজের প্রভাবে গঠিত ব্যক্তি, উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। তবে, যেমন করে রাসূল (সঃ) এক ব্যক্তি এক আদর্শ হয়ে ফুটে উঠে সমাজ বিপ্লবের সূচনা করলেন তেমিন আজো এই বিপর্যস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যস্ত সমাজকে নতুন করে গড়ার জন্য প্রয়োজন কিছু আদর্শ ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্বদেরকে ঐ সব প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতেই হবে যা নবী (সঃ)-কে আজকের অনুরূপ সমাজের তরফ থেকে হতে হয়েছিল। এজন্য যে ব্যক্তি ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত—একটা থেকে অপরকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ইসলামী সমাজ কায়েম করার স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে যে, আমরা ব্যক্তি দিয়েই কাজ শুরু করব। যেমন-নবী (সঃ) থেকে কাজ শুরু হয়েছিল। সুতরাং এটাই রাসূল (সঃ)-এর পদ্ধতি। তিনি নবুয়াত ও রিসালাত লাভ করে বাস্তব জীবনেও ঐ রিসালাত-এর নিদর্শন হিসেবে কাজের মাধ্যমে গতিশীল হয়ে গেলেন। অন্যান্য সকল নবী রাসূলেরও এই একই বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সবার মধ্যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনীত জীবনব্যবস্থা, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অন্যান্য নবী রাসূলদের আনীত শিক্ষার সার বস্তু দীন ইসলামের মধ্যে পাওয়া যায়। এ দ্বীন ইসলামকে এত বেশি ব্যাপকতা, পূর্ণাঙ্গতা এবং বিপ্লবী আন্দোলন দান করা হয়েছে যে, তা ধূ ধূ উষর মরুভূমি ও সম্পূর্ণ অনুর্বর জমিতেও শিকড় গাড়তে সক্ষম হলো। তারপর এই শিকড় একবার যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল তখন তার শাখা প্রশাখা গোটা দুনিয়াতে ছাড়া বিস্তার করা শুরু করল এবং জগতের জাতিসমূহের সকল ষড়যন্ত্র ও ধোকাবাজি, আভ্যন্তরীণ গাদ্দারী, তাতারী ও ক্রুসেড যুদ্ধের বিভীষিকা কোন কিছুই আর ইসলামকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। আর আজকের পৃথিবীতে ইসলাম নতুনভাবে পার্শ্ব পরিবর্তন করে পূর্ণজাগরণের এক নব চেতনার সূচনা করেছে।

নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিপ্লবী অন্তরে ইসলামের যে আন্দোলন এবং জীবন প্রবাহ জন্ম নিল তা তাঁর শিক্ষাগুণ অপর অযুত প্রাণেও সঞ্চারিত হলো। এই সত্যের নিশানবর্দার জনতা একটি মুসলিম সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর একাজ দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলল এবং এই মুসলিম সমাজ এমন ব্যক্তিবর্গ তৈরী করা শুরু করল যারা নিজেদের চরিত্র ও ব্যবহার এবং নিজেদের কার্যক্রম ও চিন্তা-চেতনায় পরিপূর্ণভাবে মুসলমান ছিল। এই ইসলামী সমাজের কারখানাতে নতুন নতুন বংশধরদের আগমন হতে লাগল এবং তারা আসল লক্ষ্য অর্জিত হয় অথবা লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অসীলা এবং উপায় হয়ে যায়। আর বংশ পরম্পরাক্রমে একাজ চলতে থাকে।

ইসলামী সমাজ বাস্তবায়িত হওয়ার পর বরাবর এ সমাজ একইভাবে সজীব ও প্রাণসঞ্চারী থাকেনি, বরং এর মধ্যে অনেক সময়েই বহু বিপত্তি এসেছে, সব থেকে বিপদ এসেছে। ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের মধ্যে পতিত হয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে। এই পরাজয়ের গ্লানি মুসলমানদের ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করল। মুসলমানগণ নিজেদের কিল্লাগুলো ও ঘাঁটিগুলোতো রক্ষা করতে থেকেছে। কিন্তু চিন্তারাজ্যে ও আত্মার দুনিয়ায় যে বিপর্যয় নেমে এলো তার কারণে তাদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা ও মর্যদা বিলুপ্ত হতে থাকল—এমনকি ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো খতম হতে হতে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত খতম হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এজন্য এখন নতুন ইসলামী সমাজকে নতুন করে গড়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

প্রথম প্রথম যখন ইসলামী সমাজ অস্তিত্ব লাভ করেছিল তখন তা একটি অত্যন্ত কঠিন, জঘন্য, চরম অহংকারী ও হিংস্র জাহেলিয়াতের পরিবেশে জন্ম নিয়েছিল, আর আজো ইসলামী সমাজ কায়েম হলে তা এই বিংশ শতাব্দীর নিকৃষ্ট জাহেলিয়াতের বুকের উপরেই কায়েম হবে।

•

ইসলামী সমাজঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ

যে কোন সময়েই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার চিন্তা করা হবে তার জন্য ইসলামী সমাজ বর্তমান হতে হবে। কারণ, ইসলামী সমাজ না থাকলে, অথবা এমন সমাজ বর্তমান থাকলে যা ইসলামী বিদ্বেষী অথবা ইসলাম বিরোধী, যে অবস্থায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না এবং ঐ অবস্থায় সকল চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, আপনি আপনার ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শিক্ষা দান করে যাচ্ছেন এবং একটি মুসলিম সমাজের উপযোগী আচার-ব্যবহার ও অভ্যাস শেখাচ্ছেন। এখন এরা, ইসলামী সমাজ না থাকায় বাধ্য হয়ে অনৈসলামী সমাজে চলাফেরা করছে এবং সেখানে যা কিছু মন্দ অভ্যাস ও দৃশ্যাবলী রয়েছে তার সংস্পর্শে তাদেরকে আসতেই হচ্ছে এবং অনেক সময়েই তাদের তরুণ মনে ঐ সকল অনৈতিক জিনিসের ছাপ পড়ার কারণে তারা ভাবাবেগে পড়ে গিয়ে তাদের শিক্ষার কথা স্মরণ রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আপনি কি করতে পারেন? তাদেরকে কি বাড়ীর কয়েদখানায় আবদ্ধ করে রাখবেন। অবশ্যই বাস্তবে এটা করা সম্ভব নয় এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাও এ দাবী করতে পারে না যেহেতু ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের কারণে মানুষ সমাজচ্যুত হয়ে যাবে এটা তো ইসলাম চাইতেই পারে না। ইসলাম তো বৈরাগ্যবাদ ও একঘরে হয়ে থাকার শিক্ষা দেয় না, বরং ইসলাম

তো সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ততার জীবন গড়ে তোলে এবং এমন শিক্ষা দেয় যা সবার সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠবে এবং সবার নজরে পড়বে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি ঐ বিপদগ্রস্ত ও বিপদজনক পরিবেশে যাওয়ার অনুমতি (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) দিয়ে দেবেন বা দিতে বাধ্য হবেন, আর তখন দেখবেন বাইরে কদম রাখার সাথে সাথে এমন বাচ্চার সংস্পর্শে তারা আসবে যারা লজ্জা শরমের সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এমনভাবে মুখ খারাপ করছে, এমন গালি দিচ্ছে যা শুনলে মুখ লুকাতে ইচ্ছে হবে। তারা এমন ছেলে মেয়েদের সাথে উঠা বসা করবে যারা ধোকা দিচ্ছে, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে কষ্ট দিচ্ছে এবং মুনাফেকী করে চলেছে। তারা এমন শিক্ষাক ও শিক্ষিকার কাছে লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হবে যারা ততক্ষণ পড়াতে থাকবে যতক্ষণ তাদের ভয় থাকবে যে, কেউ তাদের কাজের তদারক করে যাচ্ছে, নতুবা গল্প গুজব করেই তারা সময় কাটিয়ে দেবে। এরা বাজারে গেলে সর্বত্র তাদের নজরে পড়বে কেউ কাউকে ঠকাচ্ছে, কেউ কাউকে ধোকা দিচ্ছে বা ওজনে কম দেয়ার চেষ্টা চলছে বা ভাল জিনিস বলে বা ভাল জিনিস দেখিয়ে মন্দ জিনিস সুকৌশলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অথবা ভেজাল দ্রব্য বিক্রির প্রতিযোগিতা চলছে। সমাজের সবখানেই ওরা দেখবে মানুষকে মানুষ গোলাম বানিয়ে রেখেছে। বড় ছোটকে দাবিয়ে রেখেছে। শক্তিমান দুর্বলকে গলা টিপে ধরছে, ধনীরা ধন-দৌলতের গর্বে গর্বিত মাথাকে সমুন্নত করে চলেছে এবং দীন-দরিদ্র দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তার দুর্বল মাথাকে অবনত করে চলছে। প্রত্যেক গাত্রাবাসেই কিছু মন্দ জিনিস লেগে রয়েছে, প্রত্যেক পোশাকের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে কিছু না কিছু লজ্জাহীনতা ; প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছেলেমেয়েরা যৌন আবেগ পূর্ণ গান ও গল্প পরিবেশন করে যাচ্ছে। মহিলারা প্রসাধনী ও সাজ-সজ্জা দ্বারা নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে ব্যস্ত। ছায়াছবির নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন যেখানে সেখানে লাগানো রয়েছে। পত্র পত্রিকার পাতাগুলো নির্লজ্জ ছবিতে ভরপুর। যুবকেরা বিনা কারণে এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করছে এবং ভবঘুরেরা বেড়াচ্ছে। এদের সবার অবস্থা এমন যে, এরা জীব জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট এবং এদের ব্যবহার পশুকেও হার মানাতে শুরু করেছে।

যাই হোক, এক কথায় বলা যায় যে, সব ব্যবস্থা এবং সকল ব্যাপারের মূল্যবোধ উল্টে গিয়েছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধূলায় মিশে গিয়েছে এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট চরিত্রই যেন সমাজে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি। কু-কাজে লিপ্ত ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট বদমায়েশরা জনগণের উপর সর্দারী করে যাচ্ছে, অপরদিকে ভদ্র, সম্মানী, দ্বীনদার ও চরিত্রবান লোকেরা ধিকৃত ও অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাক পবিত্র পবিত্রবতী মেয়েদের বিয়ে শাদী হচ্ছে না এবং নেক বখত ছেলেরা জীবন সংগ্রামে সব খানে পরাজিত হয়ে চলেছে।

সমাজের সকল দিক ও বিভাগে মিথ্যা, ধোকাবাজি বিরাজ করছে এবং প্রত্যেক শাখায় ঠকবাজী ও নির্লজ্জতার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। নগ্নতার হাতছানি, ঈমান ও ইয়াকীনের উপর বিদ্যুৎ প্রবাহী নির্লজ্জ ডানাকাটা পরীর আহ্বান, চরিত্র বিধ্বংসী কিস্‌সা কাহিনী, মনমগজকে ধাঁধিয়ে দেয়ার মত সাংবাদিকতা, নির্লজ্জ গান বাদ্য, নারী পুরুষের জন্য সহঅবস্থান এবং বিষাক্ত পরিবেশ এ সবই এ সমাজে বর্তমান রয়েছে। আর এ সমাজেই তো আপনার ছেলে মেয়েকে যেতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, আপনি বলুন তারা কিভাবে সঠিক অর্থে মুসলমান থাকতে পারে অথবা মুসলমান হতে পারে।

এ সকল অবস্থার যুক্তিসংগত সংশোধন

এ সকল অবস্থার সংশোধন একটি মাত্র উপায়েই হতে পারে ও হয়েছে, আল্লাহর নিয়ম ও এটাই। আর তা হচ্ছেঃ এই সমাজের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক যুবকের একটি দল এগিয়ে এলো, এরা সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেতে অস্বীকার করল, সমাজের ঐ নোংরামী থেকে তারা তাদের গাত্রাবাসকে পবিত্র রাখলো এবং সমাজের চিন্তার জগতে ও নৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে সমাজের নেক চরিত্র ও পবিত্র স্বভাবের লোকদেরকে তাদের আশে পাশে জড় করতে শুরু করল। অবশেষে এই কয়েকজন যুবকের চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ-কুরবানীর ফলে ইসলামী সমাজ গড়ে উঠল।

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ - (النساء ١٠٤)

"যেমন করে (আমি মহান আল্লাহ) প্রথম বারে সৃষ্টি কাজ শুরু করেছিলাম। তেমিন করে আমি পূণরায় তা করব।" (আম্বিয়া-১০৪)

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً - (الاحزاب : ٧٢)

"এটা আল্লাহ তায়ালার নিয়ম ঐ সকল লোকের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে যারা ওদের পূর্বে গুজরে গিয়েছে, আর তোমরা আল্লাহর নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন খুঁজে পাবে না।" (আহযাব-৬২)

ইসলামী পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য যত প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হোক না কেন, তার মনের মধ্যে ঈমানের মধ্যে ঈমানের মূলনীতিসমূহ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য ইসলামী সমাজের প্রয়োজন অপরিহার্য। যাতে করে তারা এই ইসলামী সমাজে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং সেই সমাজকে অনুসরণ করে তার চিন্তা ও কাজকে সঠিক খাতে

প্রবাহিত করতে পারে। সাধারণ মানুষ তো এত বাহাদুর দিল হয় না যে, তারা সমাজের গতিধারাকে উপেক্ষা করে চলতে পারবে এবং একটি কলুষিত সমাজে বাস করে পাক পবিত্র জীবন যাপন করতে ও অপরকে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা দিতে পারবে এবং তাদের চেতনা ও অনুভূতিকে এমনভাবে উজ্জীবিত করতে পারবে যে, যে সমাজে তারা নিঃশ্বাস নিচ্ছে তাকে তারা পরিবর্তন করেই ছাড়বে।

ইসলামী সমাজের সর্বপ্রথম লক্ষণ হচেছ, তা পরিচ্ছন্ন হওয়ার সাথে সাথে পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং বাইরের যে কোন প্রভাবমুক্ত হবে। এ সমাজের ব্যক্তিগণ অথবা ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে যে কাজ করতে চাইবে তাতে বাঁধা সৃষ্টি করার কেউ থাকবে না। এর মধ্যে অকর্মণ্য ও পুরাতন কোন নিয়মনীতি অন্ধভাবে মেনে নিতেই হবে এ রকম কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না এবং এখানে মানুষের উন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধকতাও থাকবে না। এ সমাজে মানুষ জানোয়ার হয়ে যাবে না, বরং সে এ সমাজের মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে।

ইসলামী সমাজে সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এখানে সে একমাত্র আল্লাহ্র দাস। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং গায়রুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কহীনতা তার মধ্যে এতটা শক্তি ও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে যে, সে সত্য ছাড়া অন্য কারো বা কিছুর সামনে মাথা নত করে না। সে এমন সমাজের সদস্য হয়ে যায়, যার সভ্যগণ শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই চলে এবং আল্লাহ্র ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করে না।

ইসলামী সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। এই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি নেকীর প্রসার কল্পে পরস্পর সহযোগিতা করে এবং পাপ ও অন্যায়কে উৎখাত করার ব্যাপারেও তারা একে অপরকে সাহায্য করে এবং এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলে যাতে করে যার মধ্যে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরগণ কলূষতা মুক্ত জীবনের শিক্ষা পেতে পারে।

ইসলামী সমাজে শাসক ও প্রজাসাধারণ সবাই আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য পরস্পর সহযোগিতা করে এবং ঐ পদ্ধতি অবলম্বন ও বিস্তার করে যা সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য ব্যষ্টির জন্য ও সমষ্টির জন্য, কল্যাণকর হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যুদ্ধসংক্রান্ত ও আইন-কানুনগত সকল দিক ও বিভাগ তার অন্তর্গত থাকে।

ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে ও এজন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে। এই সমাজের প্রত্যেক নারী পুরুষ নতুন বংশধরদের প্রতিপালনের জন্য ও তাদের সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আত্মনিয়োগ করে।

ইসলামী সমাজের প্রতিটি বস্তুই মুসলমান। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম মত নিয়ন্ত্রিত হয়। সেখানে শাসন ব্যবস্থা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস অনুসারে গড়ে উঠে। প্রজারা সাধারণভাবে হয় মুসলমান। ইসলামের অর্থনীতি, সামাজিকতা, ইসলামী খান্দান, ইসলামী শিক্ষালয়, প্রচার ও প্রচার ব্যবস্থা ইসলামী, পাঠ্য বিষয় ও সাহিত্য ইসলামী এবং এর ফলে অবশ্যই সমাজের সকল মানুষ মুসলিম হয়ে যায়।

ইসলামী সমাজের উপর ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী আইন-কনুরের প্রাধান্য থাকে এবং ঐ সমাজের সকল ব্যক্তির চিন্তাগত এবং আত্মিক উন্নতির দায়িত্ব এবং সহযোগিতা বর্তমান থাকে।

এহেন সমাজ পবিত্রতার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠত থাকে, সেখানে পাক-সাফ এবং পবিত্র যুবকগণ লালিত পালিত হতে থাকে, স্বামী-স্ত্রী ও তাদের বাচ্চাদের মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক গড়ে উঠে, প্রভু ভৃত্য, মালিক-কর্মচারী, শাসক ও শাসিত সবার সম্পর্কের মধ্যে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা এবং চিন্তা ও কাজের মধ্যেও পবিত্রতা বিরাজ করে।

এ সমাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে জুলুম, বাড়াবাড়ি এবং কোন বে-ইনসাফী হয় না। এখানে অসত্য ব্যবস্থা নির্জীব হয়ে যায় এবং সত্য সেখানে সজীবতা লাভ করে। সেখানে মানুষের মূল্যবোধ জোরদার হয় ও প্রসার লাভ করে। সেখানে আত্মিক উন্নতি অগ্রগতি হয়, সেখানে বস্তুগত উন্নতি আসে এবং আত্মিক উন্নতি ব্যক্তি মানুষের অগ্রগতি লাভর উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এহেন সমাজ মানুষের ব্যাপক সম্ভাব্যতার প্রসাদ নির্মান করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং কল্যাণের কাজে লাগায়। অপরদিকে মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তিকে মন্দ, অকল্যাণকর ও অশান্তির কাজে লাগায়। অপরদিকে মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তিকে মন্দ অকল্যাণকর ও অশান্তির কাজে লাগায়ে সে শক্তির অপচয় করে না। বরং ইসলামী সমাজ যাবতীয় মন্দ, অকল্যাণকর ও অশান্তির মূলকে উৎপাটিত করে। এমন সমাজের চেষ্টা সংগ্রামের সকল মানদণ্ড ইন্‌সাফ এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার উপর কায়েম থাকে। কারণ এ সমাজের সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সব দিক ও বিভাগ ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সেখানে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত পন্থা-পদ্ধতিগুলো অনুসৃত হয়।

একমাত্র এ ধরনের সমাজেই 'সৎ মানুষ' পয়দা হয় এবং খাঁটি ইসলামী সমাজ কায়েম হয়ে গেল সাধারণ প্রচেষ্টাতেই সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী হতে থাকে। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে, ইসলামী সমাজ হয়ে গেলেই আমরা এ ভরসাতে নিশ্চিত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে আশা করতে থাকব যে, আমাদের বাচ্চাদেরকে সমাজই শিক্ষা দিয়ে দেবে, বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমাদের

পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবং সমাজ এই শিক্ষা দানের জন্য আমাদের সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবে।

ইসলামী সমাজ খান্দান এবং পিতামাতার দিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখে। কারণ একটি উন্নত চরিত্রের অধিকারী খান্দানই ইসলামী সমাজের ভিত্তি।

মোট কথা, ইসলামী সমাজ, মুসলিম খান্দান এবং মুসলিম ব্যক্তি যখন অস্তিত্বে আসবে, তখনই ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থা, তার যাবতীয় কল্যাণ সহ ফলপ্রসু ও কার্যকর হবে।

প্রশিক্ষণের উপকারিতা সমূহ

ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অধীনে আমরা যত লোককে প্রশিক্ষণ দেব এবং যাদের আত্মা, বুদ্ধি এবং শরীরকে গড়ে তুলব এ আর যাদেরকে আমরা বাস্তব নমুনা, উপদেশ, কিস্‌সা কাহিনী, অভ্যাস ও বিভিন্ন ঘটনার সাহায্যে প্রশিক্ষণ দেব তারা কোন্ ধরনের মানুষ হবে, তাদের চিহ্নসমূহ কি হবে, কি তাদের বৈশিষ্ট্য হবে, কি ধরনের অবস্থা হবে এবং কিভাবে আমরা তাদেরকে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরব? সর্বপ্রথম যে কথাটি আমরা বলতে পারি তা হচ্ছে যে, ইসলামের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অধীনে এমন সৎ ব্যক্তিগণ আত্মপ্রকাশ করবে যারা সঠিক অর্থে ইবাদত গুজার (আল্লাহ্‌র যাবতীয় নির্দেশ মান্যকারী) এ বইতে এ পর্যন্ত ইবাদতের যে অর্থ বিবৃত হয়েছে সে সকল ইবাদাত গুজার। অর্থাৎ তার সকল কাজ, সকল পদক্ষেপ প্রতিটি চিন্তা ও অনুভূতি আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী হবে।

নেককার মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কিন্তু ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দ্বারাতেই যে নেককার এবং ইবাদাতগুজার মানুষ তৈরি হয়ে যাবে এবং নেক চরিত্র সম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরাপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে তা নয়, বরং এ সম্পর্কে আরো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে কম পক্ষে আরো তিনটি গুন উল্লেখ করা দরকার ; যেমন-তাকওয়া, বিনয়, ও লজ্জা-শরম।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ - (الحجرات : ١٣)

"নিশ্চয়ই সব থেকে সম্মানী লোক তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি খোদা ভীরু।"(আযহাব-১৩)

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ - (الفتح : ٢٩)

"তাদের চেহারাগুলোতে সিজদার চিহ্নসমূহ বিদ্যমান।"(ফাতাহ-২৯)

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتٰتِ وَ الصَّادِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحَافِظٰتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ - (الاحزاب : ٣٥)

"নিশ্চিতভাবে এটা সত্য যে, সকল পুরুষ ও নারী মুসলিম, মুমিন, আনুগত্যশীল, সত্যবাদী ধৈর্যশীল (বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, ও দুঃখ দৈন্যে অবিচল) আল্লাহ্তায়ালার সামনে বিনয়াবনত, সদকা দানকারী, রোজাদার, লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং বেশি বেশি আল্লাহ্কে স্মরণকারী।"

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ - (النور : ٣٠ ـ ٣١)

"মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের নজরকে অবনত রাখে এবং এভাবে তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটাই হবে তাদের জন অধিক পবিত্র পন্থা। নিশ্চয়ই ওরা যা কিছু করছে সে বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা স্মরণ রাখেন। আবার মুমিন নারীদেরকেও বলে দাও তারা যেন তাদের নজরকে নিম্নগামী রাখে এবং এভাবে তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" (নূর-৩০-৩১)

"লজ্জা-শরম ঈমানের অংশ" (হাদীসে রাসূল)

এখন এক ব্যক্তিকে দেখুন, তার চেহারা থেকে তাকওয়া ও বিনয় প্রকাশ পাচ্ছে ; তার গতিবিধি থেকে শান্তশিষ্টভাব ও লজ্জাশীলতা পরিস্ফুট হচ্ছে, কিন্তু তার এই শান্তশিষ্ট হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে বোকা এবং লজ্জাবনত হওয়ার মানে এ নয় যে, সে দুর্বল। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে সে তার মাথা একমাত্র আল্লাহ্ ওয়াহদাহু লা শারীকাল্লাহর সামনে ঝুঁকায় এবং একমাত্র আল্লাহ্কেই সে ভয় করে, অপর দিকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো) সামনে সে মজবুত শক্তিশালী এবং দৃঢ়মন এবং দ্বীন ইসলামের আনুগত্যের ব্যাপারে সে অত্যন্ত কঠোর ও শক্ত।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - (الفتح :٢٩)

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এবং তাঁর সংগী-সাথীগণ কাফিরদের উপর ভয়ানক রকমের কঠোর, সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু।"(ফাতাহ-২৯)

তার নরম দিল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, প্রয়োজনে সে, শক্ত হতে পারবে না, আর কাফিরদের উপর ভয়ানক কঠোর বলে নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক দয়ালু হওয়াতে কোন আঁচ পড়বে তাও না। তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাতে যখন যেমন শক্ত বা নরম হতে বলা হয়েছে, সে তখন তেমনই হয় এবং যখন যে ভূমিকা তাকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তখন সে সেই ভূমিকাই গ্রহণ করে। এতে তার নিজের মর্জিকে সে কোন দখল দেয় না বা তার ভাবাবেগকেও সে কোন মূল্য দেয় না। এক কথায় বলা যায় আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবূল করার এবং তার প্রিয় হওয়ার জন্য সদা ব্যগ্র থাকায় একজন মুমিন সারাক্ষণ তার আনুগত্য এবং সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বানিয়ে নেয়, যা খুশী তা করার জন্য মনস্থ ও চেষ্টা করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মওলাপাকের ইচ্ছার যাবতীয় চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেকে মেশিনের মত বানিয়ে ফেলে। অপর দিকে যারা আত্মসমর্পণ করার পর নিজের ইচ্ছা ও রুচিবোধকে প্রাধান্য দেয় অথবা নিজের মতামতের বিপরীতে আল্লাহ্‌র কোন বিধান জানতে পারলে আল্লাহ্‌র বিধানের গুরুত্বকে অস্বীকার করে স্বীয় মতানুসারে চলে সেই সব মুনাফিক ও কাফিরদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - (التوبه :٧٣)

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।" (তাওবা-৭৩)

অন্যদিকে মুমিনদের সম্পর্কে নির্দেশ দেয়ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

(ال عمران :١٥٩)

"এটা আল্লাহ তায়ালার বড়ই মেহেরবানী যে (তাঁর মেহেরবানী কারণেই) তুমি তাদের (মুমিনদের) জন্য রহম দিল হতে পেরেছ ; আর (তা না হয়ে) তুমি যদি কর্কশভাষী ও কঠিন হৃদয় হতে তাহলে ওরা তোমার আশ-পাশ থেকে ছিটকে চলে যেত।"(আলে ইমরান-১৫৯)

কাফিরদের সম্পর্কে কঠোরতা করার কারণে মেজাজে সর্বক্ষণ তিক্ততাও

কর্কশতা আসতে থাকবে তা নয়। কারণ এগুলো তো কোন পছন্দনীয় গুণ নয়। আর এটা খুবই স্পষ্ট যে রাসূল(সঃ) বরাবরই এ ধরনের মন্দ ও নিন্দনীয় দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু কাফিরদের সাথে শক্ত ব্যবহার করে। কারণ হচ্ছে যে, তাদের মন্দ ভূমিকা প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে যেহেতু তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যই এ কঠোরতা অত্যাবশকীয়। মুমিনগণ যেহেতু কল্যাণ পেতে চান ও কল্যাণ করতে চান এবং এটাই এ কল্যাণকামিতাই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য যার জন্য তারা যে কোন মূল্যে মন্দকে প্রতিরোধ করে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে চান।

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيــــــمٌ ـ

(فصلت : ٣٤)

"মন্দকে প্রতিরোধ কর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা, যার ফলে যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমার চরম শত্রুতা বিদ্যমান সেই ব্যক্তি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে।"(হাশর-৫৯)

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحسَنُ السَّيِّئَةَ ـ

মন্দকে সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস দিয়ে প্রতিরোধ করা।" কখনো কখনো সদুপদেশ দ্বারাতেই মন্দ প্রতিরোধ করা যায়। (মুমেনুন-৯৬)

اُدْعُ اِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ (النحل : ١٢٥)

"হে নবী! মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর সুমিষ্ট উপদেশ দ্বারা।"(নাহাল-১২৫)

এ পদ্ধতি ও উপায়গুলো যখর আর কার্যকর থাকে না তখন কঠোরতা ও তিক্ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে যায়। সে সময় শক্ত ভূমিকা গ্রহণ করাই উচিত ও উপযোগী হয়।

মুমিন সর্বাবস্থায় শক্তিশালী এবং সকল পরিবেশে মর্যাদাপূর্ণ হয়।

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَتَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيــــنَ ـ (ال عمران : ١٣٩)

"মন ভাংগা হয়ো না, আর দুঃখ করো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।"(আলে ইমরাণ-১৩৯)

কোন মুমিন খুশ-খোশালীতে যখন থাকে তখন মিথ্যা বা মন্দ জিনিসের মাধ্যমে সে খুশীর বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না, যেহেতু ইসলাম অহংকার ও আত্মম্ভরিতাকে পছন্দ করে না।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ .

"আর লোকদের সাথে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীর বুকে অহংকারপূর্ণভাবে চলাফেরা করো না, কোন অহংকারী ও আত্মম্ভরী লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের কণ্ঠস্বর কিছুটা খাটো রাখো। যার আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজই হচ্ছে সবচাইতে কর্কশ। (লোকমান ১৮-১৯)

وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ـ (الاسراء : ٣٧)

"আর পৃথিবীর বুকে অহংকারপূর্ণভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই তুমি (পদাঘাতে) পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে দিতে পারবে না আর পাহাড়সম উচ্চতাতেও তুমি আরোহন করতে পারবে না।"(বণী ইসরাঈল-৩৭)

এ আয়াতগুলোতে বিনয়-নম্রতা, ইনসাফ ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আসলে প্রকৃত ইজ্জত হচ্ছে আল্লাহর উপর ঈমান রাখা ও নিজেকে গায়রুল্লাহর সামনে মাথা অবনত করা থেকে বিরত রাখা এবং সর্বপ্রকার মন্দ, ঘৃণ্য জিনিস এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখা। মুমিনদের এই মান সম্ভ্রম, মর্যাদা ও সাফল্যের সময়ের জন্য শুধু নয়, বরং সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই এই মান সম্ভ্রম টিকে থাকবে। এই কারণেই মুমিনদেরকে যুদ্ধাবস্থার জন্য আশ্বাস দেয়া হয়েছে—এবং কাফিরদের পরাক্রমপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছেঃ-

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ . وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - (ال عمران:٤)

"মন ভাঙ্গা হয়ো না ও দুঃখ করো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। তোমাদেরকে যদি কোন আঘাত স্পর্শ করেই থাকে তো এর আগে তোমাদের বিরোধীদেরকেও তো এ ধরণের আঘাত স্পর্শ করেছিল। এমনি করেই আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের মধ্যে দিনগুলো আবর্তিত করতে থাকেন।"

(আলে ইমরান ৩৯-৪০)

সর্বদাই এ উন্নত শির, এই মর্যাদা এবং এ ইজ্জত ঐ নেক মানুষ এবং ঐ

মুমিন ব্যক্তির স্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং দৃশ্যমান লক্ষণ যা তার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে দেখা যায়।

একজন মুমিন যে কোন পরাজয় এবং ব্যর্থতার মধ্যেও এ জন্য উন্নত শির থাকে যে পার্থিব বিজয় ও সাহায্য দ্বারা মান সম্ভ্রম আসে একথা সে মনে করে না, যার জন্য পরাজয় ও ব্যর্থতা তাকে মুষড়ে ফেলতে পারবে না, বরং সে বিশ্বাস করে যে তার উন্নত শির হওয়া ও ইজ্জত লাভ করা আল্লাহর উপর ঈমাণ ও আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্ভব। এই সম্পর্ক তার অন্তরের গভীরে গাথা থাকে যা কোন পরাজয়ের কারণে কখনো মলিন হয় না।

দুনিয়ার মন ভুলানো ও আকর্ষণীয় যে কোন বস্তুর মুকাবিলাতেও মুমিন উন্নত শির থাকে, কারণ মুমিনের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং সে দুনিয়া লাভ ও লোভ অর্জনের জন্য সত্য সাধনা পথ থেকে কোন অবস্থাতেই বিচ্যুত হয় না। তা সে লোভনীয় বস্তু দুনিয়াদারদের সামনে যতই আকষর্ণীয় ও মূল্যবান হোক না কেন। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখে।

وَ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى - (طٰهٰ : ١٣١)

"দুনিয়ার বিভিন্ন লোককে যে সব শান-শওকতের জিনিস আমি (মহান আল্লাহ্) দিয়ে রেখেছি সেগুলোর দিকে নজর উঠিয়েও দেখোনা কেননা ঐ সব (নাফরমান) লোককে তো আমি ওসব দিয়ে রেখেছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, আসলে তোমার রবের দেয়া হালাল রিযক (জীবন ধারণ সামগ্রী) যতটুকু তোমাকে দেয়া হয়েছে তাই উত্তম এবং টেকসই।" (ত্বহা-১৩১)

কু-প্রবৃত্তির চাহিদা ও যৌন খাহেশকে দমন রাখার ব্যাপারেও দৃঢ়তার পরিচয় দাও এবং উন্নত শির থাক, অন্ধ আবেগের নিকট আত্মসমর্পণ করো না। যেহেতু মুমিন আল্লাহর নজরে এবং নিজের নজরেও সম্মানিত থাকে; তার জন্য কোন চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে নেমে আসা এবং নানা প্রকার ঘৃণ্য ও কদর্য খাসলাত ও কাজে জড়িয়ে পড়াটা কিছুতেই শোভনীয় হবে না। কেননা এ দুনিয়ার স্বাদ-আহলাদের জিনিস থেকে বহু গুনে বেশি ভাল ও লোভনীয় জিনিস তার জন্য আল্লাহর নিকট মওজুদ রয়েছে।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ - (النور:٣٣)

"যে সব লোক বিয়ে করতে পারছে না (আর্থিক সংকটের দরুন) তাদের পক্ষে আত্মসংযম করা উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা তার নিজ মেহেরবাণী-বলে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন।"(নূর-৩৩)

মুমিন ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন ও বাজে কাহিনী থেকে দূরে থাকে। তারা সে সব কাহিনী ও উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে গৃহীত হয়েছে। তাদেরকে মানুষের তৈরী মূল্যায়নের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলতে পারে না বা এতবেশি প্রভাবিত করতে পারে না যে, তার কাছে নতি স্বীকার করবে। যেহেতু এসব বস্তুগত শক্তি ও বস্তুর মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করা তার নজরে ভিত্তিহীন এবং সত্যিকার অর্থে গুরুত্বহীনও বটে, আর ঐ সব পরিমাপ দিয়ে বস্তুসমূহের মৌলিক উপাদানের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না।

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَ لاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا . وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ . (الكهف : ٢٨-٢٩)

“আর সেই সব লোকের সাথে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর। যারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁকে ডাকে (তাঁর কাছে মুনাজাত করে) আর দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্খায় তাদের থেকে তোমার নজর ফিরিয়ে নিয়ো না। এবং যে সকল লোকদের অন্তরকে আমি (মহান আল্লাহ) আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। তাদের আনুগত্য করো না এবং তাদের কথা মতো চলো না যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী (আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করে) হয়েছে এবং তার কাজে সীমা লংঘন করেছে। তারপর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তারই অনুসরণ কর। এর পর যার খুশী সে ঈমান আনবে এবং যার খুশী সে অস্বীকার করবে।” (কাহাফ-২৮-২৯)

যে মুমিন তার মাথাকে এতখানি উন্নত রাখে যে, সে নিজের চেহারাকে কখনো কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত করবে না এবং পৃথিবীর বুকে সে কখনো অহংকার-পূর্ণভাবেও চলবে না। বরং সে তো মানুষভাইকে সম্মান দেখিয়েই চলবে এবং অন্যেরাও তাকে মান্য করবে। যেহেতু তারা জানে যে, মুমিনের মধ্যে নিরেট সত্যের অনুসরণ বর্তমান রয়েছে এবং তারা শূন্য ভাড় ও অন্তঃসারশুন্য নয়।

একজন মুমিন ও নেক মানুষ নিজের উন্নতি ও অগ্রগতির গরিমায় অপরকে হেয় জ্ঞান করে না। কিন্তু যখন কেউ তাদেরকে দুঃখ কষ্ট দেয় তখন তাদেরকে এরা নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয় এবং তারা যে প্রকৃতপক্ষে ছোট একথা জানিয়ে দেয়। অথচ সাধারণ অবস্থায় কাউকে একটা কটু কথা বলাও একজন মুমিন অপছন্দ করে।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ـ (النساء : ١٤٨)

"নিকৃষ্ট ও মন্দ কথা প্রকাশ্যে বলাবলি আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না, তবে কারো প্রতি জুলুম করা হয়ে থাকলে সে একথা প্রকাশ করতে পারে।"(নিসা-৪৮)

এভাবে নীচ প্রকৃতির লোকদের বাড়াবাড়িকে তাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে একজন মুমিন প্রতিহত করে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ(الفرقان : ٦٣)

"আর পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার বান্দাহগণ বিনয়-নম্রতার সাথে পৃথিবীতের চলাফেরা করে এবং তাদের হঠকারী মূর্খ লোকেরা সম্বোধন করলে (বিতর্কে লিপ্ত করতে চাইলে) বলে 'সালাম'-শান্তি, অর্থাৎ তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমিও শান্তি চাই।"(ফুরকান-৬০)

আল্লাহর নেক বান্দাহ মানবীয় আবেগ অনুভূতির অধিকারী হয়, তারা-গোটা মানবজাতির সাথে ভদ্র-নম্র ব্যবহার ও দয়া প্রদর্শন করে এবং একথা মনে করে যে, সকল মানুষ একই রক্তমাংসে সৃষ্টি হয়েছে এবং একই বাপ মায়ের সন্তান।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ (الاعراف : ١٨٩)

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরক একজন ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন।" (আরাফ-১৮৯)

একজন মুমিন জানে এবং বিশ্বাস করে যে, সমগ্র মানবজাতি একই বাপ-মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে তারা পরস্পর ভাই ভাই এবং এজন্য, সে যে কোন মানুষের সাথে স্নেহ-মায়া-মমতা, দয়া ও ভালবাসার সাথে ব্যবহার করে এবং তাদের মন্দ ব্যবহার বা খাসলতের দরুন যে অপরাধ হয় তা মাফ করে দেয়।

وَ سَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ (ال عمران : ١٣٣ـ١٣٤)

"দ্রুত গতিতে ধাবিত হও তোমাদের পরওয়ারদিগারের ক্ষমার (ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য কাজের) দিকে এবং ঐ জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা সপ্ত

আকাশ ও পৃথিবীর সম্মিলিত প্রশস্ততার সমান যা নির্ধ্বারণ করা হয়েছে সেই সকল মুত্তাকী লোকদের জন্য যারা স্বচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় খরচ করে(অভাবগ্রস্ত ও আত্মীয় স্বজনের জন্য) এবং তাদের জন্য যারা রাগকে সংস্বরণ করে এবং তাদের জন্য যারা মানুষকে মাফ করে দেয়।"

(আলে ইমরান ১৩৩-১৩৪)

মুমিন ব্যক্তি মানুষের কল্যাণকামী ও মঙ্গলাকাঙ্খী হয় এবং সকল মানুষের জন্যই হয় রহম দিল, এমনকি অপরিচিত লোকের জন্যও বটে। সে কাজের জন্য সদা ব্যস্ত থাকে মানুষের কল্যাণে আত্ম নিয়োগ করে এবং অধিকাংশ সময়েই মানুষের কল্যাগ করে।

"প্রতিদিন আদম সন্তানদের উপর সদকা করা ওয়াজিব। জিজ্ঞাসা করা হলো ; ইয়া রাসূলুল্লাহ দৈনিক আমরা কিভাবে সদকা করব? তিনি জওয়াব দিলেনঃ কল্যাণের বহু দরজা আছ ; সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর পড়া, ভাল কাজের নির্দেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে ফিরে আসার জন্য হুকুম দেয়া এবং সাধ্যমত শক্তি প্রয়োগ করা, পথ থেকে কষ্ট দায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া, বধিরকে বুঝিয়ে দেয়া, অন্ধকে পথ দেখানো, কারো প্রয়োজন পূরণ করা এবং নিজের পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে, দুঃখ-দৈন্যের কারণে যারা চেচামেচি করছে, তাদের সাহায্যের জন্য দৌড়াগৌড়ি করা এবং নিজের বাহুর শক্তি দিয়ে দুর্বল ও পতিতদের টেনে তোলা।"(ইবনে আব্বাস, বায়হাকী)

শুধু শান্তির সময়ে নয়, বরং মুমিন তো যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লড়াই ঝগড়ার মধ্যেও মানুষের ভাবাবেগকে উপেক্ষা করে না এবং নিজের আবেগ মুহাব্বত থেকেও মুক্ত হয় না।

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে সুন্দর ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদি কাউকে হত্যারও প্রয়োজন হয় তা উত্তম পদ্ধতি ছাড়া হত্যা করো না (নৃশংসভাবে হত্যা করো না)। কোন জীব-জানোয়ার জবাই করার সময়েও ভালভাবে জবাই কর এবং ছুরির ধার তীক্ষ্ণ করে শীঘ্র জীবনে আরাম দাও। (মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

মুহাব্বত করা, মুহাব্বত করতে. সক্ষম হওয়া এবং নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকভাবে মুহাব্বাত করা ভাল লোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এবং যতটা তার মুহাব্বতের আবেগ বৃদ্ধি পাবে ততই তার মানবতার মধ্যে বন্ধুত্ব প্রকাশ পেতে থাকবে।

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না

যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপরের জন্য সেই জিনিস পছন্দ না করে যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে।"(বুখারী)

এই হচ্ছে সেই মানসিক মর্যাদাবোধ ও স্বভাবত বেপরোয়া মনোভাবের অবস্থা যা তাকে মানুষের জন্য মুহাব্বাত করতে ও দান-ধ্যান করতে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ এ মুহাব্বতের প্রকৃত উৎস হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার মুহাব্বাতের অফুরন্ত ফোয়ারা, যার ঢেউ অবিরতভাবে আছড়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত দুঃখী মানুষের তৃষ্ণা নিবারণার্থে। মুমিন মানুষকে ভালবাসে বলেই তো তাদের জন্য কল্যাণকামী হয়। সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর এটা সে এই জন্যই করে যেহেতু মানুষকে সে পথ দেখাতে চায় এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করে। তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে বা তাদের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে একাজ করে না।

মুমিন অবশ্যই একজন নেকলোক হবে, সে হবে আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন মানুষ, সে হবে বাহাদুর, সে মানুষকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখলে তাকে সাহায্যের জন্য দৌড়ে যাবে এবং তাকে তার জান-মাল দিয়ে সাহায্য করবে।

وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ
السَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ - (البقرة : ١٧٧)

"মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্র মুহাব্বাতে তার প্রিয় মাল খরচ করে আত্মীয় স্বজনের জন্য, ইয়াতীমদের জন্য, অভাবগ্রস্তদের জন্য, মুসাফিরদের জন্য যারা সাহায্যের জন্য হাত পাতে তাদের জন্য এবং বন্দী বা দাসদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য।"(বাকারা-১৭৭)

নেক মানুষ মুমিন, তার শক্তি, কাজ ও চেতনায় হবে একজন ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফওয়ালা মানুষ। যেহেতু তার শক্তি হয় কর্মমুখর এবং জীবনের অঙ্গ। সে কোন ঘটনায় হঠাৎ করে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠে না। যেহেতু তার বুদ্ধিই তাকে আবেগ প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে চিন্তার গুম্বুজে এবং ধ্যানের মেহরাবে আবদ্ধ হয়েই থাকেনা, বরং তার জীবনী শক্তি তাবে কর্মমুখর করে রাখে। সে দুনিয়ার বস্তু ও স্বাদ আহলাদের মধ্যে ডুবে থাকে না, বরং তার আত্মিক শক্তি তাকে অধঃপতনে যাওয়া থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখে এবং সে জিন্দেগীর পবিত্র জিনিসগুলো থেকে এমনভাবে ফায়দা হাসিল করে যে, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সে নেয়, লাগাম ছেঁড়া অবস্থায় শুধু নিজের ফায়দা হাসিলের জন্য সে কাজে আত্মনিয়োগ করে না। যখনই প্রয়োজন হয়, তখন সে যে কোন ফায়দা (উপকারের বস্তু) ছেড়ে দিয়ে জিহাদে রওয়ানা হয়ে যায়। সে

কোন খবর শুনলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে সে খবর যাচাই করে দেখে যে তা সত্য কি না।

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ - (الحجرت : ٦)

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক (গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত) ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে সে খবরকে যাচাই করবে (দেখবে তা সত্য কিনা)। এমন হতে পারে যে, ঐ খবরের উপর ভিত্তি করে এমন পদক্ষেপ নিয়ে বসবে যা সংশোধনযোগ্য থাকবে না, পরে খবরটি ভিত্তিহীন বলে জানলে যে পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে তার জন্য শরমিন্দা হয়ে যাবে।"

প্রকৃত মুমিন প্রত্যেক নিত্য-নতুন মতবাদকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে না, বরং যে কোন নূতন বিষয়কে সে নিজের মধ্যে রক্ষিত সত্যের মাপকাঠি (বিবেক) দ্বারা যাচাই করে দেখে এবং বুঝে নেয় যে, তার মধ্যে সত্য কতটা থাকে। যেহেতু সে ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا -(النجم : ٢٨)

"ওরা তো শুধু বা আন্দাজের অনুসরণ করে এবং আন্দাজ অনুমান সত্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। (নজম-২৮)

وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ . اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ اُولٰۤئِكَ كَانَ مَسْئُوْلاً - (الاسراء : ٣٦)

"এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগে যেয়ো না যার সম্পর্কে তোমার সঠিক কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই প্রতিটি কান, চোখ এবং প্রতিটি অন্তরকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"(বণী ইসরাঈল-৩৬)

কিন্তু সে পুরানো কোন জিনিসের উপর জমে থাকে না, বরং আল্লাহপাকের নেয়ামতের কথা স্বীকার ও স্মরণ করে নিজের চিন্তাকে চেষ্টা তদ্বীর ও জেনে শুনে কাজে লাগায় এবং যেখানেই সত্যের সন্ধান পায় সেখান থেকে তা আহরণ করে এবং তার অনুসরণ করেন। যেহেতু, বিচক্ষণতা মুমিনের হারানো ধন। (তিরমিযী)

এই হারানো ধন যেখানেই সে পাক না কেন সেখান থেকেই সে তা আহরণ করে। আর সেই তো তার সত্যিকারের উত্তরাধিকারী।

সে হয় ইনসাফ-মেজাজ এবং ভারসাম্যপূর্ণ, সে আল্লাহর দেখানো পথ এবং সংবিধান থেকেই পথের সন্ধান পায় এবং তার মধ্যে থেকে গৃহীত নির্দেশ অনুসারে কাজ করে, আর সেখানে যা কিছু নিষিদ্ধ পায় সেগুলো পরিহার করে।

মুমিন-নেক মানুষ-প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এক প্রভাবশালী এবং দারুণ কর্মঠ শক্তিসম্পন্ন। তাঁর মধ্যে আশ্চর্যজনক শক্তি ও কর্মদক্ষতা বিদ্যামান। তার মধ্যে এমন ভীষণ বিপ্লবী শক্তি বর্তমান রয়েছে, যা বাস্তব জগতে কাজে লাগে। তার ঈমানের দাবীর ভিত্তিতেই রচিত হয় আল্লাহর সংবিধান। প্রশস্ত হয় আল্লাহর পথ। এই ঈমানী দাবীর কারণে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় এবং তার গুরুত্ব চেতনাও কাজের জগতে তার অনুভূত হতে থাকে।

মুমিনের কর্ম শক্তির উৎস

সৃজনী শক্তির মূল রহস্য (হাকীকত) সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা, ঈমানের মূল প্রকৃতি, সৃষ্টির রহস্য, মানুষের সৃষ্টি কৌশল এবং এ গুলোর মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিটি ব্যাপারে এবং প্রতিটি সমস্যার সমাধানের সময় তাকে এমনভাবে পথ নির্দেশ করে যে, তার জীবনের মূল পথ থেকেই সে শক্তি পায়। এজন্য সে কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার সময়ে এবং রায় কায়েম (মত স্থির) করতে গিয়ে অথবা পদক্ষেপ নিতে গিয়ে হতাশা ব্যঞ্জক কোন মত দেয় না, বরং তার সুনির্দিষ্ট চিন্তা ধারণার ভিত্তিতে সে ফলপ্রসু মত দান করে।

তার কর্মশক্তি আল্লাহ সুবাহানুহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির পথে নিয়োজিত থাকার কারণে বিশ্বব্যাপী তা উন্নতি ও নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত থাকে। সে কখনো অলস ও কর্মবিমুখ অবস্থায় হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকে না।

তার কর্মব্যস্ত আশাবাদিতা অন্যায় কাজের পথ রোধ করে এবং যথা সম্ভব অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং শেষ পর্যন্ত মূল্যোৎপাটন করেই ছাড়ে। কোন সময় অন্যায় বা বাতিল শক্তির কাছে পরাজিত হলেও তার অন্তর অন্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং অন্যায়কে হামেশা খারাপই মনে করতে থাকে এবং মৌন ভাবে অন্যায়ের উৎখাত কল্পে সুপরিকল্পিতভাবে (ধীরে ধীরে হলেও) এমন সুব্যবস্থা নেয় যার ফলে অন্যায়ের উৎখাত সম্ভব হতে পারে। এটাই হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতম অবস্থার লক্ষণ। যারা আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও অন্যায়ের উৎখাতের চেষ্টা না করবে তাদের মধ্যে ঈমানের ক্ষীনতম অংশও নেই বলে প্রমাণিত হবে। আর যে হাত (শক্তি) দিয়ে অন্যায়কে কাজ বন্ধ করে ন্যায় কাজের প্রতিষ্ঠা করবে সে প্রথম শেণীর, আর যে কথা দ্বারা (বিলম্বে হলেও) অন্যায়ের উৎখাতের কাজ করবে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমানের অধিকারী।

মুমিন তার আশাবাদী মন নিয়ে নিরন্তর ও নিরলসভাবে চেষ্টা সাধনা চালাতে গিয়ে মজবুত ও নির্লিপ্ত মেজাজের অধিকারী হয়, সে নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, সে তার জীবনের মূল্য বুঝতে পারে। যে তার ব্যক্তিগত

গুণাবলীর ও তার বংশের মর্যাদা এবং ধন-সম্পদ দ্বারা নিজের মূল্যের পরিমাপ করে না, বরং সে মুমিন হিসেবেই তার নিজের মূল্যায়ন করে এবং সে বুঝে যে, সে ঐ সঠিক শক্তি থেকে হেদায়েত পেয়েছ যা সমস্ত জগতের প্রাণকেন্দ্র এবং মূল শক্তি। এই আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতই তার মধ্যে কর্মতৎপরতা এবং বিশ্বজোড়া শক্তি পয়দা করে দেয়। এবং সে গভীরভাবে অনুভব করে যে, সে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েত এবং শক্তি লাভ করছে।

মুমিন একজন নেক বান্দা সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার একটি বিশেষ সত্বা হচ্ছে যে, সে একজন সামাজিক মানুষ। তার ব্যক্তিগত সত্বা এবং মেজাজের স্বাতন্ত্র তাকে তার এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে না, বরং তার ও সৃষ্টির অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে এক যোগসূত্র সৃষ্টি করে। এযোগসূত্র তার স্রেষ্টার সাথে কায়েম হয় ও তাঁর মাধ্যমে গোটা সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়।

ঈমান আনার কারণে সর্বাপেক্ষা বড় যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে মুহাব্বাত। এই শক্তি স্রষ্টা ও সমগ্র সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং এ যোগাযোগের পথে যা কিছু বাঁধা আছে তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। এরই কারণে, সে সমাজের লোকদের সাথে নেকী ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে। একজন মুমিন সদা-সর্বদা মুহাব্বাত করনেওয়ালা হবে, যোগাযোগ-রক্ষাকারী হবে এবং সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়কারী হবে। যেহেতু ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই একাকীত্ব বা নির্জন সাধনাকে পছন্দ করে না। আর এ জন্যই এরশাদ হয়েছে ঃ

"যে মুমিন মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকে এবং তাদের দেয়া কষ্টকে সবরের সাথে বরদাশত করে, সে ঐ মুমিন থেকে বেশি প্রতিদান পাবে, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টের কারণে সবর করার প্রশ্নও যার জীবনে নেই।"(বুখারী, আহমদ)

অবশ্য একথার অর্থ এটাও নয় যে, মুমিনগণ অন্য লোকদের সাথে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে মুহাব্বাতের সাথে ব্যবহার করে বলেই যে তারা লোকদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, তারা যখন তখন সময় নেই, অসময় নেই, লোকদের বাড়ি গিয়ে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটাবে, বরং ইসলাম এ ব্যাপারেও হেদায়েত দিয়েছে এবং তার কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۔ (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের বাড়ী ছাড়া অন্য কোন বাড়ীতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত (তোমাদের আগমনের সংবাদ দিয়ে) তাদের সন্তোষ কামনা না করে নাও এবং অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সালাম না কর। তোমাদের ঐ ব্যবহারই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, হয়ত (এ নির্দেশ থেকে) তোমরা শিক্ষা লাভ করবে।"(নূর-২৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ـ (النور : ٥٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধীনস্থ লোকেরা, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী এবং বাড়ীর ছেলেপুলেরা যারা বালেগ হয়নি তারা তোমাদের কাছে আসার সময় তিনটি সময়ে যেন অনুমতি নিয়ে আসে (অন্য সময়ে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই) ; ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে বিশ্রামকালে যখন তোমরা কাপড় নামিয়ে অসাবধানে থাক এবং এশার নামায বাদ-ওদের জন্য এই তিনটি সময়ে পর্দা করতে হবে। (নূর-৫৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (الحجرات ـ ٥ ـ ٤)

"হে নবী! যে সকল মানুষ হুজরার বাইরে থেকে তোমাকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশ নির্বোধ। তারা যাদি ধৈর্য ধরে তোমার (নিজের থকে) নির্দিষ্ট সময়ে, বের হয়ে আসার অপেক্ষা করত তাহলে সেইটাই তাদের জন্য কল্যাণকর হত।"(হুজরাত ৪-৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ـ (الاحزاب ٥٣)

"হে ঈমানদারগণ! নবীর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, খাবার সময়ের জন্যও অপেক্ষা করো না। তবে তোমাদেরকে খাব্রার জন্য ডাকা হলে ভেতরে যাবে। কিন্তু খাওয়া শেষ হলেই প্রস্থান করবে, কথা বলতে সময় কাটিওনা।"(আহযাব-৫৩)

এই সভ্যতা, এই শিক্ষা-দীক্ষা মুমিনদেরকে একটি অনুভূতিশীল এবং রুচিশীল

জাতিতে পরিণত করেছে। তারা ভালবাসার কারণে মানুষকে কষ্ট দেয়নি এবং মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যও নষ্ট করেনি বরং ভালবাসার কারণে লোকদের জন্য ত্যাগ কুরবানীর ব্যবহারই করেছে এবং নিজেদের ভাইদেরও মুহাব্বাত পেয়েছে ও তাদেরকে মুহাব্বতের প্রশ্রবণ ধারা থেকে আকণ্ঠ পান করার সুযোগ করে দিয়েছে। সাক্ষাতের সুযোগ, সময় ও স্থান ঠিক করে তবেই গিয়ে মুলাকাত করার ব্যবস্থা করেছে, তাও অনুমতি সাপেক্ষে। পারস্পরিক এই আদব রক্ষার কারণে এবং এই ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠা এই সম্পর্ক ও মুহাব্বাত আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন সময়েই কম হয়নি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার শিক্ষা

মুমিন, আল্লাহ্‌র নেকবান্দা-সে সদা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, তার লেবাস-পোষাক পরিচ্ছন্ন ও পাক পবিত্র হয়, তার কাজগুলো পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। সে লোকদের সাথে লেন-দেনের ব্যাপারেও পাক-ছাপ ও সুন্দর।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - (المدثر : ٤)

"আর তোমার কাপড়গুলোকে পবিত্র রাখ।" (মুদ্দাসের-৪)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ - (البقرة : ٢٢٢)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তওবাকারী ও পবিত্রতা গ্রহণকারীদেরকে ভালবাসেন।"(বাকারা-২২২)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا (النساء - ٥٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা যোগ্য পাত্রদের হাতে আমানত সমূহ সোপর্দ কর।"(নিসা-৫৮)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ . فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ . اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ . الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - (المؤمنو : ١-١١)

"অবশ্যই ঐ সকল মুমিন সফলতা লাভ করেছে, যারা তাদের নামাযে বিনীত ও অবনতভাব অবলম্বন করেছে, যারা নিরর্থক জিনিস (কাজ, কথা ও ব্যবহার) থেকে দূরে থেকেছে, যারা পবিত্রকরণের কাজটি করেছে এবং যারা নিজেদের স্ত্রীগণ ও অধীনস্থ দাসীগণ (যাদের সাথে স্ত্রী সুলভ ব্যবহার করা শরীয়াত জায়েয করেছিল) ব্যতীত (অন্যান্য সকল মহিলা থেকে) নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাজত করে। ঐ সকল স্থান ব্যবহার করায় তাদেরকে কোন দাবি হতে হবে না। এ সীমারেখার বাইরে যারা যেতে চাইবে তারাই হচ্ছে সীমালংঘনকারী। ঐ ব্যক্তিগণও সফতলার অধিকারী যারা তাদের সকল আমানতের এবং ওয়াদা ও চুক্তির হক আদায় করে এবং যারা তাদের নামাজগুলোকে (বরাবর) হেফাজত করে চলেছে। তারাই হচ্ছে এমন উত্তরাধিকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের ও উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"(মুমেনুন-১-২)

মোট কথা, ইসলাম মুমিনকে তার জীবেনে প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকার শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহর সাথে বান্দাহর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র যোগাযোগের উপায় হচ্ছে নামাযের নিয়মাবলী যথাযথভাবে রক্ষা করে নিয়মিত বিনয়ের সাথে আদায় করা, অকেজো কথা ও বেফায়দা কাজগুলো পরিহার করা, চিন্তাশক্তি, বিবেক ও জিহ্বার পবিত্রতা রক্ষা করা, জিহ্বাকে ঐ সমস্ত কথা বলা থেকে বিরত রাখা, যা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পছন্দনীয় নয় এবং চিন্তাকে বিভ্রান্তিমূলক ধ্যান-ধারণা থেকে বাঁচানো। যাকাত অর্থ পবিত্রকরণ, মালের আকর্ষণ মানব হৃদয়কে সংকীর্ণ করে এমন অপবিত্র করে দেয় যে, সে অপরের সংকট সমস্যা দেখেও দেখে না। অন্যের দুঃখ বুঝেও বুঝতে চায় না, তার হৃদয় হয়ে যায় কঠিন। এই অপবিত্রতা থেকে মানব হৃদয় যখন রক্ষা পায় তখন সে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে তার ধন-দৌলতকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত বলে বুঝে নিয়ে তারই হুকুম মুতাবিক তা খরচ করে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ অভাবগ্রস্ত, দুস্থ ও এতিম, বিধবা ইত্যাকার ব্যক্তির জন্য সে অকাতরে দান করে। যৌনাংগগুলোকে হেফাজতের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে অন্যায়-অবিচার, জুলুম নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতা ও বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধি থেকে বাঁচানো। আমানতের হেফাজত এবং মানুষকে প্রদত্ত ওয়াদাপূরণ দ্বারা মানুষের সাথে লেনদেনের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য আসে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা দৃঢ়তর হয়। শুভেচ্ছা-বিনিময় সহজ হয়, সত্যবাদিতা ও মুহাব্বাতের মধ্যে নিষ্ঠা আসে। এ সকল গুণ সামগ্রিকভাবে এবং পুরাপুরিই একজন মুমিন তথা সচ্চরিত্রবান মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং তার নেক ও পবিত্র জীবনের লক্ষণ।

বিবেকবান, বুঝদার এবং অনুভূতিশীল একজন মুমিনের মনের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতার ভাবধারা সদা জাগরুক থাকার সাথে সৌন্দর্যবোধও সুসামঞ্জস্যভাবে বিরাজ করে, যেহেতু কুরআনের পরিবেশে বাস করার দরুণ তার মধ্যে অভাবনীয় দূরদৃষ্টি আসে, সৃষ্টির সৌন্দর্য সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি জীব ও সুন্দর জিনিস সম্পর্কে অপরিসীম চেতনা জাগে। রাত ও দিনের আনাগোণা, তারকারাজি ও গ্রহ-উপগ্রহের সৌন্দর্য এবং সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সুন্দরের মেলা ও মনোরম দৃশ্য তার হৃদয় মনকে বিমোহিত করে। কিন্তু তাই বলে মুমিন আকর্ষণীয় চেহারার গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আত্মহারা করে ফেলে না, বরং এসব কিছুর স্রষ্টা মহাসুন্দর আল্লাহ্‌পাকের সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করার আকাঙ্খায় সে তারই বিধানের মধ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।

মুমিন দুনিয়াতে তার কর্তব্য পালন করে ; বিনিময়ে আল্লাহর কাছেই সে জান্নাত আশা করে, অন্যায় থেকে দূরে থাকে, অন্তঃসারশূন্য শক্তিগুলোর উপর সে নির্ভর করে না, অন্যায় শক্তি থেকে সর্বদা দূরে রাখে এবং দৃঢ়তার সাথে সে একথা বিশ্বাস করে যে, সকল কিছুর পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতে। সে তার হাত ও বাহুর শক্তির সাহায্যে রুজি আহরণ করার চেষ্টা করে এবং পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করে। এরপর আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে সে তার বিধান মত খরচ করে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, বিপদ মূসীবত, যাই আসুক না কেন, আল্লাহর হুকুমেই আসে। সে আল্লাহর পথে টিকে থাকতে গিয়ে যখন কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন সবর করে এবং কল্যাণ পাওয়ার জন্য তাঁরই দ্বারস্থ হয়।

এভাবে, সকল অবস্থাতে মুমিন একজন সুন্দর মানুষ, সে দুনিয়াতে তার সামগ্রিক ও সার্বিক যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়েই জীবন যাপন করে, অর্থপূর্ণ ও উপকারী কাজে নিজের সময় ব্যয় করে এবং বস্তুগত দুনিয়া ও আত্মার জগতের মধ্যে সু-সামঞ্জস্য সম্পর্ক বজায় রাখে।

· বাস্তবতা ও উপমা

অনেকে মনে করে যে, পৃথিবীর সকল শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনকি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও এমন কিছু দৃষ্টান্তমূলক এবং কাল্পনিক উদাহরণ ও উপমা পেশ করে যার সাথে বাস্তবতার এবং বাস্তব দুনিয়ার কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। কথাটা যদিও একেবারে ফেলে দেয়া যায় না, বরং একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কথাটা অনেকাংশ সত্য ; কিন্তু সবটুকু সত্য নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে,

দুনিয়ার সকল শিক্ষা ব্যবস্থার আসল কাজ হচ্ছে এমন কিছু সঠিক ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর জিনিসকে মানুষের সামনে রেখে সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা যা সকল সময়েই অুসরণযোগ্য এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে অনুকরণ করা যেতে পারে। তাছাড়া ঐ উচ্চ লক্ষ্য-মাত্রায় পৌঁছানোর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করলে যে চেষ্টা ও শ্রম ব্যায়িত হবে তার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা সকল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত যোগ্যতা দান করবে। এ ধরনের মহান আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর না হলে আমরা বুঝতেই পারব না যে, আমরা চেষ্টা সাধনার পর্যায়ে কতটা পথ অতিক্রম করতে পেরেছি এবং ঐ কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে আর কতটা পথ বাকী। মনযিলে মাকসূদে পৌঁছানোর জন্য কতটা পরিশ্রম করা হয়েছে আর কতটা পরিমশ্র করলে সেখানে পৌঁছানো যাবে।

তবে, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা পেশকৃত আদর্শ নমুনা বা দৃষ্টান্তযোগ্য উপমা এমন যেন না হয় যে সে সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো মানুষের মধ্যে-সীমার মধ্যে না থাকে, বা তা বাস্তবে লাভ করা অসম্ভব বলে মনে হয়, কারণ এমন কিছু অতি কাল্পনিক জিনিসকে অনুসরণ করে যে চেষ্টা হবে, তা মানুষকে বিফল মনোরথ করবে এবং তার সকল চেষ্টাকে বৃথাই নষ্ট করে দেবে। এমনও যেন না হয় যে এমন কিছুর দৃষ্টান্ত হাজির করা হবে যা হবে অশরীরী, যার অবয়ব অনুমান বা অনুসরণ অসম্ভব!

কিন্তু, ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ উপরে বর্ণিত ঐ দু'ধরণের দুর্বলতা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি স্থাপিত হয়েছে যে দৃষ্টান্তযোগ্য ও আদর্শ নমুনার উপর যার বাস্তব রূপ লাভ করা অসম্ভবও নয়, অথবা এমন কাল্পনিক শরীরও ঐ মূলনীতিতে দেওয়া হয়নি যা অনুসরণ করা ফরজ।

ইসলাম নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তাকেই বাস্তব নমুনা ও উৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে পেশ করেছে, কারণ তিনি মানুষ ছিলেন, তিনি মানবতাকে যে উন্নত মানে ও উচ্চ স্থানে আরোহণ করতে চেষ্টা করতে থেকেছেন, এবং অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের কোন কোন দিক এমনভাবে আয়ত্ত করেছে যার ফলে তার মধ্যে ঐ বিশেষ বিশেষ দিকে পূর্ণত্ব লাভ সম্ভব হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ইসলামী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আরও অগণিত মানুষ তাঁর অনুসরণে যে সাফল্য, মহত্ত্ব ও উচ্চমান অর্জন করেছেন যার কারণে তাঁরা মানুষের কাছেও সম্মানের উঁচু আসনে সমাসীন হয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র কাছেও তাঁরা কৃতকার্য ও ভাগ্যবান বলে গণ্য হয়েছেন।

রাসূল (সঃ)-এর অনুকরণে কেউ তো সত্য পথে চলতে গিয়ে ত্যাগ-কুরবানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, কেউ সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন, আবার কেউ রহমত, মুহব্বত ও মানব-দরদের পরম প্রতীকরূপে নিজেকে পেশ করেছেন। এমনি করে ইসলামী শিক্ষার মূলনীতির হাজার হাজার নমুনা সামনে ফুটে উঠেছে।

ইসলামী ইতিহাসের ঐ অধ্যায় উন্নতি-প্রগতি ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনে নজির-বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং চিরদিনের জন্য নজির হয়ে রয়েছে যখন মুসলিম উম্মত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশের আলোকে নিজেদেরকে গড়ে তুলে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অগ্রসর করে চলেছিলেন এবং এমন কীর্তি স্থাপন করেছিলেন যার কারণে তাঁদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অবশ্য, এটা ঠিক যে পরবর্তীকালে ঐ ধরনের দৃষ্টান্তযোগ্য নমুনা প্রদর্শন করার মত ব্যক্তির সংখ্যা কমে গিয়েছে, কিন্তু একেবারেই যে অমিল হয়ে গিয়েছে তা নয় এবং যে সব দৃষ্টান্ত প্রথম অধ্যায়ে স্থাপিত হয়েছে, পরবর্তীকালে সেগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে থেকেছে এবং সেগুলো বাস্তব নমুনাও পেশ করতে থেকেছে।

শিক্ষাদান করার যে দৃষ্টান্তমূলক নজির ইসলাম নির্ধারণ করেছে তা কাল্পনিক, মনগড়া ও অলীক বা অবাস্তব কিছু নয়, বরং ইসলামের নমুনা ছিল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী, সম্পূর্ণ সত্য এবং বাস্তবধর্মী এবং ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে তার কল্যাণকারিতার অসংখ্য সাক্ষ্য বহন করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম মানুষের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তাআলা মানুষের মধ্যে যেভাবে যোগ্যতা ও কাজ করার শক্তি দান করেছেন সেই অনুযায়ী তাদেরকে মান সম্ভ্রম ও উন্নতির বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করেছেন। ইসলাম এ কথাই বলে যে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা যে যোগ্যতা ও শক্তির বীজ নিহিত রেখেছেন তা সে পুরাপুরিভাবে ব্যবহার করুক, তাকে কাজে লাগাক এবং সাধ্যমত তার উন্নতি সাধন করুক।

ইসলাম সকল মানুষ থেকে একই প্রকার যোগ্যতা, একই প্রকার মহত্ত এবং সবাইকে একই প্রকার মাপকাঠি হতে হবে এ দাবী কখনো করে না, বরং ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক যোগ্যতা, দক্ষতা, শক্তি ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে নিজের পজিশন, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তবে একটি বিষয় ইসলাম বিশেষভাবে দৃষ্টিতে রাখে যে, একেবারে সবদিক দিয়ে অযোগ্য ও অক্ষম লোকের সংখ্যা যেন নগণ্য না

হয়, এজন্য মানুষের সুপ্ত যোগ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেয়, তার রুচি ও ঝোঁক প্রবণতা অনুসারে কর্ম বাছাই করার মত কর্ম সম্ভাবনার দ্বার তার সামনে খুলে দেয় যাতে করে প্রতি ব্যক্তিই যে কোন কাজ পেতে পারে এবং নিজ পছন্দ ও রুচিসম্মত হওয়ার কারণে তারই মধ্যে তার দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। এর থেকে বড় বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা পদ্ধতি আর কি হতে পারে!

ইসলাম মানুষের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার বিভিন্ন প্রকার রুচি ও পরিবর্তনশীল ভাবপ্রবণতাকেও ইসলাম উপেক্ষা করে নি, যার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির মতই তাকে হতে হবে বা সুনির্দিষ্ট কোন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক-এভাবে ইসলাম কোন কিছু জবরদস্তি তার উপর চাপিয়ে দেয়নি ; বরং ইসলামের দাবী হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষ যেন নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতার সীমার মধ্যে থেকে যথাসাধ্য পূর্ণাংগ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য চেষ্টারত থাকে।

নিসন্দেহে ইসলাম বাস্তবমুখী কিন্তু তার বাস্তবতাবাদী হওয়া আধুনিক বাস্তবতাবদীদের মত নয়, বরং ইসলাম মানবপ্রকৃতির বিশ্বজনীনতাকে নিয়ে বাস্তব এবং ইসলাম মানুষের মধ্যকার দুটি প্রবণতা উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ ও স্পৃহা এবং (শয়তানের ধোঁকায় পড়ে) ঔদাসীন্য ও বিলাসিতার মধ্যে মুজ্জমান হয়ে অধঃপতিত হওয়ার যোগ্যতা-এই দুটি জিনিসের দিকেই খেয়াল রাখে।

ইসলামের বাস্তববাদী হওয়া আর ডারউইন ও ফ্রয়েডের বাস্তববাদী হওয়া- দুটো এক জিনিষ নয়। এর কারণ তাদের বিবেচনায় মানুষ বস্তুগত জিনিস ও পাশবিক চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা বলে, যেহেতু মানুষর মধ্যে মহৎপ্রবণতা ও নীচাশয়তা উভয়ই বিরাজমান এজন্য তাদেরকে নীচাশয়তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত-যেহেতু এটা তার জন্মগত চাহিদা এবং তার প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃত্তি, এতে করে তার মান-সম্ভ্রম খর্ব হতে এমন পর্যায়ে নেমে যাবে যে, পশুরাও যেন তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য পানাহ্ চাইতে শুরু করবে এবং মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলবে। বরং যেন মানুষ ডারউইনের পশু, মার্কসের অর্থনৈতিক দাস এবং ফ্রয়েডের মতানুযায়ী যৌন চাহিদার দাসে পরিণত না হয়ে যায়।

ইসলামের বাস্তববাদিতা হচ্ছে, ইসলাম মানুষের সামগ্রিক যোগ্যতা, শক্তি ও ক্ষমতাকে সামনে রেখ তাকে উপর্যুপরি উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তার যোগ্যতা, শক্তি ও চেষ্টা অনুযায়ী তাকে পূর্ণত্বে পৌছানোর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং

এই দৃষ্টান্তমূলক পূর্ণত্বকে তার জীবনের লক্ষ্য ও দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ ফেরেশতাও নয় যে, ফেরেশতাদের মত সে সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে থাকবে, আবার সে শয়তানও নয় যে, যাবতীয় খারাবী এবং হীনতার মধ্যে পড়ে সে শয়তানে পরিণত হয়ে যাবে।

সর্বাবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব এবং কার্যকর পদ্ধতি এটাই হতে হবে যে তার সামনে পূর্ণাংগ দৃষ্টান্তমূলক নমুনা থাকবে এবং সম্ভাব্য সর্ব-উপায়ে এবং পূর্ণ চেষ্টা সাধনা দিয়ে উপর্যুপরি এবং অবিরাম তাকে শিক্ষা দেয়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

❑